একতারা

তিলোত্তমা মজুমদার

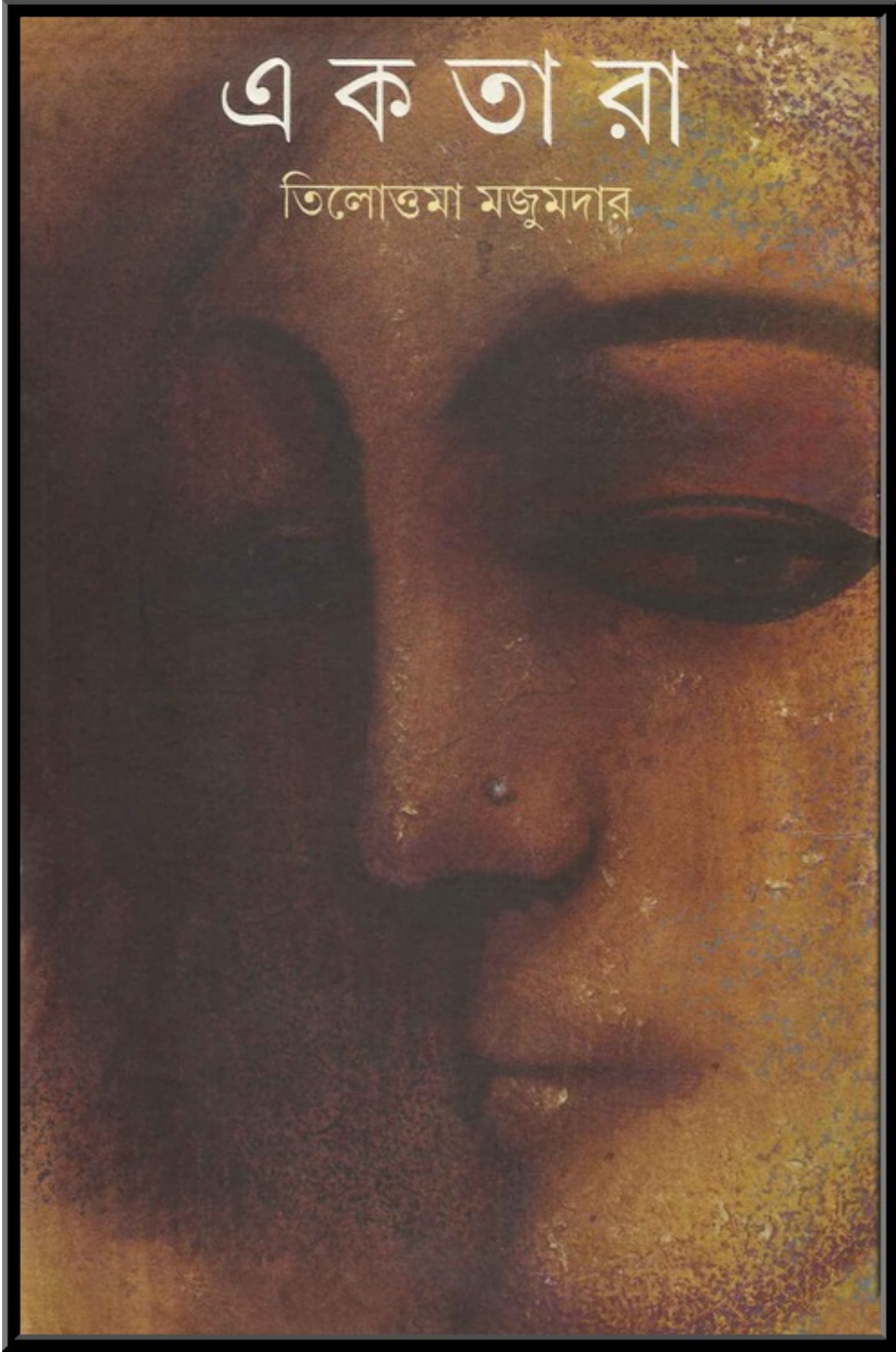

একতারা

তিলোত্তমা মজুমদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দেবারতির ত্যাগ

সমস্ত সময় শুধু পেরিয়েই যায়। থাকে না কিছুই। থামে না। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না অলৌকিক চিত্রপটে আঁকা হয়ে যাবার জন্য। ক্রমাগত সরে-সরে যাওয়া এই উদাসী ধর্ম সময়ের, তাকে অসহায় উপলব্ধি করা ছাড়া মানুষের আর কী করার থাকতে পারে! কিছুই না! আমারও করার নেই কিছু। এ সবই বোঝা সত্ত্বেও, কবে, কত বছর আগে থেকে যে-মুহূর্তটি নির্মিত হয়ে উঠবার আভাস আমার জীবনের সকল ঘিরে ফুটে উঠছিল, তাকে আমি মুঠোয় বন্দি করে ফেললাম। দাঁড়ালাম ওর মুখোমুখি।

এটাই কি আমার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত ছিল? হবে হয়তো। কাঠিন্যের তুলনামূলক বিচার করা চলে না। যার মধ্যে আছে কাঠিন্যধর্ম, আর যে ওই ধর্মকে উপলব্ধি করে চলেছে, এ কেবল তাদেরই মধ্যেকার নিজস্ব বিচার। সেই বিচারে, গত কয়েক বৎসরের যত কঠিন আমাকে হেনেছে তারা সকলেই আমার নষ্ট প্রভু। গলিত, অচেতন, পচনশীল নিষ্প্রাণ দেবতা আমার।

তাহলে? সেই মুহূর্তকে মুঠোয় বন্দি করার কী তাৎপর্য থাকতে পারে?

আসলে, সকল স্বীকারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ও। ওর মধ্যে থেকে উদ্ভূত তরঙ্গপ্রবাহ তার শেষতম শক্তি নিয়ে যত দূর পৌঁছয়, তত দূর আমি স্বীকার করেছিলাম। সেই সময় স্বীকারকে অস্বীকার করতে করতে আসা, তার পরিশ্রম যেমন ছিল, তেমনি অভিজ্ঞতাও। শেষ অস্বীকারের বেলায় আমি তাই জয়ের নেশায় বিভোর। উদ্দীপিত। মহাশক্তি হয়ে উঠেছি আমি আর ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। মহাকালের অবিরাম ক্ষণস্রোত হতে ছিনিয়ে নিয়েছি এক মুহূর্ত।

শেষ পর্যন্ত আমি এই মুহূর্তে পৌঁছতে পারব কিনা, এ নিয়ে আমার কোনও সংশয় ছিল না। যত দিন এতটুকু দ্বিধা ছিল, আশঙ্কা ছিল ব্যর্থতার, আমি ধৈর্য ধরেছি। আমি কল্পনা করেছি এই ক্ষণ। বার বার। সেই কল্পচিত্রকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, নানা ভাবে সাজিয়েছি, সাজানো সামগ্রী উলোট-পালোট করে আবার সাজিয়েছি। বিন্যাস ও সমবায়। বিন্যাস ও সমবায়। পাতার পর পাতা সমাধান করেছি। চারটে-পাঁচটা-ছ'টা বই। এবং আমি স্বপ্নের মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

স্বপ্নের, না স্বপ্নহীনতার? কোনও স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছেছি আমি, নাকি কোনও স্বপ্ন থেকে গড়াতে গড়াতে রক্তাক্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছি পাদদেশে! এক স্বপ্নের মধ্যে অন্য স্বপ্ন ঢুকে যায়। হায়! কী ভাবে তাদের আলাদা করি আমি? চিহ্নিত করি পৃথক!

না। সম্ভব নয় চিহ্নায়ণ। আমারই দেখা স্বপ্নের গর্ভে জন্মেছে এক বিপরীত স্বপ্ন। এই নতুন স্বপ্নকে হাতে নিয়ে দেখেছি, তারও গর্ভে ফিরে জন্মাচ্ছে পুরনো স্বপ্নটাই। এ ওকে খাচ্ছে, ও একে গর্ভে ধরছে ফের। এ এক আশ্চর্য নিরবচ্ছিন্ন খেলা।

অবশেষে, সেই মুহূর্তকে, বাস্তব ও স্পর্শযোগ্য সেই মুহূর্তকেই সুন্দরতম সফলতম স্বপ্নের মর্যাদা দিয়ে আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আধো অন্ধকার, গুমোট, বিষাদময় ঘরটার এক প্রান্তে রাখা ওয়ার্ডরোবে ঠেস দিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। একটা কালো শর্টস পরেছে ও। হলুদ টি-শার্ট। ওর ধবধবে, খেলোয়াড়ি, সুগঠিত শরীর— যার সঙ্গে এই সাত বছর, এই অন্ধকার, বিষাদময় ঘর আমি ভাগ করে নিয়েছি, ভাগ করে নিয়েছি ওই কাঠের ওয়ার্ডরোব— যেটা উজানিনগর বলে একটা ছোট্ট মফস্‌সল শহর থেকে বাসের পর বাসের মাথায় চাপিয়ে এই কলকাতা শহরে এনেছিল আমার ফুলকাকা, আনতে সময় লেগেছিল চব্বিশ ঘণ্টা পুরো, কেন না উজানিনগর একটি দূরের দেশ, তার চারপাশে গাছপালা নদী পাহাড় জঙ্গল, সেখানে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, সেখানকার কোনও সেগুন গাছ আমার জন্য দেহদান করেছে, ওয়ার্ডরোব হয়ে, বাসের পর বাসের মাথায় চেপে, আমার ফুলকাকার সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছে এই শহরে যখন, কেমন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে সে। লকটা নড়বড়ে, পাল্লার পালিশে আঁচড়, হাতলের নকশায় আধুনিকতার বদলে গেঁয়ো প্লাস্টিক— আসরে তাকে দেখাচ্ছিল কাঙাল দুঃখী গুরুত্বহীন আত্মীয়ের মতো। তাকে ঘিরে ঘুরছিল ওরা। তার গ্রাম্যতায়, দুর্বলতায়, পালিশের ওপরকার ক্ষতে কটূক্তি নিক্ষেপ করছিল। হাসাহাসি করছিল। ওদের ধনী, অহংকারী ঠোঁট বেয়ে, গাল বেয়ে, দামি পাঞ্জাবির পকেট উপচে বিদ্রুপ ঝরে পড়ছিল। আর সেই বিদ্রুপ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে, বাতাসে মিশে আমার বাবার, মা-র, কাকার, আমার দাদাদের দিদিদের কাকিমাদের মামাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঢুকে পড়ছিল। তারা কাশছিল। বুক চেপে কাশছিল এমন যেন প্রাণটা বেরিয়ে যাবে এখুনি। তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কষ্টে তাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তখন আমি কী করছিলাম?

BanglaBook.org

তখন দেবারতি

তখন আমি দাদা আর জামাইবাবুদের দ্বারা বাহিত হয়ে বিবাহিত হওয়ার জন্য পিঁড়েয় বসেছিলাম। আমার গায়ে লাল রঙের বেনারসি। তার জরির কারুকাজ আমাকে ঘিরে আছে। বেনারসি কেনার টাকা দিয়েছে বড়মামা। আমাকে বলেছিল— তুই কিনে নিস ইচ্ছেমতো। যা লাগে দেব আমি।

আমি দু'হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। বড়মামা রেলের বড় অফিসার। সে আমায় স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি জরির মহিমায় গড়ে ওঠা পাটলিপল্লু নকশাতে মুগ্ধ হয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। কিন্তু দাম শুনে ভীষণ রেগে গেছে বড়মামা। সে মাকে দু-চার কথা শুনিয়েছে। বলেছে— তোর মেয়েটা এত লোভী কেন?

যন্ত্রণায় মা আমাকে চড় মারতে পারত। মারেনি। অপমানে বিদ্ধ হৃদয় একা-একা সামলাতে সামলাতে বলেছে— ও তো চায়নি তোমার কাছে দাদা। তুমি নিজে দেবে বলেছ। এমনকী তুমি নিজেই ওকে কিনে নিতে বলেছ।

বড়মামা বলেছে— হ্যাঁ, বলেছি, কিন্তু তাই বলে দু'হাজার? কেন, হাজার টাকায় হত না বেনারসি? আমি পনেরোশো টাকার বেশি একটি পয়সাও দেব না।

—কিছুই দিয়ো না তুমি। তা হলেও ওর বিয়ে হবে।

বাদানুবাদ মিটে গেছে। বড়মামা পনেরোশো টাকা দিয়েছে। আর আমি, এক লোভী বেনারসি-ক্রেতা, পিঁড়েয় বসে আছি। বেনারসির জরি পাটলিপল্লু নকশা হয়ে, কারুকাজ হয়ে, গভীর লজ্জার মতো আমাকে জড়িয়ে আছে। মাকে বলেছিলাম— মা, এ শাড়ি পরব না।

মা বলল— একটা বিয়েতে কত কথা হয়, কত ঘটনা ঘটে, ওসব গায়ে মাখতে নেই। এই দেখ না, আমার বিয়ের সময় তোর ঠাকুরদাদা বাইশ ভরি সোনা স্যাঁকরা ডেকে ওজন করিয়ে নিয়েছিল। তোর দোলাপিসি আমার চোখের কোলে রুমাল ঘষে দেখে নিয়েছিল আমার চোখ সত্যিই এত পল্লবময়, নাকি আমি কাজল দিয়ে রাখি! তোর বাবা সাজগোজ রূপটাপ পছন্দ করে না বলেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু তাই নাকি? বিয়ের পর-পর যখন আমার গলস্টোনের ব্যথা হল, প্রথমে তো ধরা যায়নি গলস্টোন বলে, ব্যথায় নীল হয়ে যেতাম, ওরা বলল মেয়ের রোগ

BanglaBook.org

লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে। আমার মৃগী আছে, এমন মন্তব্যও করল তোর কাকারা। তোর বাবা বলল, অসুস্থ রুগ্‌ণ স্ত্রী নিয়ে তো ঘর করতে চাইনি আমি। ওরা কেউ বিশ্বাসই করল না, এখনও, আমার বিয়ের পঁয়ত্রিশ বছর পরেও বোধ হয় করে না যে বিয়ের আগে সত্যিই কোনও দিন আমার ব্যথা হয়নি।

মা সারাজীবন ধরে মেনেই এসেছে শুধু। নিজেকে অস্বীকার করে, কষ্ট দিয়ে মা শুধু বাবার মনের মতো হয়ে ওঠাই অভ্যাস করে গেল। কারও মনের মতো হয়ে ওঠা যায় কি কখনও? মা-র তপস্যা সিদ্ধি পাবে হয়তো। কিন্তু পাবার আগেই মা তাকে মূল্যবান মনে করছে। গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। আমাদের চার ভাই-বোনকে মা মেনে নেওয়া শিখিয়েছে বরাবর। কিছু না চাইতে শিখিয়েছে। খাওয়া-পরা নিয়ে আমাদের কোনও দাবি গড়ে ওঠেনি। আমরা কখনও চাইনি। আমরা বলিনি কখনও, ওদের আছে আমাদের নেই কেন? কোনও না থাকাই আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি মা-র জন্যই। মা তেমন করে শিখিয়েছিল বলে। দারুণ রূপসী আর অসম্ভব গুণবতী আমাদের মা!

দারুণ সুপুরুষ আমাদের বাবাও। বাবার দুটি মাত্র প্যান্ট পরতে পরতে হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে যায়। দুটি মাত্র শার্টের কলার ঘাড়ের কাছে ঘষা খেয়ে খেয়ে আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে। মা সেগুলো রিফু করে দেয়। রিফু করা পোশাক পরেও আমাদের বাবাকে দেখায় সকলের চেয়ে আলাদা। সকলের চেয়ে সুন্দর। বড় বড় চোখ বাবার। তীক্ষ্ণ নাক। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল। বাবা যখন মেরুদাঁড়া টান করে হেঁটে যায়, চারপাশ স্তব্ধ হয়ে দেখে। মুখর হয় না। স্তব্ধ হয়ে দেখে। বাবার দারুণ গাম্ভীর্যে চারপাশও গম্ভীর হয়ে যায়। বাবা বাড়িতে থাকে যখন, আমাদের নৈঃশব্দে পাড়ার লোক টের পায়। তখন কেউ আমাদের বাড়িতে আসে না। আমরা তখন পা টিপে টিপে হাঁটি, ফিসফিস করে কথা বলি। হাসি পেলে পেটে চেপে রাখি, কান্না পেলেও। বাবা যে আমাদের মারেধরে তা নয়। কিন্তু বাবার স্তব্ধতা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েই যায় শেষ পর্যন্ত। বাবা ঘুমোলেও গোলমাল করা চলে না। বাবা কাজের মধ্যে থাকলে শব্দ করা চলে না। বাবা খেতে বসলে গৃহে এক বৃহৎ নিরুপদ্রব শান্তি রাখতে হয়।

আমি তখন কত? পাঁচ কি ছয়। ছুটির দুপুর। বড়ঘরের মেঝেয় পিঁড়িতে বসে আহার করছে বাবা। মা সামনে বসে আছে। কখন কী লাগে। দাদারা বার্লি ফুটিয়ে মাড় তৈরি করছে রান্নাঘরে। স্কুলের পোশাকে দেবে। বালতির ওপর গামছা পেতে ছোড়দা বলল— গামছাটা ধর তো শানু। মাড়টা ছেঁকে নিই।

ছেঁকে নেবে। আমি গামছা ধরেছি দু' হাতে। ছোড়দা বড় কড়াই সাঁড়াশিতে ধরে

BanglaBook.org

বালতির ওপর কাত করল। ঘন বার্লি গড়িয়ে পড়ছে গামছার ওপর। সাঁড়াশির মুখেই কড়াই ঘুরে গেল হঠাৎ। বাঁ দিকে। ঘন, প্রায় ফুটন্ত বার্লি আমার বাঁ হাতের ওপর পড়ছে! আঃ! পুড়ে যাচ্ছে আমার হাত। হাতের নরম কচি ত্বক। জ্বালা-যন্ত্রণায় আমি ছটফট করছি। বড়দা জল দিচ্ছে হাতে। দিদি আলু থেঁতো করছে প্রলেপ দেবে বলে। ছোড়দা বোকার মতো তাকিয়ে আছে। কী ভাবে কী হয়ে গেল বুঝতে পারছে না। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু আর্ত চিৎকার থমকে আছে কণ্ঠে। শব্দ করা যাবে না। কান্নার শব্দ পেলে বাবা খাওয়া ফেলে উঠে যাবে। এজন্য, শুধু এজন্য, সারাক্ষণ আমাদের বাড়ির মাথায় জমে থাকে মেঘখণ্ড। কিন্তু মাকে দেখলে অকালে শরৎ ওঠে। পুবদিকে ঝকঝক করে সূর্য। আকাশ গভীর নীল হয়ে উঠতে চায়। মাঝে মাঝে ছেঁড়া মেঘ বকের ডানায় পাঠিয়ে দেয় মুগ্ধতার ভাষা। শিউলির গন্ধে আমাদের বুক ভরে ওঠে। আর মা রূপ ঢেকে রাখতে চায় রঙিন শাড়ি বর্জন করে। বাবা চায় না মা রঙিন শাড়ি পরুক। বাবা চায় না মা সাজুক, মা তাই নিরলঙ্কার। রূপটান দেয় না কখনও। বাবা চায় না মা পাড়ায় মেলামেশা করুক। মা তাই কারও বাড়ি যায় না। শুধু কারও বাড়িতে বারের পুজোর নেমন্তন্ন থাকলে মা প্রসাদ নিতে যায়। প্রসাদ খেতে খেতে খুব হাসে। পাড়ার কাকিমাদের সঙ্গে গল্প করে। বাবা যায় না এসবে, বাবা অধীর প্রত্যাশা করে কখন মা ফিরে আসবে। আমরা ফিরে আসব। বাবার নিজস্ব সময়সীমা পেরিয়ে গেলেই সে চলে আসবে বারান্দায়। খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে, ঠেস দিয়ে দাঁড়াবে চওড়া খুঁটিতে। তার বড় বড় চোখগুলি রাগে ধক্-ধক্ করবে তখন। আমরা দেখা মাত্র গুটিয়ে যাব। কারণ, আমাদের নয়, বাবা মাকে বকবে। খারাপ কথা বলবে। রাতে খাবে না। থালা ছুড়ে ফেলে দেবে। এমনকী দিনের পর দিন নাও খেতে পারে। তখন মা-ও খাবে না। দিনের পর দিন উপোস করবে। বাবার জন্য খাবার বেড়ে বসে থাকবে। বসেই থাকবে। তারপর, বাবা না খেয়ে বেরিয়ে গেলে সব ফেলে দেবে নর্দমায়। তখন আমাদেরও গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। ভাতের দলা গলায় আটকে থাকা কান্নার মতো লাগে। বড়দা ছোড়দার মাথা নুয়ে পড়ে থালার ওপর। দিদি মুখ দিয়ে খায়, চোখ দিয়ে কাঁদে। আমার, বাবারই মতো তীব্র রাগ হয়, ইচ্ছে করে ছুড়ে ফেলি সব, ইচ্ছে করে ভাত ছড়িয়ে দিই উঠোনে। কিন্তু দিই না শেষ পর্যন্ত। কারণ আমাদের খিদে পায়। খুব খিদে পায়। উপোসের কষ্ট আমরা দিতে পারি না বলে কান্না দিয়ে ভাত চটকে খাই আর বড়দা ইস্কুলে গিয়ে সোনাকাকার কাছে সব বলে। সোনাকাকা আমাদের ইস্কুলে ইতিহাস আর ইংরাজি পড়ায়। ফুলকাকার সঙ্গে দাদুর তৈরি করা বাড়িতে

BanglaBook.org

থাকে। ঠাকুমাও থাকে ওখানেই। বড়দা কাতর আবেদন করে— ঠাকুমাকে একবার পাঠিয়ে দেবে সোনাকাকা?

এমন ভাবে বলে যেন ঠাকুমার ওপর আমাদের অধিকার কম। সোনাকাকা বা ফুলকাকা অনুমতি দিলে তবেই আমরা ঠাকুমাকে পেতে পারি।

সোনাকাকা তখন ইস্কুল ছুটির পর সাইকেল চালিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। মা সোনাকাকাকে চা চিঁড়েভাজা খেতে দেয়। আর কথা বলে। কাঁদে। গভীর অভিমানী দেখায় তখন মায়ের মুখ। আর সোনাকাকাকে দেখায় বিমর্ষ। ওই সব কথাবার্তার চিত্রে আমরা প্রবেশ করি না কখনও। মা-র কষ্টের বাক্যাবলি শুনতে চাই না। শোনার দরকার হয় না আমাদের কারণ আমরা আমাদের মায়ের কষ্টকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। বিষাক্ত ব্যথাময় হৃদয়ের কোনখানটায় চাপ দিলে, আমরা জানি, মা-র সবচেয়ে বেশি লাগবে! আমরা জানি ঠাকুমা আসবে পরদিন। নিজে সামনে বসে থেকে মাকে খাওয়াবে। বলবে— সন্তানের মা তুমি, উপাস করলে তাগো অকইল্যাণ হয়। তুমি কী ভাবতাসো, ও ঘোরে ফেরে কামে যায় না খাইয়া! হোটেল-মোটেলে খাইয়া লয়। অখন খাও তুমি। না খাইয়া মরবা নাকি।

ঠাকুমা নিজে হাতে চিঁড়ে দিয়ে রান্না করেছে থোড়ের ঘণ্ট। দারুণ সুস্বাদু সেই পদ। আর মা কালোজিরে দিয়ে খারকোন পাতা বেটেছিল। তাই দিয়ে ভাত মেখে মণ্ড মুখে পুরবে মা, গিলবে, আর মা-র কালো ভ্রমর চোখ দুটি থেকে জল পড়বে টুপটাপ। আমরা জানি এ সব। জানি যে ঠাকুমা তার ছেলেকে কখনও শাসন করে না এই আচরণের জন্য। বলে না— মাইরা তর মাথা ভাঙ্গুম। গোবর তুলে মুখেও পুরে দেয় না খারাপ কথাগুলি শুনে, যেমন সে দিয়েছিল মিষ্টিকাকাকে একদা খারাপ অশ্লীল কুবাক্য বলেছিল বলে। বলে না এ সব ঠাকুমা, করে না, আমরা জানি, কারণ ঠাকুমাও বাবাকে ভয় পায়। এবং ঠাকুমা মাকে কাছে বসিয়ে খাওয়ালেও বাবাকে বাড়িতে খাবার উপরোধ করে না।

জানি আমরা, জানি এ সব, বলেই, মা-র সঙ্গে বারের প্রসাদ নিতে গিয়ে হাপুস-হুপুস খাই। তাড়াতাড়ি সিন্নি চেটে কলাপাতা সাফ করে দিই। আরও দু'হাতা খেতে ইচ্ছে করে। চাইলেই পাব জানি। কাটা ফল প্রসাদের গন্ধে, সিন্নির গন্ধে মন খুশি হতে চায়, কিন্তু হয়ে ওঠে উতলা। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা সিন্নির গামলা থেকে চোখ সরিয়ে নিই, পাছে আমাদের জন্য মা-র দেরি হয়ে যায়!

মা মেনে নিয়েছে এই সব। সব। আমাদের মানতে শিখিয়েছে। বড়দা, ছোড়দা, দিদি এই শিক্ষায় সম্পূর্ণ! কেবল আমিই জেনে গেছি, কেমন করে জেনে গেছি, বুঝে গেছি কেমন করে, ওই মেনে নেওয়ার মধ্যে ছিল মা-র বিদ্রোহ। তীব্র

BanglaBook.org

আত্মাভিমানে মা সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছিল, ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল, বাবার মনের মতো হওয়ার তপস্যা চালিয়ে যেতে যেতেও বাবাকে ধরা দেয়নি কখনও। দেখো, আমি তোমার আকাঙ্ক্ষামতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করে চলেছি প্রাণপণ— এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই বিবৃতি— আমি আমার নিজস্বতা ভুলি না।

মা যখন কাঠের উনুনে রান্না করত, আমি কাছে বসে পড়া মুখস্থ করতাম, একটি চটের বস্তার ওপর ছড়ানো আমার বই, খাতা, পেন— আমার অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস! মা নীরবে রুটি বেলত। টক-টক টক-টক টক-টক শব্দে একই ছন্দে শব্দ করত চাকি, মা-র হাতের বেলনের চাপে। নরম আটার তাল নিটোল গোলাকার হলে, পাতলা হলে, মা সেগুলি সেঁকে নিত তাওয়ায়, লোহার জালির ওপর ফেলে পোড়াত তারপর। গোল রুটি শূন্যে ছুড়ে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে মা চালান করে দিত মুখ-ঢাকা বাটিতে, আর সেই ফাঁকে আগুন, উনুনের মুখে উছলে উঠত। আমি দেখতাম আঁচ পড়েছে মা-র মুখে। কাঁপছে। দেখতাম কাঠের টুকরোর তলায় গনগনে জ্বলন্ত অঙ্গার। জ্বলছে, জ্বলছে, জ্বলে জ্বলে হয়ে যাচ্ছে ছাই। ওই গনগনে জ্বলন্ত আঁচ ছিল আমাদের মা-র বিদ্রোহ। ওই অঙ্গার। তার আঁচ লেগেছে আমার মধ্যে। আমি তা টের পাই। ওই আঁচে আমি উত্তপ্ত হয়েছি, আমি শুধু সকল মানাকে অস্বীকার করতে চেয়েছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছি আমি এবং অসহায়ের মতোই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছি বেনারসি। বেনারসি। গভীর লজ্জা সমেত তা আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে উজ্জ্বল কারুকাজে। যে দ্রোহী, তার অবশ্যই উচিৎ যুদ্ধ ঘোষণার পর জয়লাভ করা। পরাজয়ের শোচনীয় পরিণাম তাকে উভমুখী বল্লমের মতো বেঁধে। সে-যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সে-যন্ত্রণার অপমান মেনে নেওয়া কঠিন। আমি মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি, বিয়েতে নানা কথা হয়। যেমন, সকালেই, নান্দীমুখ করে ওঠার পর বড়দা বলছিল— তোর বিয়ে দিতে গিয়ে বাবার শেষ সম্বলটাও গেল।

আমি শুনেছি। মেনেছি। বলিনি— তোদের বিয়েতেও বাবা এর চেয়ে বেশি খরচ করেছিল। বাবার সামান্য ভাণ্ডার শূন্য করার জন্য তোরাও দায়ী।

বলিনি আমি, বলিনি, মেনে নিয়েছি এমনকী ছোড়দার কথাও। আমি কনে-সাজ পরব বলে তৈরি যখন, ও বলল— তোর বিয়েটার জন্য আমি আর বড়দা দশ হাজার টাকা ধার করলাম।

মেনে নিয়েছি। এই সব কথা আমাকে বলার এই তো উপযুক্ত সময়। মেধা ছিল কিছু সংস্থান গড়ে নেবার মতো। স্বাধীনচিত্ততা ছিল তর্ক করার মতো। গর্ব ছিল

BanglaBook.org

আমি গলগ্রহ হব না। আত্মজীবনের ব্যয়ভার বহন করতে পারার সঙ্গতি অর্জন করব স্বয়ং। আমার সকল গিয়েছে। উপায় কী! আমি বেনারসি মেনে নিয়েছি। আমার জন্য বাবার শেষ সম্বল গিয়েছে। মা-র শেষতম অলঙ্কারটিও আমার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে। বাইশ ভরি সোনার এক-চতুর্থাংশে আমার অধিকার আমি বুঝে নিয়েছি।

ছোটমামা দিয়েছে বড় স্যুটকেস। দাদারা দিয়েছে ড্রেসিং টেবিল, দিদি দিয়েছে স্টিলের আলমারি, কাকারা দিয়েছে খাট, দিয়েছে ওয়ার্ডরোব, দিয়েছে ছেলের ঘড়ি-আংটি-বোতাম। মা কাঁসারির দোকান থেকে ওজন বুঝে বুঝে কিনেছে ভারী কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস। পেতলের কলসি, গামলা, তামার পুষ্পপাত্র, ঘট, পেতলের প্রদীপ ও পিলসুজ। এমনকী পেতলের বালতি পর্যন্ত। বালতিটা ওজনে বেশ ভারী বলে বড়দা ওর বিয়েয় পাওয়া বালতির সঙ্গে বদলাবদলি করে নিল। তা নিক। এইসব কাঁসা-পেতলের বাসন, এ তো নিত্যব্যবহার্য নয়। তবু দিতে হয়। এগুলো দানসামগ্রী। বস্তুগত লেনদেন। ওয়ার্ডরোবের মতোই।

সেই ওয়ার্ডরোব দেখে ওর পিসিরা, ধনী গর্বিত পিসিরা ওর বাবাকে বলছে—তুমি কি কাঙাল নাকি সেজদা? তোমার ঘরে জিনিসের অভাব? ওই ভাঙা জিনিস দিয়ে ওরা তোমাকে এত বড় অপমান করল?

—না সেজদা, তুমি কিছুতেই এই বস্তুটা নিতে পাবে না।

—চেহারা থাকলেই হয় না। আসলে হা-ঘরে। বড়দাও ওই হা-ঘরের মেয়ে আনলেন, তুমিও আনলে।

—সেজদার কী দোষ! নীলুটাই তো নষ্টের গোড়া। কী যে দেখল মেয়েটার মধ্যে। ওর দিদি তবু শান্ত, কাজের, দেখতেও সুন্দর। এ তো শুনেছি নাটক করে বেড়াত। স্বভাব-চরিত্র কেমন তা হলে বুঝে দেখ।

ওরা অত দূর আমাদের বাড়িতে বিয়ে করতে যেতে পারবে না বলে আমাদের পরিবারই উৎপাটিত হয়ে এই কলকাতা শহরে আমার বিয়ের আয়োজন করেছে। আমরা সবাই সব কিছু মেনে নিয়েছি। বেনারসি পরে পিঁড়ায় বসে আছি বিবাহিত হব বলে। আমার নাটকের বন্ধুদের আমি নেমন্তন্ন করিনি। ও বারণ করল। বারণ করল এই জন্য যে নাটকের দলে কুড়িটি ছেলে মেয়ে আমাকে নিয়ে দু'জন মাত্র।

BanglaBook.org

ওয়ার্ডরোব

সেই ওয়ার্ডরোবে ঠেস দিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। সেই ঘেন্না-ঘেন্না, সেই হেলাফেলা, সেই অনভিজাত ওয়ার্ডরোবে। আমি ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

মুখোমুখি, আমরা ইতিপূর্বে দাঁড়িয়েছি তো কত বার। পরস্পরের দৃষ্টিতে প্রেম গেঁথে, উদ্বেল হয়ে, সতৃষ্ণ এবং বিতৃষ্ণ হয়ে, হয়ে যুযুধান— এবং কিছু না হয়েও। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত অবস্থায়। যেমন তাকায় গৃহপালিত গাভীর দিকে গৃহপালিত শুয়োর, কখনও দাঁড়ায় মুখোমুখি, উভয়েরই গৃহপালিত হওয়া ছাড়া আর কোনও পরিচিতি বা আগ্রহ থাকে না পরস্পরের প্রতি, তেমনই আমরাও, একই ঘরের এই খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এবং ওয়ার্ডরোব, হ্যাঁ অবশ্যই ওয়ার্ডরোব এবং দারুণ গরম ও স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ছড়ানো মেঝে, কোনাখামচি সাত বছর ধরে ভাগাভাগি ব্যবহার করতে করতে নিরাসক্ত মুখোমুখি দাঁড়াবার অভ্যাসে সহজেই পৌঁছে গিয়েছিলাম।

সহজেই? কে জানে! নিরাসক্ত হওয়া সহজ কিনা এ এক জটিল প্রশ্ন আমার কাছে। আসলে এই বোধ হয় প্রকৃত অবস্থা যে কেউ তা সহজে পারে, কেউ পারে না। পারতে গেলে, চৌবাচ্চা পরিষ্কার করা লোহার কাঁটামারা বুরুশ দিয়ে হৃদয় ঘষতে হয়। ঘষতে ঘষতে সমস্ত নাম, বোধ, অনুভূতি মুছে গেলে— নিরাসক্ত শান্তির ঘুম।

গত এক মাস সেই ঘুম ঘুমিয়েছি আমি। এক মাস ধরে এ বাড়ির প্রতিটি কোণ, বারান্দা, বারান্দার ঘুলঘুলিতে ছাতারে পাখির বাসা— সব ত্যাগ করেছি। একটি একটি করে ত্যাগ করেছি কুয়োতলা, জলের ট্যাঙ্ক, ছাত, ছাতের ওপর বিছিয়ে থাকা এক আকাশ তারা এবং পঞ্চাশ বছরের পুরনো ইট-কাঠ-সিমেন্টের সোঁদা রক্ষণশীল গন্ধ। এই ত্যাগের মধ্যে কোথাও মানুষ ছিল না। মানুষগুলিকে আমি ত্যাগ করেছিলাম বুঝি আগেই, কিংবা গ্রহণই করিনি। কেবল এক সহবাসের মায়া, অভ্যস্ত দিনরাত্রির পরিচিত যন্ত্রণারা ঝুলকালির মতো লেগে ছিল আমার অস্তিত্বে।

আসলে হয়তো গত সাত বছর আমি করেছি ওই ত্যাগেরই সাধনা। বর্জনের সাধনা। কেন না আমি হৃদয় দিয়ে টের পেয়েছিলাম, এখানে কেউ আমাকে

BanglaBook.org

ভালবাসে না। আমিও ভালবাসি না কারওকে। ভালবাসা— সে যে সদাই পরস্পরে জাগে! ভালবাসা স্বীকৃতি চায়! সে অঞ্জলি উজাড় করে দেয় এবং পেতে চায় অঞ্জলি ভরেই।

অথচ ভালবাসাবিহীন সম্পর্কও সমাজে স্বীকৃত। বস্তুত, সমাজে সম্পর্কের মূল বন্ধন হিসেবে ভালবাসার কোনও চাহিদা নেই। তাই সেই সম্পর্কও বাঁধে। জটিল গ্রন্থি দেয় চারপাশে। দিতে লাগে সামান্য সময়। খুলতে লাগে সহস্র বৎসর। সহস্র সহস্র বৎসর। কেন না কোনও কোনও সম্পর্ক, সমাজ মনে করে, জন্ম-জন্মান্তরের। অতএব গ্রন্থির জটিলতা তিক্ত হলেও, বিষাক্ত হলেও, শরীরের মাংস কেটে কেটে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে দিলেও, এমনকী জীবনাবসানের সকল লক্ষণ দেখা দিলেও গ্রন্থিকল্যাণ সম্পর্ককে অটুট রেখে দেয়।

সে ক্ষেত্রে আমি, সাত বছর ধরে কেবল খুলেছি আর খুলেছি। একটা খুলতে না-খুলতেই আরও চারটে গিঁট আমার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। জিভ বেরিয়ে এসেছে এমন বন্ধনে। এমনকী নরম জিহ্বায় কেটে বসে গেছে দাঁত আর আমি জান্তব চিৎকার করতে করতে দেখেছি আমারই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায় ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

আমারই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায়— তবু আমি বেঁচে উঠলাম। উঠেছি, বারংবার এবং শেষতম গ্রন্থির সকাশে দাঁড়িয়েছি। ওয়ার্ডরোব, ওগো ওয়ার্ডরোব, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারব না। আমার নিজেরই কোনও চালচুলো— সে যাই হোক, ওয়ার্ডরোব— আমি তার গায়ে আলতো হাত রাখলাম। ও আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওয়ার্ডরোবে ঠেস দিয়ে।

এক মাস পড়েছিল ওয়ার্ডরোবটা। এক মাস ধরে সকাল-সন্ধে-রাত্রি যতক্ষণ জেগে ছিলাম, ভেবেছি, ওকে কী ভাবে ফিরিয়ে আনা যায়! ও পড়ে আছে একটা স্যাঁতসেঁতে ঘরে। যে-বাড়িতে, আমার বিয়ে উপলক্ষে, এসে উঠেছিল আমার আত্মীয়রা, ছিল এক মাস, আর এক মাসেই আমাদের সঙ্গে ওদের, ও-বাড়ির কাকু-কাকিমা আর বাচ্চাদের একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল, আমার বিয়ের দিনে আমাকে অবশিষ্ট সমস্ত গয়না দিয়ে দেওয়ায় নিরলঙ্কার আমার মাকে নিজের গয়নায় সাজিয়ে দিয়েছিল সেই কাকিমা, সে-বাড়িতে, একতলার একটি পরিত্যক্ত বাথরুমে ওকে রাখা ছাড়া কী-বা উপায় ছিল।

আবার ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত হয়তো। বাসের মাথায় চেপে ও ফিরে যেতেই পারত আমাদের গঞ্জটায়। আরও নড়বড়ে হত। আরও খোলা-খোলা। তক্তাগুলি খুলে ফেলে ওকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা যেত অন্য কারও

BanglaBook.org

ব্যবহার্যে। কিন্তু আমি বাদ সাধলাম। আমি বললাম— ওকে রেখে যাও। ওকে ফিরিয়ে আনবই।

বাবা বলল— একটা সামান্য বিষয় নিয়ে বেশি মাতামাতি না করাই ভাল।

আমি বলি— বিষয়টা সামান্য নয়।

মা বলে— ও বাড়িতে তোর দিদি আছে। তারও শান্তির দিকটা দেখা দরকার।

তা বটে। শান্তি বড়ই দেখেশুনে রাখবার জিনিস। এত পলকা বস্তু এ জগতে আর কী আছে! লুকোছাপা, মিথ্যাচার, সহ্যাতীতকে সহন করার অমিত শক্তি দ্বারা সংসারে তাকে পেতে হয়। এ বিষয়ে নিশ্চিতই আমার ধারণা অপরিণত এবং ভাসা-ভাসা। অতএব এ ক্ষেত্রে আমার বলার ছিল না কিছুই। ওদের হল সঙ্ঘ পরিবার। একই বাড়িতে চার ভাগে চার তরফ। দিদি বড় তরফ। আমি সেজ তরফ। দিদি থাকে দোতলার এক ভাগে। আমি থাকি এক তলার একভাগে। পালা-পার্বণে সব একসঙ্গে খায়। কিন্তু রোজকার জীবনে যার-যার তার-তার। কারও রোজগার কম-কম, কারও বেশি-বেশি। দিদির বর নির্মলদা বেশি-বেশির পর্যায়ে না পড়লেও কম-কমেও পড়ে না। বরং বেশি-বেশির দিকে আছে সেজবাবু। নীলের বাবা হওয়ার সূত্রে ও আমার শ্বশুর। মেজবাবুও তাই। বরং ছোট তরফের প্রতি সকলেই করুণাপরবশ। আহা! ওদের বড্ড অভাব।

অতএব, আমার অশান্তির সঙ্গে দিদির অশান্তি জড়িয়ে গিয়ে জট পাকবার পথ খোলাই থেকে গেল মায়ের সাবধানবাণী অনুযায়ী। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না।

অষ্টমঙ্গলায় গিঁট খুলেটুলে দিয়ে আমার আত্মীয়রা গঞ্জে ফিরে গেল। নীলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল মা। বলল— নীলার্ণব, দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকলে কিছু মনে কোরো না। ওর জীবন এখন থেকে তো তোমারই হাতে। ওর ভাল-মন্দ সব।

নীল স্মিত মুখে হাসে। ভুবন-ভোলানো হাসি ওর। মা বলে। যিশু খ্রিস্টের মতো। আমি দেখি। মাকে দেখি। বাবাকে দেখি। আত্মীয়দের দেখি। এত সুন্দর নীল, দীর্ঘদেহী, গৌর, সুঠাম, উন্নত নাসা, মুখে স্মিত হাসি— এত সুন্দর নীল, কেউ বলে ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিলের মতো, কেউ বলে রবি শাস্ত্রীর মতো, কেউ বলে অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জির মতো, আর ভিক্টর ব্যানার্জির তুলনাটা ও পছন্দ করে না কিন্তু ক্রিকেটারদের সঙ্গে তুলনায় ও তৃপ্ত হয় হয়তো এ কারণেই যে ও নিজেকে মনে করে একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার, যে, পিঠের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় একজন ট্র্যাজিক প্রতিভা হিসেবে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

আমি দেখি এই সবই। আর দেখি আমার হস্তান্তর। পিতা আমাকে তাঁহার হস্তে

BanglaBook.org

সমর্পণ করিলেন। আজি হইতে আমার ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুখ-দুঃখ সকলেরই অধিকারী তিনি। তিনি। অতএব আমার হস্তান্তর আমাকে দেখতে হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়াহীন যাকে অধিকার করেছিলাম, আমি অসহায় দেখি আমার সেই পদবিকে পাল্টে যেতে। অসহায় দেখি আমার গোত্রান্তর হতে। অসহায় দেখি আমি আর সালোয়ার-কামিজ পরছি না। ম্যাক্সি পরছি না। জিনস-টপ বা স্কার্টের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করছি না। সারাক্ষণ অঙ্গে চড়িয়েছি অনভ্যাসে লেপ্টে থাকা শাড়ি। কেন না আমার হাত বদল হয়েছে। আমি কী? আমি কি একটি দাগ? খতিয়ান? পড়চা? আমি কি একটি দলিল? আমি কি তিন কাঠা চার ছটাক দেড় হাত?

জানি না। জানি না। আমি শুধু জানি, কী এক ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে কাল। আমি নষ্ট করেছি সময়। নষ্ট করেছি সুযোগ। আমার বন্ধুরা কেউ এম সি এ করছে। কেউ এম বি এ করছে। কেউ এম এস সি করছে। আর আমি মানন সম্পন্ন করছি। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। আত্মনির্ভরশীল হব। এই অহঙ্কারকে আমি হত্যা করেছি। একটি ক্লীব বস্তুরই মতো হস্তান্তরিত হওয়া ছাড়া, মেনে নেওয়া মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আমার আর কী করার থাকতে পারে?

হ্যাঁ। থাকতে পারে একটিই কাজ। ওয়ার্ডরোবটা ফিরিয়ে আনা।

ওয়ার্ডরোব প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে নীল ওর মা-বাবাকে কিছুই বলেনি। আমিও বলিনি। ওর মা মাধবী রোজ সকালে আমাকে সামনে বসিয়ে ওয়াক তোলে। বিয়েতে কত রকমের অব্যবস্থা ছিল তা বলে। আমার দিদি সঞ্চিতা কী ধড়িবাজ মেয়ে তার ব্যাখ্যা দেয়। আড়ে-ঠারে বুঝিয়েও দেয়, দিদির সঙ্গে বেশি মাখামাখি মাধবীর পছন্দ নয়। আমি শান্ত মুখে শুনি সব। পিতৃনিন্দা-মাতৃনিন্দা শুনি। দিদির নিন্দা শুনি। মাধবী বলে— গয়না অত কম দিলে চলে? আমি যদি চার-চার আটগাছা চুড়ি না দিতাম হাত তো ন্যাড়া হয়ে থাকত।

আমি চুপ করে থাকি।

মাধবী বলে— আমার ছেলের বোধভাস্যি নেই তাই তোমাকে ধরল। না হলে কত বড়লোক বাড়ির মেয়ের সম্বন্ধ আসছিল।

আমি শুনি।

মাধবী বলে— দেখতে সুন্দর হলেও বুঝতাম। সুন্দর হল সঞ্চিতা। কী বিশ্রী ঠোঁট তোমার বাবা! কী মোটা। ঠোঁট হবে আমার মতো। কী পাতলা দেখেছ! তোমার ঠোঁট দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

আমি মেনে নিই। বুকের মধ্যে কষ্ট পাক খায়। তবু, শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক করা

BanglaBook.org

উচিত নয় এই শিক্ষায় এবং মানন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে আমি মাধবীকে বলি না— আমার ঠোঁট দেখে আপনার মোহিত হওয়ার কথা ছিল না কোনও দিন!

বলি না, কিন্তু আলগোছে এসে দাঁড়াই আমার অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের আয়নার সামনে। আলতো আঙুল ছোঁয়াই আমার ঠোঁটে। ঠোঁট দুটির জন্য আমার মায়া হয়। ওদের খারাপ দেখি না আমি। বরং লালচে ত্বকের নীচে ওদের পেলবতা আমাকে যত্ন দেয়। আরাম দেয়। ওরাই প্রথম আমার মাতৃদুগ্ধের স্বাদ পেয়েছিল। ওরাই জেনেছিল হৃদয় মথিত করা প্রথম চুম্বন কী! জিহ্বার ব্যবহার না জেনেই প্রথম মা ডেকেছিল ওরাই। ওরা, আমার ঠোঁট যা মাধবীর বমনোদ্রেক করে, ওদের না ভালবেসে পারি না আমি। আয়নার কাচের খুব কাছে ঠোঁট নিয়ে যাই। প্রতিবিম্বিত ঠোঁটও এগিয়ে আসে। আরও আরও আরও কাছে এগিয়ে আসে। আমার প্রকৃত ঠোঁট ও বিম্বিত ঠোঁট চুম্বন করে পরস্পরকে। ছেঁড়া ত্বক ঠোঁটের ওপর, খসখসে, ফাটা-ফাটা, আমার অযত্নের অনাদরের ঠোঁট— আমি তার ওপর রমণীয় ক্রিম মাখাবার অভিপ্রায়ে হাতে নিই বোরোলিনের টিউব, বিম্বিত টিউব দেখে উভয়কে। চোখেরা চেয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। দেখতে পায় পরস্পরের ভিজে-ওঠা। আর আমি ভেজা চোখ মুছে নীলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বলি না— দেখো তো, আমি কি দেখতে খারাপ? আমার ঠোঁট তোমার বমনোদ্রেক করে কি?

বলি না। বরং বলি— আজ কি ওয়ার্ডরোবটা আনবে?

ও জবাব দেয় না। উঠে চলে যায়। আমি রোজ বলি। আর ও রোজ উঠে চলে যায়। আমাদের নববিবাহিত শয্যায় নিথর কোলবালিশের মতো পড়ে থাকে ওয়ার্ডরোব। সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। দাম্পত্য জীবনে অন্তত শরীরকেন্দ্রিক একটা প্রেম গড়ে ওঠার কথা যে ছিল, তা আমার সম্ভব হয় ওয়ার্ডরোবের সঙ্গেই বুঝি-বা। মাধবী বলে— কী দরকার ছিল এসব জিনিস দেবার? আমি বানিয়ে দিতাম আমার ছেলেকে। আমার কি টাকার অভাব? ওই একমাত্র ছেলে আমার। তারই তো সব। শুধু শুধু এই সব নিকৃষ্ট জিনিসে ঘর ভরানো।

আমি চুপ করে থাকি।

মাধবী বলে— পিঠের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেল বলে। না হলে ও ইন্ডিয়া টিমে খেলত। কপাল খারাপ। তখন ওকে টিভিতে দেখতে পেতে। সুন্দরী মেয়েরা ওর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ওকে ধরার সাধ্য হত না তোমার।

BanglaBook.org

আমার মধ্যে কী যেন হয়, কী এক কলকাঠি হঠাৎ নড়ে-চড়ে যায়। আমি বলে ফেলি— রাজ্যস্তরে খেলেছিল কি ও?

মাধবীর গাল ফুলে ওঠে। আঁচল খসে যায় বুক থেকে। কড়া গলায় ও বলে— চা-টা ছাঁকো। বেশি ভেজালে তেতো হয়ে যাবে।

আমি চা ছাঁকি। কাপ হাতে চলে যাই ওর কাছে। ও কাগজ পড়ছে। আমি ওর হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলি— ওয়ার্ডরোবটা আনবে না?

এই প্রথম পেয়ালা থেকে চা চলকে পিরিচে পড়ে। ওর ভ্রূ কুঁচকে যায়। ও বলে— আমি কী করতে পারি? আমি কি আনব না বলেছি?

আমি বলি— তুমি কিছু করতে পার না?

—না। মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আমি।

—আমাকে বিয়ে করার বেলায় তো যেতে পেরেছিলে!

—মানে?

— তুমি জানতে না, তোমার মায়ের আমাকে ঘোর অপছন্দ? তবু বিয়েটা করেছিলে তো? লুকিয়েই করেছিলে।

—সেকথা আলাদা।

—তোমার সুবিধে মতো সব কিছু আলাদা হলে তো আমার চলে না।

—কী চাও তুমি?

—ওয়ার্ডরোব।

—আমি কিছু জানি না।

—বেশ। আজ কত তারিখ সে খেয়াল আছে তোমার?

—দোসরা মার্চ।

—এক মাস। ঠিক এক মাস আগে ওকে বাথরুমে ঢুকিয়ে রেখে আসা হয়েছিল।

—ওকে মানে?

—ওকে মানে ওকে। ওই ওয়ার্ডরোব। এক মাস আমি দেখলাম। ও আমার বাবার দেওয়া জিনিস। আমার আত্মীয়দের দেওয়া। ওকে তো আমি আত্মীয় মনে করি। আত্মীয় মানে তো জানো। আত্মার কাছাকাছি যার বাস। সুতরাং ওকে বাথরুমে বন্দি করে রাখা কত দিন সম্ভব হয়? আমি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—ওকে আনতে।

—কী ভাবে?

BanglaBook.org

—সেটা তোমার দেখার বিষয় নয়।

আমি আঁচল প্যাঁচাই কোমরে। বাসি শাড়ি ছাড়তে হয় এ বাড়িতে। ছেড়েছি। যেটা পরে আছি, মন্দ নয়। মন্দ হলেও আমার কিছু এসে যায় না। আমি আলমারি খুলি। উপহার পাওয়া হাজারখানেক টাকা রয়েছে তখনও আমার কাছে। পেয়েছিলাম প্রায় তিন হাজার। নীল বাকিটা নিয়ে গেছে। সেই টাকা থেকে পাঁচশো নিই মুঠোর মধ্যে। চটি গলাই পায়ে আর বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। বিয়ের পর এই প্রথম, একা একা। নিজেকে স্বাধীন লাগে আমার। মুক্ত লাগে। বড় বড় পা ফেলে আমি প্রায় উড়ে যেতে চাই। ঘোর লেগে যায় আমার। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দগদগ করে। খোঁপা খুলে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে রাশিকৃত চুল। চলার ছন্দে ছন্দে বেজে ওঠে আমার হাতের শাঁখা-পলা-চুড়ি। মুঠোয় আশীর্বাদের টাকা নিয়ে আমি বন্দি রাজপুত্রকে উদ্ধার করতে যাই। আমি জানি রাস্তার মোড়ে সার সার দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাটাডর ভ্যান। আমি জানি কোথায় কী ভাবে যেতে হবে। শুধু জানি না, হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে শিবানন্দর সঙ্গে। শিবানন্দ, নীলের বাবা, মাধবীর স্বামী, আমার শ্বশুর। ওকে এখনও বাবা ডাকিনি আমি। মাধবীকে মা ডাকিনি। ডাকতে গেলে আমার জিভ জড়িয়ে যায়, গলায় হাওয়া আটকে যায়। সেই শিবানন্দ, দু'হাতে দুটি বাজারের ব্যাগ, আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। আমি ওকে চিনতে পারি না। ও বলে— শানু, এ কী? একা একা কোথায় যাচ্ছ?

কোথা হতে আসে এ জিজ্ঞাসা, কোথায় যায়, আমার কি একা একা যাবার কথা ছিল না? আমি কি শানু? না আমি দেবারতি? সঞ্চিতার ছোট বোন হওয়ার সুবাদে সবাই আমাকে এখানে ডাকনামে চেনে। সহসা ওই ডাকনামকে ঘেন্না করে ফেলি আমি। শানুকে আমার অসহ্য মনে হয়। স্কুলে আমি দেবারতি ছিলাম, কলেজে আমি দেবারতি ছিলাম, যে ছোট চাকরিটি করেছি আমি, সেখানেও ছিলাম দেবারতি, আমার নাটকের দলেও শানু নামের কোনও অস্তিত্ব ছিল না আমার। ফের দেবারতি হয়ে ওঠার জন্য আমার প্রাণ ছটফট করে। আমি নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকি ফুটপাথে। আমার পাশ ঘেঁষে সাঁই-সাঁই করে ট্রাক যায়। বাস যায়। লোক পাশ কাটিয়ে যায় আর শিবানন্দ মৃদু ধমক দেয় আমাকে। অতঃপর আমি ওকে চিনতে পারি। ও বলে—কোথায় যাচ্ছ? কথা বলছ না কেন?

আমি ওর চোখের দিকে তাকাই। সরাসরি তাকাই। বলি— ম্যাটাডর ভাড়া করতে।

ও বিস্মিত হয়। বলে— ম্যাটাডর? কেন?

আমার সঙ্গে, ওর সদ্যবিবাহিতা পুত্রবধূর সঙ্গে ম্যাটাডরের কী সম্পর্ক থাকতে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পারে, ও বোঝে না, আমি টের পাই। বলি— ওয়ার্ডরোবটা ম্যাটাডর ছাড়া আনা যাবে না যে।

—ওয়ার্ডরোব?

ওর ভ্রূ কুঁচকে যায়। আমি অপলক ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার মধ্যে ভয় কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। ভয়ের সঙ্গে যুঝতে থাকি আমি। প্রতীক্ষা করি, শিবানন্দ রাগে ফেটে পড়বে এখুনি এবং আমাকে বাধ্য করবে ফিরে যেতে। কুভাষ্য বলবে ও ওর স্ত্রীর মতো, বোনদের মতো, বোনের স্বামীদের মতো। আমি কী করব তখন? শ্বশুরকে সম্মান করতে হয় বলে চুপ করে থাকব? মেনে নেওয়া ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই বলে চুপ করে থাকব? আমি দিশেহারা বোধ করতে থাকি, আর ও বলে— তোমার ওয়ার্ডরোব? তুমি আনতে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

আমি স্বীকার করি। আঁকড়ে ধরি মুঠো ভর্তি টাকা। যুযুধান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। আজ আনবই। আনবই। যা হয় হোক।

তখন ও বলে— তুমি যাচ্ছ কেন? নীলু কী করছে?

—ও পারবে না।

সহসা ওর চোখে স্নেহকোমল ছায়া দেখতে পাই আমি। নিবিড় দৃষ্টি হতে বাৎসল্য ঝরে পড়ে টুপটাপ। আমি আর্দ্র হয়ে যাই। কাঙালের মতো ওই স্নেহনির্ঝরের তলায় হাত পেতে দাঁড়াই। এই এক মাসে আমি যে কেবল ছ্যাঁকা খেয়েছি এই বাড়িতে। শান্তি পাইনি, আশ্রয় পাইনি, আনন্দ পাইনি। সুতরাং, তেজ প্রশমিত হয়। উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসে। ও বলে— চলো। বাড়ি চলো। আমি এনে দেব তোমার ওয়ার্ডরোব।

BanglaBook.org

সেই ওয়ার্ডরোবে ও দাঁড়িয়ে আছে ঠেস দিয়ে। আর আমি ওর মুখোমুখি।

সেদিন কিন্তু ও আমার মুখোমুখি হয়নি সারাদিন। বোধহয় আমি বেরিয়ে যাবার পর ও মাধবীকে সব বলেছিল। আমি যখন শিবানন্দর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকি তখন, দিদি ও নির্মলদা ছাড়া, বাড়ির সকল তরফ মাধবীর সামনে সমবেত হয়েছে। মাধবী ডুকরে উঠছে— কী সর্বনাশা মেয়ে! এ তো মানুষ খুন করতে পারে!

আমি নির্বিকার মুখে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি। সঙ্গে শিবানন্দ। ও বলে— কাঁদছ কেন? হয়েছেটা কী?

মাধবী বলে, ডাকাত মেয়ে! নিজে যাচ্ছিল ম্যাটাডরে করে ওয়ার্ডরোব আনতে।

এই কর্মটির জন্য নিজেকে আমার ডাকাতে মনে হয়নি যদিও। কারণ আমার কাছে ম্যাটাডর ভাড়া করা খুব স্বাভাবিক কাজ। হস্টেলের সরস্বতী পুজোয় আমরাই ম্যাটাডর ভাড়া করে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা এনেছি। আমাদের নাটকের দলের যত শো হয়েছে, তার সব সেট আমরা প্রত্যেকবার ম্যাটাডরেই মঞ্চে নিয়ে গেছি। এমনকী পিকনিকও করতে গেছি ওই ভ্যানেই। নীল প্রথমবার দেখে বলেছিল— ছিঃ! ম্যাটাডর ভ্যানে পিকনিকে যাও! কী গাঁইয়া!

আমি বলেছিলাম— আমাদের বাস ভাড়া করার টাকা নেই। যে যার সামর্থ্য মতো চলে। এতে গাঁইয়ার কী হল!

ও গ্রাম্যতা ঘৃণা করে। আমি জানি। ওর সঙ্গে প্রথমবার কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমি হাত দিয়ে চিকেন খেয়েছিলাম। এ পর্যন্ত ও মুখ বুজে সহ্য করেছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল আমি সারা হাত ভরিয়ে ঝোল মেখেছি, আর ন্যাপকিনে মোছার তৃপ্তি না পেয়ে ওয়েটারকে জিগ্যেস করেছি বেসিন কোথায়— ও তখন দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে বলেছিল গাঁইয়া।

আমি গায়ে মাখিনি ওর বিরক্তি। ধরে হাতে মাখামাখি করে খেয়ে, থালা চেটে, আঙুল চেটে আমি ওর বিরক্তি ঘটিয়ে আরাম পেয়েছি বরাবর।

BanglaBook.org

এখন অবশ্য এ প্রসঙ্গ আসে না। এখন আমার মধ্যে ডাকাতিয়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সকলে আমাকে দেখছে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে। শিবানন্দ বলছে— গেছিল, গেছিল! আনেনি তো! দোষ তো আমাদেরই। আরও আগেই ওটা আমাদের এনে দেওয়া উচিত ছিল। আমি যাচ্ছি।

মাধবী আর্তনাদ করে— কোথায়? কোথায় যাচ্ছ?

—ওয়ার্ডরোব আনতে।

—চিরকাল, চিরকাল লোকটা এই ভাবে আমাকে অপমান করে গেল। চিরকাল আর সকলে যেটা চাইবে, ও তার উল্টোটা করবে। দান-সামগ্রীর অবস্থা দেখে তোমার বোনেরা সারা রাত্রি হা-হুতাশ করেছে। তুমিও বলেছ ওটা আনার যোগ্য নয়। এখন তুমিই যাচ্ছ?

শিবানন্দ কোনও কথা বলে না। সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে যায়। অন্যরাও, নাটক তেমন জমল না দেখে সরে পড়ে। আমি আমার আধো অন্ধকার ঘরে দাঁড়াই। ভাবি, কোথায় ওকে রাখব। দুটি জানালা এ ঘরে। দরজা চারটি। একটি জানালা খোলা যায় না কারণ ও পাশেই রান্নার আয়োজন। অন্য জানালার বাইরে বিরাট বারান্দা। বছরে একবার সে বারান্দায় দুর্গাপূজা হয়। আলো-বাতাস সেই বারান্দা পেরিয়ে আমার ঘরে পৌঁছয় অল্পই। তিনটে দরজার একটি ভাঁড়ার ঘরে যাবার জন্য। একটি খাবার ঘরের লাগোয়া। অন্যটি মাধবী ও শিবানন্দর শয়নকক্ষে যাবার পথ। মাঝে একটি ছোট ঘর বসার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ছোট বসার ঘরের এক পাশে মাধবীদের শোবার ঘর। এক পাশে আমাদের। আর আমাদের ঘরটি হল বাড়ির সকল অংশের সংযোগস্থল। কারণ চতুর্থ দরজাটি খুললেই পাওয়া যায় দোতলায় যাবার সিঁড়ির তলায় ভেতরবাড়িতে ঢোকার দরজা। বাইরের লোকেরা বসার ঘরের মধ্যে আসে বারান্দা থেকে সরাসরি। ও ঘরের দরজা ব্যবহার করে। বাড়ির লোক আসে বারান্দা পেরিয়ে এই সিঁড়িঘরের মধ্যে দিয়ে।

সিঁড়িঘরের সংলগ্ন দরজাটা আমরা বন্ধ রেখেছি। কিন্তু ব্যবস্থা করতে হয়েছে এমন যে দরকার হলেই তাকে খোলা যাবে। এ দিকের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি দেওয়াল আলমারি। কিছু কাচের বাসনপত্র ছাড়া হাজার হাবি-জাবি জিনিসে ঠাসা। সেখানে আমি হাত দিইনি এখনও। আমার এক ট্রাঙ্ক ভর্তি বই এখনও বার করিনি। ওয়ার্ডরোব এসে গেলে আমি ওর চওড়া মাথায় বই রাখতে পারব। আমার মন খুশি হয়ে যায় হঠাৎ এবং দক্ষিণের দেওয়ালে ওর জন্য জায়গা নির্ধারিত করি আমি।

BanglaBook.org

আজও, এই দক্ষিণের দেওয়ালেই ও আছে। এই সাত বছরে ওর গায়ে আর পালিশ পড়েনি। ও ব্যবহৃতই হয়েছে কেবল। খানিক মোছামুছি করা ছাড়া ওর বিশেষ যত্ন আমি নিতে পারিনি। ও তার জন্য অভিমান করেনি। রাগ করেনি আমার ওপর। শুধু ও নয়। খাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল— সবাই খুব সমঝদার। আমার কাছে ওরা জড়বস্তু মাত্র নয়। ওরা সচেতন। আমার শোক-বিষাদ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আমি দেখেছি।

এখন ও বিষণ্ণ। কারণ আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি; আবার, ও বেশ সুখীও। কারণ গত সাত বছর ধরে যে সিদ্ধান্তের সাধনা আমি করেছি, আজ তার পূর্ণতার দিন। আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। ওর হাত অল্প অল্প কাঁপছে। ওর ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপছে। আমার হাসি পাচ্ছে। কুড়কুড় করে হাসি পাচ্ছে। নীল আবেগপ্রবণ হচ্ছে নাকি? কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ত্যাগের সকাল-দুপুর

জুলাই মাস এটা। বৃষ্টিও হতে পারে, রোদ্দুরও। আজ সকাল থেকে রোদ। আমার সুবিধাই হয়েছে। না হলে দুটো স্যুটকেস নিয়ে বেশ বিপদে পড়তাম। বড় ভি আই পি-টা, যেটা ছোটমামা দিয়েছিল, তাতে ঠেসে বই ভরেছি। কলেজ জীবনের সঙ্গী ছোট ডাকব্যাকের স্যুটকেসটায় আমার জামাকাপড়। কাল সারা বিকেল ধরে আমি গুছিয়েছি এই সব। যত বেশি সংখ্যক বই সম্ভব, নিয়েছি। একটিও বই ফেলে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। যত বই এ বাড়িতে আমি সঙ্গে এনেছিলাম, এই সাত বছরে, আমার ক্রয়ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও, কিছু জমেছে। স্যুটকেসে যাদের ঠাঁই মিলল তারা চলল। জামাকাপড় বিশেষ নিইনি। এ বাড়ির দেওয়া একটি পোশাকও নিইনি। সব আলমারি ভরে রইল। অন্যদের দেওয়া উপহারের শাড়ি জমেছিল বেশ। তার মধ্যে থেকে কিছু বেছে দিদিকে দিয়েছি। কিছু বিলিয়েছি কাজের লোকদের মধ্যে। তারা বলেছে— এত ভাল ভাল শাড়ি, সব দিয়ে দিচ্ছ কেন বউদি?

আমি বলেছি— পোরো। তোমরা পরলে আমার ভাল লাগবে।

দিদি শাড়িগুলো হাতে নিয়ে কেঁদে ফেলেছে। বলেছে— তুই কেন এগুলো দিচ্ছিস? আমি এগুলো পরব না। রেখে দেব। তুই যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিস।

আমি বলেছি— অত শাড়ি নিয়ে কী করব আমি? তুই পর।

ও নিঃশব্দে কেঁদেছে। আমার ভাঙনে কেঁদেছে। অথচ, ছ'বছর আগে আমি যখন প্রথম ভাঙতে চেয়েছিলাম, ও আমাকে সমর্থন করেনি। ও আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। সারা বাড়িই তখন প্রতিপক্ষ আমার। অথচ এখন, আজ, আমি জানি, বড় মেজ ছোট তরফের সকলে আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

কাল যখন আমি স্যুটকেস গোছাচ্ছিলাম, এ তরফের কেউ ছিল না। নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। ছোটরা এসেছিল তখন। ঘুর ঘুর করছিল। আমি হাসছিলাম না। গম্ভীর ছিলাম। এ বাড়ি গোড়া থেকে হাসি মুছে দিয়েছে আমার। শুধু এই কুচোদের সঙ্গে থাকলেই আমার যা কিছু হাস্য আসত। ওদের সঙ্গে চোর-ডাকাত খেলি আমি, স্ক্র্যাবল খেলি, নতুন নতুন ইংরাজি শব্দ শেখাই, দরকার মতো ওদের

BanglaBook.org

পড়িয়েও দিই এবং ঘরের আলো নিভিয়ে দেখি জি-হরর শো। পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসি আমরা। কেউ আমার কোলে ঢুকে পড়ে। কেউ কাঁধে মাথা রাখে। ঔ-উ-উ-উ শব্দে কুকুর ডাকলেই, টিভির স্ক্রিন জুড়ে খাওয়া-খাওয়া স্টুডিওর চাঁদ উঠলেই আমরা এ-ওর হাত ধরি। ভূতের আবির্ভাবে ওরা শিউরে ওঠে, আমিও উঠি। ওরা ভয়ে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে, আমিও ধরি। তারপর, দারুণ কৌতূহলের জায়গায় সিরিয়াল শেষ হয়ে গেলে একটু আগেকার ভয় পাবার জন্য হাসিতে ফেটে পড়ি আমরা।

গত সাত বছরে এই পরিবারে এই অধিকারটুকু অর্জন করেছি আমি। জি-হরর শো দেখার অধিকার।

ছোটদের অনুভূতি তীব্র হয় এ আমি বরাবর দেখেছি। ওদের মস্তিষ্ক অর্থহীন জটিলতা দ্বারা প্রতারিত হয় না বলেই এমনটা হয় বলে আমার ধারণা। অতএব, ওরা বসল আমার খাটে গোল হয়ে। এটা-ওটা এগিয়ে দিল আমার হাতে হাতে। তিতলি বলল— কোথায় যাচ্ছ তুমি কাকি?

আমি বলি— যাচ্ছি এক জায়গায়।

তাতান বলে— কোথায় যাচ্ছ, বলো।

আমি চুপ করে থাকি। বলতে পারি না, চলে যাচ্ছি দূরে, ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বলতে পারি না কারণ, যদি ওরা বলে বসে, যেও না তুমি, আমি শুনতে পারব না ওদের কথা, মানতে পারব না। ওদের অমান্য করার বেদনা শুধু ওদের নয়, বাজবে আমাকেও।

তখন তুলতুলি বলে— তুমি বাপের বাড়ি যাচ্ছ কাকি?

তিতির একটু বড়। সে বলে— না। কাকি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে। না, কাকি?

ওরা স্তব্ধ হয়ে যায়। বিস্ময়ে তাকায় আমার দিকে। চিরকালের জন্য চলে যাওয়া মানে কী—ওদের বোধে ধরা দেয় না। এ তো বাড়ি। এ ছেড়ে কেউ কেন চিরকালের মতো চলে যাবে? ওদের জন্য আমার বুকে কষ্ট উথাল-পাথাল করে। এ বাড়ির সকল মায়া আমি ছিন্ন করেছিলাম। কিন্তু ওদের মায়ার কথা আমার আলাদা করে মনে পড়েনি। শিশুর প্রতি এ মায়াটান ধ্রুবসত্যের মতো। আমি তাকে আলাদা করব কী করে?

আমি তিতিরের দিকে তাকাই। বলি— তুই কী করে বুঝলি তিতির?

সত্যিটা স্বীকার করার সুযোগ পেয়ে আমি সদ্ব্যবহার করে ফেলি। শিশুর সারল্যের বৃত্তে ঢুকে পড়ে আমার পরিণত বুদ্ধির জটিল সন্ধান। তিতির আমার

BanglaBook.org

কথা শুনে হাসে। বলে— কেন বুঝব না? তুমি যে স্যুটকেস ভরে বই নিয়েছ কাকি। বাপের বাড়ি গেলে বুঝি কেউ অত বই নেয়?

আমি বলি— বিকেল হল, তোরা খেলতে যা।

ওরা আমার ইচ্ছে বোঝে। চলে যায়। কিন্তু খেলতে যায় না। যে যার মায়ের কাছে খবর দেয়, কাকি চলে যাবে বলে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। দিদি জানে। ওরা জানে না। ওরা আমার সুখহীনতা জেনেছে এই সাত বছরে, আমার অপমান জেনেছে, আমার অশান্তি জেনেছে। আমি, দিদির কাছে ছাড়া, কারওকে বলিনি কিছু। কারও কাছে প্রতিকার চাইনি। আশ্রয় চাইনি। মাধবীর নিন্দে করিনি এক দিনও। তবু ওরা জানে। জেনেছে। ছোটদের কাছে খবর পেয়ে আমার জ্ঞাতি শাশুড়িরা, জায়েরা, ননদেরা নেমে এসেছে নীচে। ওপাশ থেকে এসেছে। ঘিরে ধরেছে আমাকে। বলছে— সত্যি চলে যাচ্ছিস তুই?

আমি সম্মতির ঘাড় হেলাচ্ছি। আপ্যায়ন করছি ওদের। ওরা বলছে— কোথায় যাবি? বাপের বাড়ি?

—না। হস্টেল।

—হস্টেল? ঠিক হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সমবেত শ্বাসপতনের হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে আমার চুল। ওদের কারও সঙ্গেই আমার কোনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কারও জন্যই আমার মনে কোনও ছেড়ে যাবার কষ্ট নেই। গত সাত বছরে ওরা সকলেই সাতশোবার আমার নিন্দে করেছে। আমাকে নিয়ে মাধবীর যত মন্তব্য সব উপভোগ করেছে। কখনও আমার পিঠে স্নেহের হাত রেখে বলেনি— আয়, তুই সিমুইয়ের পায়েস খেতে ভালবাসিস বলে রেখে দিয়েছি এক বাটি।

দিদিকে ওরা করে এমন। সেই থেকে আমি জেনেছি, এই ওদের স্নেহের প্রকাশ। দিদিকে ওরা ভালবেসেছে। কারণ অনেক। আমি আসার অন্তত দশ বছর আগে ওরা এনেছে দিদিকে। পছন্দ করে এনেছে। দিদি শান্ত, সংসারপরায়ণ, সুন্দরী। দিদির কোনও হস্টেলবাসের ইতিহাস নেই। মাটিকের ইতিহাস নেই। এ সবের চেয়ে বড় কথা, নির্মলদা দিদিকে ভালবেসেছে। আসলে, এ ভাবে আলাদা আলাদা করে না দেখে একযোগে বলাই ভাল যে সঞ্চিতাকে ভাল না বাসবার কোনও কারণ নেই। এবং সঞ্চিতারও এই পরিবারকে ভাল না বাসবার কোনও কারণ ঘটেনি।

কিন্তু আমি! তেমন হলাম না। কেন হলাম না? সঞ্চিতার বোন হওয়া সত্ত্বেও

BanglaBook.org

আমি কোনও দিকে ওর মতো নই। অন্য বোনেদের মতো আমাদের নামেও কোনও মিল নেই। তার জন্য আমার কোনও অসুবিধেও নেই। আমি সঞ্চিতা হতে চাইনি কখনও। আমি এ বাড়ির কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইনি, যেমন সাত বছরে কারও সঙ্গে একবারের জন্যও ঝগড়া হয়নি আমার।

তবু আসে ওরা আমার চলে যাবার খবর পেয়ে। আমায় গোল করে ঘিরে বসে। মন্তব্য করে নানাবিধ। খোঁজখবর নেয়। যেন আমার প্রতি একপ্রকার দায়িত্ব ওরা বোধ করে। আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়ের দায়িত্ব। অথবা নারীর প্রতি নারীর। কিংবা এ সব কিছুই না। স্রেফ কৌতূহল। এবং এটাই সত্য।

তবু আমি গুরুত্ব দিই ওদের। এ কথা জেনেশুনেই দিই যে ওদের কথায় আমি সিদ্ধান্ত বদলাব না।

এ বাড়িতে এ ওর কথা সবই জেনে যায়। কিছুই গোপন থাকে না। আমারও সব কথাই ওরা জানে, এই বিশ্বাস আমার আছে। ওরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ছিল। এখন স্মিতমুখে এসেছে। আমি ওদের গুরুত্ব দিচ্ছি। মেজ শাশুড়ি বলছে— চলে যা। চলেই যা। এখানে থাকলে তুই মরে যাবি।

সে কি আর আমি জানি না? এই সাত বছরে আমি মৃত্যুর আরাধনা করেছি কত বার। তার বাড়িয়ে দেওয়া দু'হাতে ধরা দেবার মুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছি নিজেকে। বার বার। বাঁচতে চাই বলেই আমি পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাড়িটা থেকে চলে যাচ্ছি। যদিও, আমি জানি না পরশু বা তার পর দিন আমি বেঁচে থাকব কিনা। দু'হাতে মৃত্যু নিয়ে জীবনের আরাধনা শুরু হবে এ বার। এতটুকু ভুল হলেই পতন ও মৃত্যু। সে বরং ভাল। এই ক্লীব বেঁচে থাকার চেয়ে ভাল।

মেজ জা বলে— তুমি বলে এত কাল সহ্য করলে। আমি হলে মুখে দুই লাথি মেরে চলে যেতাম।

হায়! মেজ জা কী করে জানবে যে লাথি কষানোর জন্যও চাই উপযুক্ত সময়। কিংবা, এমনও বোধ হয় আমার, লাথি কষানোর ভাবনাটি কুৎসিত। তেমন ভাবনাকে আমি প্রশ্রয় দিই কী করে! সংসারের মুখে লাথি মেরে আমি চলে যাচ্ছি— এ চিন্তা আমার মনে আসে না। আমি ছেড়ে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি।

ওরা যে যার মন্তব্য সেরে নেয়। তারপর নীল সম্পর্কে কিছু কথা বলে। আমি চমৎকৃত হই। নীল সম্পর্কে আমি যা জানি তা-ই বিস্তর। ওরা বিস্তৃততর জানে। বলে, এত দিন বলিনি তুমি কষ্ট পাবে বলে।

তা বেশ! এখন ওরা যথার্থই বুঝেছে আমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি অনাগ্রহে শুনি সব কথা। ছেড়ে যাবার ঠিক আঠারো ঘণ্টা আগে আমার জানা

BanglaBook.org

সম্প্রসারিত করি। সদ্য এম এ করা তুখোড় ননদিনি আমার, ফুঁসে উঠে বলে— আরও আগেই তোমার এ কাজ করা উচিত ছিল। কেন তুমি পড়ে রইলে?

মেজ শাশুড়ি বলে— সবই তো বুঝলাম। বাড়িতে জানে?

—জানে।

—বাবার মত আছে?

—আছে।

—তোর চলবে কী করে?

—একটা চাকরি পেয়েছি।

কথাটা বলার সময় আমার আত্মবিশ্বাস একটু টলে গেল বুঝি। আমার চাকরির অসামান্যতা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আজ তা আছে, কাল নাই থাকতে পারে। এমনকী মাইনে না পেতে পারি আমি। এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে চাকরিটা আমিই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

আসল কথা কোনও নিশ্চয়তা নেই। কোনও জোর নেই আমার। কিন্তু কারও কাছে আমি তা প্রকাশ করিনি। আমি ভাব দেখিয়েছি এমন যেন আমি বেশ আঁট-ঘাট বেঁধে নামছি। এই প্রদর্শনই আমার জোর। এই দুর্বলতাকে অস্বীকার করাই আমার জোর। আমি জানি, আমি শেষ অবধি বেঁচে যাব। নয়তো মরে যাব। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। আমার হারাবারও নেই কিছু।

এ বার একটি সাবধানবাণী উঠে আসে। ছোট শাশুড়ি বলে— তোকে আলাদা করে বলার কিছু নেই। তবু, এটা তো জানিস, বাইরের জগৎ খুব সহজ নয়। মেয়েদের পক্ষে একলা জীবন বেছে নেওয়া খুবই কঠিন। সাবধানে থাকবি। কারওকে বিশ্বাস করবি না।

আমি মাথা নাড়ি। সে জগৎ সহজ নয়, সে জগতের জীবন কঠিন— এ আর বেশি কথা কী! নতুন কথাও কিছু নয়। আমি সহজের বিপরীতে কঠিন শব্দটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করি। খেলাই করি বস্তুত। সহজের বিপরীত কঠিন, তরলের বিপরীতও কঠিন, নরমের বিপরীতও হতে পারে কঠিন। সেই মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করি, কঠিন শব্দটার মধ্যেই কাঠিন্য নিহিত আছে। এ শব্দ যা অভিব্যক্ত করতে চায়, তাকে এর বাইরে অন্য কোনও ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা প্রকাশ করা যেত না।

এ ঘরে সন্ধ্যা লেগে থাকে সারাদিনই। এমন সব কথার মাঝে সে-সন্ধ্যা জমে ওঠে, অন্ধকার গাঢ় হয়, এখনই শাশুড়ির মুখগুলি আবছা লাগে আমার। মনে হয়, এরা কেউ ছিল না আমার, কেউ কিছু হয়ে থাকবে না। বাসের সহযাত্রীর মতো

BanglaBook.org

এই দেখাশোনা। তা হলে এদের গুরুত্ব কী? এদের মতামতকে আমি, আপাতভাবে হলেও, গ্রাহ্য করছি কেন? এদের সমর্থন আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে জয়ের উল্লাস— তা আমি অস্বীকার করতে পারি না। কেন? তা কেন?

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া মুখগুলি সে-জবাব দেয় আমাকে। আসলে, ওদের সমর্থন প্রয়োজন আমার দিদির জন্য। সঞ্চিতার বোন দেবারতি যুক্তিহীনভাবে চলে গেলে সঞ্চিতা বিদ্ধ হবে। সে দায় আমি এড়াতে পারিনি কখনও। আমার ছেড়ে যাবার তপস্যায় এই যুক্তিনির্মাণই ছিল প্রধান এবং একমাত্র কাজ।

আমি দিদিকে রেখে যাচ্ছি। আমার ভরসা নির্মলদা দিদির পাশে আছে। আমার ভরসা গোটা পরিবারের সঙ্গে গড়ে উঠেছে ওর আত্মীয়তা এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি, ওই প্রগাঢ় সন্ধ্যায়, কঠিন জমাট অন্ধকারে হাত রাখলাম আর দিদির সঙ্গে এই পরিবারের গভীর সম্পর্ককে শ্রদ্ধা সম্মান জানাতে জ্বেলে দিলাম আলো।

তখন, ঘরে ঢুকল নীল।

ঘরে ঢুকল নীল আর সবার সব কথা, আলোচনা থেমে গেল। ও সমবেত পরিজন দেখল, আমার গুছিয়ে রাখা স্যুটকেস দেখল। ওর চোয়াল শক্ত হল। সুন্দর, মসৃণ গালে লাগল দৃঢ়তা, লাগল কাঠিন্য। এসেছিল যারা, একে একে ফিরে গেল ঘরে। রইল কেবল তুখোড় ননদিনি। ওর শাণিত দৃষ্টি আমার চোখে ধরা দিল। সমাজবিদ্যা পড়া মেয়ে। তা ছাড়া এই প্রতিবাদের বয়স। ওর মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে অঙ্কে সাহায্য করেছি কত! এখন অগ্নিশিখার মতো ও টানটান। সম্পূর্ণ। ওকে ভালবেসে ফেলি আমি সেই মুহূর্তে। ঠিক এই বয়সে আমি পথ হারিয়েছিলাম। এ বাড়িতে পা দিয়েছিলাম। বারান্দায় পা রাখতেই লোডশেডিং হয়েছিল। স্টোভে বসানো দুধ আমি দেখার আগেই উথলে উঠে স্টোভ নিবিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে অলক্ষণ দেখেছিল ওরা। আমি, সকল কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থাকতে গিয়ে দেখেছিলাম অলক্ষণের শুরু অনেক আগেই। আমার কিছু করার ছিল না— এই যা।

ওরা, দুই জ্ঞাতি ভাইবোন তখন মুখোমুখি। আমি ওদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন গড়ে উঠতে দেখি। এবং আমার সামনে সেই সব প্রশ্নের দ্বিধা ও জড়িমা লক্ষ করে আমি পাশের ঘরে চলে যাই। গোল খাবার টেবিলে বসি। এ কথা ভেবে আমার পুলক জাগে যে আজকের রাত এবং খুব বেশি হলে কালকের দুপুর— তারপর আর এই টেবিলের এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করতে হবে না আমাকে। গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে সকালে পাঁচ ঘণ্টা, সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে না। ডাঁই কাপড়

BanglaBook.org

কাচতে হবে না আমাকে। ঝি না এলে তার পরিবর্ত হিসেবে উঠোনে বসতে হবে না এঁটো বাসনের স্তূপ নিয়ে। দু'হাতে কাচা কাপড়ের বালতি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে হবে না তেতলার ছাদে— এবং আরও কত কিছুই নিত্য, দৈনন্দিন, আবশ্যিক কর্ম আমাকে করতে হবে না আর।

পুলকে, খুশিতে আমি টোকা মারি গোল টেবিলটায় আর শুনতে পাই প্রশ্ন— শানুবউদি চলে যাবে বলছে।

উত্তরও শুনতে পাই— জানি। দেখছি।

—তুমি কিছু বলবে না নীলুদা?

—কী বলব?

—ওকে আটকাবে না?

—ওর ইচ্ছে হলে থাকবে। ওর ইচ্ছে হলে যাবে। আমার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

আমার একটু আগেকার পুলক উধাও হয়ে যায়। কান ঝাঁ-ঝাঁ করে অপমানে। অজস্র চড়াই শালিখ কিচিরমিচির লাগিয়ে দেয় আমার মস্তিষ্ক জুড়ে। আর কোনও প্রশ্ন উত্তর কানে ঢোকে না আমার। আমি পাথরের মতো বসে থাকি। ননদিনি চলে যায় কখন জানতেও পারি না। মুহ্যমানের মতো উঠি এক সময়। গ্যাস জ্বালি। ভাত বসাই চাল ধুয়ে। ফ্রিজ থেকে বার করি মাছের টুকরো। বোঝাই যাচ্ছে নীল নেমন্তন্নে যায়নি। অতএব আমার আর নীলের রান্নার আয়োজন করি নিখুঁত। কিন্তু আমার মাথা জুড়ে পাখিরা জেগেই থাকে কেবল। রাত্রি নামলেও তারা ঘুমোতে পারে না। যে-গাছে ওদের বাসা তারই গা ঘেঁষে জ্বলে থাকা সোডিয়াম ভেপারের তীব্র কমলা আলো ওদের অস্থির করে রাখে। ওদের জন্য চিন্তিত বোধ করি আমি। আলো নিভিয়ে দিতে চাই। সুইচ অফ করি, তবু সে নেভে না। ঢিল ছুড়ি বাল্ব লক্ষ করে, ঢিল ফসকে যায়। আমি অন্যমনস্ক তেল দিই কড়ায়। তেল না ফুটতেই দিয়ে দিই নুন-হলুদ মাখা কাঁচা মাছের টুকরো। কাঁচা তেলে মাছ কড়ায় আটকে যায়। আমি খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলি তাদের। খুন্তিতে লেগে থাকা জল তেলে পড়ে বিস্ফার ঘটায়। গরম তেল ছিটকে আমার মুখে লাগে। গলায় লাগে। আমি গ্যাস না কমিয়েই ছুটে যাই বেসিনের কাছে। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিই। বার বার, বার বার। তারা আমার ফোস্কা রোধ করে। কিন্তু হালকা লালের আভা লেগে থাকে আমার গালে এবং জ্বালা করে। তীব্র জ্বালা করে। মাছের এক পিঠ সাঁতলানোর বদলে পোড়া পোড়া হয়ে গেছে। তার জন্য আমার কোনও উদ্বেগ হয় না অন্য দিনের মতো। হয় না কারণ আমি

BanglaBook.org

জানি, আজ গোলটেবিলে আমার রান্নার সমালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমি মাছ নামিয়ে তেল ঢালি ফের। সময় দিই তাকে তাতবার। গালের জ্বালায় আঙুল ছোঁয়াই। সে আরও তীব্র জ্বলে ওঠে। আর আমার ঘোর কাটে। ধীরে ধীরে ঘোর কাটে। আমি গরম তেলে কালোজিরে কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিই, গ্যাস কমাতে ভুলি না, আমার মাথার মধ্যে পাখিরা ঘুমোয়। সোডিয়াম ভেপার স্তিমিত হয়ে আসে। আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হই এ বার। আত্মসমালোচনা করি। কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাই নিজেকে। ওর কথায় অপমানিত বোধ করলাম কেন আমি? বিচলিত হলাম কেন? আমি, অন্তত নিজের কাছে, অস্বীকার কেমন করে করি, আমার ওকে ত্যাগ করার বহু আগেই আমি ত্যক্ত হয়েছি নিজেই! এত দিনের এত দুর্যোগের মধ্যে প্রধান বিষয় কি এই-ই ছিল না, যে ও আমাকে অস্বীকার করছিল? আমার অস্তিত্বকে, আমার সম্মানকে অস্বীকার করছিল!

কী ভেবেছিলাম আমি? কীসের অপেক্ষা করছিলাম? ও আমার গলা জড়িয়ে ধরবে? বলবে— যেয়ো না, থাকো, থাকো!

না।

যদি বলে, যদি বলত, আমি কি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতাম?

না।

আমি কি বিশ্বাস করতাম ওর ওই মুহূর্তের আবেগ? আবেদন? যদি ও বলে, যদি বলত—শানু, চলো আবার প্রথম থেকে শুরু করি!

না।

তা হলে? কেন আমি স্তম্ভিত ওর কথায়? কেন বিমূঢ়? হতে পারে, যে-অপমান ওর ক্রিয়াদি মাধ্যমে আমায় করেছে এত কাল, তা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ছিল নিরুচ্চার। আজ তা উচ্চারিত হল খোলাখুলি। তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে খুল্লমখুল্লা হয়ে গেল একেবারে। আমার কান তা সহ্য করতে পারল না বলে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। আমার মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারল না বলে ডুকরে উঠল পাখিরা। হৃদয় সহ্য করতে পারল না বলে স্থবির হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রহার সহ্য না করে আমার উপায় কী! আমি ওর কলার ধরে ঝাঁকাতে পারি না। বলতে পারি না— আমি তোমার বউ। যাব না তোমাকে ছেড়ে। বলতে পারি না— থাকতে বলো, থাকতে বলো আমাকে...

এবং বলতে চাই না।

ঠিক এক মাস আগে আমি বলেছিলাম ওদের, পরিষ্কার বলেছিলাম— পনেরোই জুলাই আমি চলে যাব। এর মধ্যে যদি [redacted] বলার থাকে

BanglaBook.org

আমাকে, যদি কোনও আলোচনা থাকে আমার সঙ্গে, সময় রইল।

কেউ আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। নীল, সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, সেল ফোনের রিংটোন একের পর এক শুনতে শুনতে বলেছিল— তোমার যাবার জায়গা কোথায়?

আজ সকালে উঠেছি। দরজা খুলেছি একই ভঙ্গিতে, যেমন খুলি গত সাত বছর। একই ভাবে মুখ ধুয়ে বেসিন পরিষ্কার করেছি। আমি এ বাড়িতে আসার পর মাধবী বলেছিল, আমি বেসিনে মুখ ধুয়ে যাবার পর ওর মুখ ধুতে ঘেন্না করে। আমি তাই বেসিন ব্রাশ ও ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করি নিত্য দু'বেলা। দু'বেলা আমার দাঁতের মতো মাজি ওকে। ফলে ও আমার দাঁতের মতোই কোলগেট ঝকঝকে এবং সাদা।

প্রথম বছর চারেক মাধবী আমার বিছানাতেও বসত না কখনও। ওর ঘেন্না লাগত। অথচ আমার বিছানায় সবসময় পরিষ্কার চাদর পাতা থাকে। বেডকভারে আড়াল থাকে চাদরের নিদাগ শুভ্রতা। সাদা চাদর ছাড়া শুতে পারি না আমি কোনও দিন। রঙিনে শুলে আমার পিঠ কুটকুট করে। এখন, সেই সাদায় কোনও মিলনের দাগও থাকে না। তবু ঘেন্না করে মাধবীর। কোনও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বলতে পারবে না আমার গায়ে ঘা পাঁচড়া দাদ চুলকুনি হয়েছে কোনও দিন। শুঁয়োপোকা লেগে লাল চাকা-চাকা হওয়া ছাড়া আর কোনও বিকৃতি ঘটেনি কখনও আমার ত্বকে। এমনকী গালে একটা ব্রণও হয়নি কখনও। তবু ঘেন্না করে মাধবীর। শিবানন্দ কোনও দিন আমার বিছানায় বসলে মাধবী জোর করে ওকে তুলে দেয়। বলে, লোকটার আর আক্কেল হল না।

শিবানন্দ ওর বেআক্কেলে মুখ নিয়ে মাধবীর দিকে তাকায়। এ বিছানায় বসার অপরাধ কী বোঝে না। কিন্তু এ নিয়ে তর্কও করে না। তর্ক করতে, ঝগড়া করতে ভালবাসে না মানুষটা। ওর এই স্বভাবের জন্য সংসারের অনেক ঔচিত্য থমকে থাকে। তবু আমি ওর ওপর রাগ করতে পারি না। খারাপ ভাবতে পারি না ওকে। বরং, ওর পায়ে বিতর্কিত ঘা ফুটে উঠলে মাধবী তার দায়িত্ব নেয় না। আমি, শিবানন্দর চোখে ফুটে ওঠা স্নেহভাবনার কবলে পড়ে যাওয়া আমি, গরম জল আর তুলো নিয়ে বসি ওর পায়ের কাছে। ও লজ্জা পায়। বলে —থাক। আমি নিচ্ছি করে।

গোড়ালির দিকে বিষিয়ে ওঠা ঘা নিজের পক্ষে পরিষ্কার করা শক্ত। আমি গরম জলে তুলো ভিজিয়ে চেপে চেপে পরিষ্কার করি রক্ত-পুঁজ। প্রলেপ দিই ওষুধের। ওর হাত নেমে আসে আমার মাথায়। নিরুচ্চারে আমাদের মধ্যে একটি

BanglaBook.org

সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রয়াস নেয়। যেমন বাবার সঙ্গে মেয়ের। এক স্নেহের, শ্রদ্ধার, নির্ভরতার সম্পর্ক। কিন্তু সেই প্রয়াস পূর্ণ হয় না। শ্বশুর আর পুত্রবধূর সম্পর্কের মধ্যেই তা দড়কচা মেরে যায়। কারণ একদিন ও আমার দিকে বাড়িয়ে দিল একবাটি লাল ডালিমদানা। বলল— খাও।

ও নিজেও খাচ্ছিল ওই বাটি থেকে। আমি নিলাম একমুঠো। চিবোলাম। শিবানন্দও একমুঠো নিল, নিয়ে চিবোল। ছিবড়ে ফেলছিলাম দু' জনেই একটি খবরের কাগজের ওপর। সারা পৃথিবী জুড়ে দুধ খাচ্ছে গণেশ— এ খবর চাপা পড়ছিল আমাদের ছিবড়ের তলায়। ও বলছিল— তুমি শরদিন্দু পড়েছ?

আমি বলি— পড়েছি।

—ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েছ?

—পড়েছি।

আলোচনা জমে ওঠে আমাদের। কী আশ্চর্য সুন্দর ভাষা মানুষটার! কী জ্ঞান! তৎসম শব্দের ওই সাবলীল ব্যবহার— অথচ আমাদের অভিধান দেখতেই হয়।

একই বাটি থেকে দু'জনে মুঠো মুঠো ডালিমদানা তুলি, ছিবড়ে ফেলি আর কথা বলি। একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায় আমার। টিংকুদিদের বাড়িতে গিয়েছি একদিন। দেখি বারান্দায় বসে আছে টিংকুদির বাবা। তার লুঙ্গির কোঁচড়ে বড় বড় পাকা টোপাকুল। টিংকুদি আর টাবুদা দু'জনে দু'পাশে বসে বাবার কোঁচড় থেকে কুল নিয়ে খাচ্ছে। বাবাও খায়, ছেলেমেয়েরাও খায়। আমি তখন ছয় কি সাত। তবু, ওই দৃশ্য আমাকে মোহিত করেছিল। এমনকী বুভুক্ষু করেছিল। আমি তখনই জানতাম, আমাদের বাবার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা সম্ভব নয়। আমি জানি বাবা খুব দূরের কেউ। সে শুধু স্বপ্নতারার মতো নেমে আসে, যদি জ্বর হয়, অসুখ করে যদি। সে তখন উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে মাথার কাছে জেগে বসে থাকে সারারাত। হাতপাখা দিয়ে অক্লান্ত বাতাস করে কেন না আমাদের বিদ্যুৎ-পাখা নেই। সে জ্বরতপ্ত কপালে জলপটি দেয়। মাথা টিপে দেয় যত্নে। চোখের পাতা টেনে দেখে রক্তাল্পতা হল কিনা। আপিসে গিয়ে ঘন্টায় ঘন্টায় চৌকিদারের হাতে চিরকুট লিখে পাঠায় মাকে। লেখে— থার্মোমিটারে মাপিয়া জানাও শানুর এখন জ্বর কত। পায়খানায় গিয়াছিল কি? মলের রং কী রূপ? মলের সঙ্গে কি আম পড়িয়াছিল? গন্ধ কি একটু টক-টক?

মা যথাসাধ্য বর্ণনা করে মলমূত্রাদির। আমরা ওষুধ খাই। পথ্য খাই। সেরে উঠি। লকলকিয়ে উঠি যত্নে। আর বাবা আবার দূরের হয়ে যায়। গম্ভীর, জটিল, রাগী।

BanglaBook.org

ওরই মধ্যে ছিল বাবার উপচানো স্নেহ। ছেলেবেলার স্পর্শকাঙাল মন তাতে তুষ্ট থাকেনি। সে চাইত কোঁচড়ে কুল নিয়ে বসে খাবার ঘনিষ্ঠতা। সেই চাওয়া আমার বুকের মধ্যে কাঙাল হয়ে আছে। সে-কাঙাল বুঝি কিছু তৃপ্তি পাচ্ছিল ওই ডালিমদানায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস অধিকতর মিষ্ট লাগছিল রসনায়— তখন ও এল। থমকে দেখল দৃশ্য। মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল— ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

মোট সাতটা ছি বলেছিল মাধবী, আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘৃণা মিশিয়ে বলেছিল— পাপের আর বাকি রাখলে না কিছু?

—কীসের পাপ?

বলছে শিবানন্দ। আমি তাকিয়ে আছি। ইচ্ছে করছে সবগুলো দানা উগড়ে দিই। সাজাই। আস্ত একটা ডালিম বানাই ফের। তাকে গাছে ঝুলিয়ে রেখে আসি। পৃথিবীতে আর কেউ যেন কোনও দিন ডালিম না খায়।

—শ্বশুর-বউ এক বাটি থেকে খাচ্ছ। কোনও দিন দেখব এক বিছানায় শুচ্ছ।

শিবানন্দ ডালিমের বাটি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে গিয়ে নর্দমায় ঢেলে দেয় সব।

পরদিন শাশুড়ি আমাকে শাসায়। আমার আর একটু লজ্জাশরম থাকা উচিত তা বলে। সারা বাড়ি আমার নির্লজ্জতার কথা জেনে যায়। ফোনে ফোনে খবর চলে যায় বাইরের আত্মীয়দের কাছে। ডালিমদানা অসংখ্য রক্তবিন্দু হয়ে আমার দু'চোখ থেকে ঝরে পড়ে। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আমি আঁকড়ে ধরি নিজেকেই। দোল দিই নিজেকেই। আর কাঁদি। শাওয়ারের জলে আমার আকাঙ্ক্ষা ভেসে যায়। আমি স্পষ্টই তাকে দেখি সাবানের ফেনার মতো, বুদ্বুদের মতো, চলে যাচ্ছে অনায়াস নর্দমায়।

তবু আমার নির্লজ্জতা যায় না। এক শীতের দুপুরে শিবানন্দ তোয়ালে পরে দাঁড়ায় যখন, আমি দেখি ওর ফেটে যাওয়া পিঠ। দেখি জরা লাগতে থাকা ত্বকের ভাঁজে ভাঁজে তেলের অভাব। দেখি ওর পিঠ পর্যন্ত তেল লাগাতে চাওয়ার অক্ষমতা। আমি এগিয়ে যাই। বলি— দিন, আমি পিঠে তেল দিয়ে দিচ্ছি।

শিবানন্দ বলে— দেবে? দাও।

আমি তেল মাখাই শিবানন্দর পিঠে। মাধবী দেখে। ডুকরে বলে— এ কী শুরু করলে তোমরা?

আমার হাত থেকে তেলের বাটি পড়ে যায়। মাধবী ছুটে চলে যায় শোবার ঘরে। দোর দেয়। সারা দিন মর্গের মতো দুর্গন্ধ ছেয়ে থাকে বাড়িটায়। রাত্রে

BanglaBook.org

নীলের মুখোমুখি হই আমি। কাঁদি। আবোল-তাবোল বলি। যত ক্ষোভ উগড়ে দিই ওকে। ও, ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা পড়ে। আমার কথার কোনও জবাব দেয় না। তর্ক করে না আমার সঙ্গে। আমাকে সমর্থনও করে না। একসময় আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসে না। আমি পায়ে পায়ে উঠোনে দাঁড়াই। ঝুঁকে পড়ি কুয়োর ওপর। ঝাঁপ দিতে আমার ইচ্ছে করে। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ়তর অন্ধকারে লুকোতে ইচ্ছে করে মুখ। আমি দু'হাতে চাপ দিয়ে কুয়োর পাঁচিলে উঠতে যাই। হঠাৎ মনে হয়, আমার ডায়রিগুলোর কী হবে? আমার চিঠিপত্রের? আমার ছবিগুলোর। বন্ধুদের চিঠি, ছবি, ডায়রিতে লেখা অজস্র কথা আমার— আমাকে কুয়োর পাড় থেকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কুয়োয় ঝাঁপ দেয় আমার শিবানন্দর মেয়ে হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

তার জন্য আজ আর আমার কোনও কষ্ট নেই। কারণ আমি যখন ছাড়ি, সম্পূর্ণ ছাড়ি। পিছুডাকের কোনও সম্ভাবনা না রেখে ছেড়ে যাই। শিবানন্দর জন্যও আমার কোনও টান আমি রাখিনি। আজ সকাল থেকে অভ্যাসমতো করে চলেছি সব। এবং তার সঙ্গে কতক দায়বদ্ধতায়। আর কিছু না হোক, ওরা আমাকে খেতে-পরতে দিয়েছে, কলকাতা শহরে দিয়েছে আস্ত একখানা থাকার ঘর। এ সবের মূল্য ধরে দিই, তার ক্ষমতা আমার ছিল না। কৃতজ্ঞতাবোধ আছে আমার। বিবেকবুদ্ধি আছে। ওদের ঋণ, এই শেষ দিন পর্যন্ত খেটে, আমি পরিশোধ করে দিতে চাই।

আমার স্যুটকেস গোছানো দেখে মাধবী ও শিবানন্দ কোনও প্রশ্ন আমাকে করেনি কাল। কেন করেনি জানি না। কিংবা জানি হয়তো একরকম। জানি যে মাধবী মনে করে, রাত্রেই মিটমাট হয়ে যাবে সব। বিছানাতেই ঠিক হয়ে যাবে। দাম্পত্য সম্পর্কে বিছানাটা খুবই প্রতীকী। শেষ অবধি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শরীর ওখানে ধর্ম করে। হৃদয়, রুচি, প্রেমবোধ দলাপাকানো অন্তর্বাসের মতো ছিটকে পড়ে হেথায়-হোথায়। এই ধর্মেই হাসিমুখে রৌপ্য জয়ন্তী করে কত দাম্পত্য!

সেরকমই সম্ভাবনার মতো মাঝরাত্রে নীল আমার ওপর চড়াও হয় হঠাৎ। রাত্রে আমি ওর সঙ্গে নাও শুতে পারতাম। কিন্তু আমার নিরাসক্তির প্রতি আমার আস্থা ছিল। তা ছাড়া, কখনও জ্যোৎস্নার দাগ লাগেনি যে-বিছানায়, তাকে ভাগাভাগি যদি করতে পারি ছ' বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন, তা হলে এক রাত্রির জন্য তাকে ত্যাগ করে গুরুত্ব বাড়াই কেন!

অতএব, ওরই পাশে শুয়েছিলাম আমি শিথিল, নির্বিকার। কিন্তু আমার

BanglaBook.org

ভাবনায় ত্রুটি ছিল। নীলও যে চেয়ে বসতে পারে বিছানাধর্মীয় সমাধান— এ আমার ভাবা উচিত ছিল।

ও যখন চড়ে বসল আমার ওপর, বসল বলাটা ঠিক নয়, বরং বলা উচিত, ওর ছ'ফুট দৈর্ঘ্য সর্বাংশে ছেয়ে ফেলল আমার পাঁচ ফুটকে যখন, কোনও কথা বলল না, ঠোঁট চেপে ধরল ঠোঁট দিয়ে— আমি তখন দ্রুত কিছু কথা ভেবে নিচ্ছিলাম। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল ওকে ঠেলে ফেলব কিনা।

দু'বছরেরও বেশি সময় গিয়েছে আমরা ধর্ম করিনি। আমাদের রতি ও রমণ পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে চলে গেছে কবেই। মাধবী ঘি এবং আগুনের যে-ধারণা প্রায়ই দিয়ে থাকে, তাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে আমরা দিব্যি টিকে গেছি বছরের পর বছর। যদিও আমার কামশীতলতা নেই। নীলেরও নেই পুরুষত্বহীনতা। তাতে কী?

প্রতিদিন ফুল বিক্রি করে যে প্রতিমা নামের মেয়েটি, রান্নাঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায়। ওর সঙ্গে ফুলের ব্যবসা নিয়ে কথা বলি আমি। ওর ছেলের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলি। উনিশ বছর বয়সে ওর স্বামীকে ও হারিয়েছে। পঁচিশে পৌঁছে দাঁড়িয়েছে এই রান্নাঘরের জানালায়। আমি ওকে বলি এক দিন— একটা কথা জিগ্যেস করব প্রতিমা?

—বলো না বউদি।

—তোমার শরীরে খিদে পায় না? কষ্ট হয় না?

—খুব খিদে পায় বউদি। খুব কষ্ট হয়।

—কী করো তখন?

—কী করব? ছটফট করি। শুনেছি বেলপাতা খেলে ওই সব ইচ্ছা কমে যায়।

—খাও?

—ফুল বেচতে বেচতে রোজই খাই চার-পাঁচটা।

—ইচ্ছে কমেছে?

—জানি না।

এই বলে হাসে সে। আমি বলি— কেউ নেই তোমার?

ও মুখ নিচু করে। আমি সেই নতমুখে খুঁজে পাই একজনকে। যে ওকে ভালবাসে। ওকে চায়।

ও বলে— বিয়ে করতে বলে আমাকে।

—করো না কেন?

ও আমার চোখের দিকে তাকায়। বিষাদে ম্লান টলটলে সে দৃষ্টি ছুঁয়ে দেয়

BanglaBook.org

আমাকে। ও বলে— ছেলেটার জন্য ভাবি বউদি।

আমার প্রেমিক নেই, ছেলেমেয়ে নেই, ফুল বিক্রির স্বাধীন উপার্জন নেই। সেই মুহূর্তে এক ফুলওয়ালি হতেই ইচ্ছে করে আমার। আমি আঁস্তাকুড়ের কিশোর বেলগাছের পাতা ছিঁড়ি। চিবোই। কষাটে স্বাদে ভরে যায় মুখ।

আর নীল আমার ওপরে চড়াও হলে আমি ভাবি আমার কী করা উচিত। এই শরীরকে প্রেমহীনভাবেই ব্যবহার করতে পারি আমি। আইনত কোনও অপরাধ তাতে ঘটে না। নীতিগত ভাবেই কি ঘটে? প্রেম থাক বা না-থাক, স্বামী-স্ত্রীর সকল মিলনই ধর্মত বৈধ এবং প্রেম থাকলেও, পারস্পরিক ইচ্ছায় নির্মলতা থাকলেও বিবাহ-অতিরিক্ত যে-কোনও মিলনই অবৈধ।

অতএব বৈধতা আমাকে প্ররোচিত করে। রক্তে মিশে যাওয়া বেলপাতার রস নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। পা দুটি ছড়িয়ে দিই আমি। টান করে দিই। কোনও স্মৃতি আমাকে তাড়িত করে না। ভবিষ্যৎ পথ আগলে দাঁড়ায় না আমার সামনে। আমি আকাট জৈবিকতায় চেপে ধরি নীলের দেহে আমার বর্তমান। কাল ঘনায়মান হলে ও একটি বস্তুপিণ্ড, যার চুল আমি সাপটে ধরি মোরগ-ঝুঁটির মতো। এবং সমস্ত বল প্রয়োগে ওকে উপড়ে ফেলি শরীর থেকে!

ও চুলে হাত বোলায়। কোঁকাতে থাকে। ওর নেমে আসা শর্টস লজ্জা নিবারণ করে গোড়ালির। আর আমার ছড়ানো দুটি পায়ের মাঝে তখনও আহ্বান। উদ্ধত শ্বাসপতনে গভীর প্ররোচনা। খটখটে শুকনো জিভ, আলজিভ, গলা— এমনকী হতে পারে সমগ্র খাদ্যনালী বেয়ে শুষ্কতা চলে গেছে পাকস্থলী পর্যন্ত এবং আমার ঘুম পাচ্ছে। পরম তৃপ্তিতে ঘুম পাচ্ছে। না। শেষ পর্যন্ত আমি উৎকট, অসার জৈব ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। আঃ! এইটুকুই সম্বল করে আমৃত্যু বেঁচে থাকবে আমার আত্মবিশ্বাস! আমার মাথার কাছে বসেছেন ওঁরা। দুই ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার। আমার গোছানো স্যুটকেসের ওপর বসে পান-সুপারি খেতে খেতে হাত রাখছেন আমার কপালে ...

টিকোজি ঢাকা দিয়ে চায়ের পট রাখি টেবিলে। বিস্কুটের কৌটো দিই। নীল ও শিবানন্দ দুটি খবরের কাগজ নিয়ে বসে। মাধবী চা ঢালতে ঢালতে গতকাল নেমন্তন্ন-বাড়িতে দেখে আসা দামি আসবাবপত্রের কথা বলে। আমি চা খাওয়া হলে দুটি বিছানা তুলি। বাসি ঘর ঝাঁট দিই। চেয়ার টেবিল আলমারির ধুলো মুছি নিয়মমতো এবং মাধবী স্নান করতে চলে যাবার আগে কী রান্না হবে জানতে চাই। তখনও আমার গোছানো স্যুটকেস নিয়ে কেউ কথা তোলে না। মাধবী বলে— এখন দু'পিস পাঁউরুটি আর ডিমের পোচ দাও।

BanglaBook.org

—আর?

—চিংড়ি দিয়ে পুঁইডাঁটা করো। ডাল। ঝিঙে পোস্ত আর মাছের ঝোল।

আমি মনে করিয়ে দিই, পটলগুলো শুকোচ্ছে। উচ্ছে লাল হয়ে যাচ্ছে পেকে। মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য আমার। মাধবী বলে— সে দেখা যাবে। তুমি এগুলো করো।

আমি পাঁউরুটি সেঁকে মাখন লাগাই তিন প্লেট। ডিমের পোচ করি তিনটি। কেন না আমার খাবার আলাদা। ডিম, মাখন, চিকেন, মাটন, ইলিশ, চিংড়ি ইত্যাকার অভিজাত খাদ্যাখাদ্য আমি খাই না দীর্ঘদিন। আমি রুটি তরকারি খাই। চিঁড়ে খাই জলে ভিজিয়ে, চিনি দিয়ে। তা ছাড়া দিদি যখনই লুচি, কচুরি, চাউমিন বানায়— রাখে আমার জন্য।

আজ আমি চিঁড়ে খেলাম না। কারণ দুপুরের খাবার তাড়াতাড়ি খেতে হবে। ফ্রিজ থেকে রুই ও চিংড়ি বার করে রাখি আমি বরফ গলে যাবার জন্য। খবরের কাগজ বিছিয়ে বঁটি নিয়ে বসি পুঁইডাঁটা কাটতে। আমার সামনে থরে থরে সাজানো থাকে ঝিঙে, আলু, কুমড়ো, কাঁচা লঙ্কা। এক উনুনে ভাত ফোটে, এক উনুনে ডাল। এবং মাধবী আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে— আজ দুপুরে স্কুল থেকে যাব এক জায়গায়।

মাধবী একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। স্কুল থেকে প্রায়ই যায় এদিক-ওদিক। আজও যাবে। আমি বঁটিতে চিরে দিই মোটা পুঁইডাঁটা। পোকা-ধরা পাতাগুলি বেছে ফেলতে ফেলতে বলি— দুপুরে চাবি তা হলে কার কাছে দিয়ে যাব?

—চাবি? কেন?

—আপনি থাকবেন না। বাবা আর নীল দু'জনেই অফিস যাবে। সে ক্ষেত্রে চাবি তো দিতেই হবে।

—তুমি যাবে কোথাও?

—আজ আমার হস্টেলে যাবার কথা। এক মাস আগে জানিয়ে দিয়েছিলাম তো আপনাদের।

—হস্টেল? হস্টেলে যাবে তুমি? বলে কী! তা হলে রান্না করছ কেন?

আমি হাসি। বলি— তাতে কী? এখুনি তো যাচ্ছি না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে যাব।

—কোথায়? কোন হস্টেলে যাবে তুমি?

—সেটা আপনাদের জানাতে তো আমি বাধ্য নই।

—কী! কী বললে!

BanglaBook.org

মাধবী চিৎকার করে। উদ্‌ভ্রান্ত ছোটাছুটি করে এ-ঘর থেকে ও-ঘর। আমি পুঁইডাঁটা কাটি। ঝিঙের খোসা ছাড়াই। এক ফাঁকে ভাতের ফ্যান গেলে আসি। কড়ায় তেল দিয়ে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে ফের কুটতে বসি। মাধবীর সব কথা আমি শুনতে পাই। ওর কণ্ঠের কার্কশ্য সপ্তমে পৌঁছয়।

—নীলু, নীলু! শানু কী বলছে শোন।

—আমি কী করব?

নীল নির্বিকার। যদিও ওর মুখ কালচে হয়ে উঠছে। ওর মধ্যে, আর কিছু না হোক অবমাননা জনিত আলোড়ন ঘটছেই। কাল যখন ওকে উপড়ে ফেলি, তখনও সম্ভবত ও ভাবেনি আমি চলে যাবই। কেন ভাবেনি? আমি সাত বছর ধরে নিজের সম্পর্কে এই ধারণাই দিয়েছি ওদের। আমি যাই। ফিরে আসি। যাব বলি কিন্তু যাই না। সম্ভবত এমনই প্রত্যয়ে ধাক্কা দিয়েছি আমি, কারণ আমি এই মুহূর্তে উত্তেজিত নই, রাগান্বিত নই। আমার শান্ত মুখ-চোখ ও মাথা ঠাণ্ডা করে রান্না করা বলে দিচ্ছে আমি বিচলিতও নই। এ সবই ওদের বিচলিত করে। মাধবী ছটফট করে। চেঁচায়। বলে— কী করব মানে? তোর বউ তুই জানিস না কী করবি? শুনছ, শুনছ! দেখো! এদিকে এসো একবার।

শিবানন্দ আসে। বলে— কী ব্যাপার?

—দেখো! শানু নাকি আজ হস্টেলে চলে যাবে।

শিবানন্দ হালকা ভাবে সব উড়িয়ে দিতে চায়। বলে— কোথায় যাবে? পাগলামি কোরো না।

আমি শিবানন্দর চোখে চোখ রাখি। ওই চোখে কত বার ড্রপ দিয়ে দিয়েছি আমি! তুলো দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছি জমে থাকা, শুকনো হয়ে লেগে থাকা ওষুধ! এখন ওই চোখ স্নেহের দায়ভাগী করতে চাইছে। কথা বলছে এমন যেন আমি ছোট বালিকা, রাগ করে ভাত খাব না বলেছি। ও জানে না আমি কী ভাবে ত্যাগ করেছি একের পর এক। গ্রন্থি খুলেছি একের পর এক।

আমি ওর চোখে চোখ রাখি। বলি— আমি যাব। আমি তো একমাস আগে বলে রেখেছিলাম।

মাধবী, শিবানন্দ, নীল তিনজনে সার সার দাঁড়ায়। শিবানন্দ বলে— তোমার বাবা জানল না, মা জানল না, আমরা তোমাকে কী ভাবে যেতে দিতে পারি!

যদিও মাধবী জানে যে এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে আমি দিনের পর দিন কথা বলেছি। এ বাড়ির টেলিফোনেই বলেছি মাধবী বা শিবানন্দর উপস্থিতিতেই। এখন ওরা জানাটা অস্বীকার করতেই পারে।

BanglaBook.org

আমি বলি— বাবা-মা জানে। বাবার অনুমতিক্রমেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায়। তোমার বাবা-মা কাছে নেই। আমরাই এখন তোমার গার্জিয়ান। তোমাদের বাড়ির কেউ আসুক। এসে তোমাকে বের করে নিয়ে যাক। ততদিন তোমাকে থাকতে হবে।

—প্রথম কথা, আমি মনে করি না এ বাড়ির কেউ আমার গার্জিয়ান।

—কী বললে?

—হ্যাঁ! ঠিকই বললাম। একত্রিশ বছর বয়স আমার। সম্পূর্ণ পরিণতবয়স্ক আমাকে নির্ভুল ভাবে বলা চলে। বেঁচে থাকার জন্য কোনও অভিভাবকের অস্তিত্ব আমার পক্ষে জরুরি শর্ত নয়।

—সে তুমি যাই বলো, আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে। সব কিছু তোমার ফ্যান্টাসি নয়।

—আমি আজ যাবই।

—তোমার বাড়ির লোক আসবে, তারপর। ততদিন এ ঘরে তোমার থাকতে ইচ্ছে না করে, তুমি তোমার দিদির কাছে থাকো।

—আমি আজ যাবই। আমি যখন এক মাস আগে জানিয়েছিলাম এদিন চলে যাব, আপনারা আমাকে বলেননি আমার পরিবারের কারও থাকা প্রয়োজন। বললে, এক মাসে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

শিবানন্দর মুখ লাল হয়ে যায়। নীল নখ দিয়ে দরজার কাঠ খোঁটে। মাধবী বলে— তপোব্রতকে ফোন করো। শিগগির।

শিবানন্দ তপোব্রতকে ফোন করতে ছোটে। তিনজনই যায় একযোগে। আমি কিছু ক্লান্ত বোধ করি। তর্ক-বিতর্ক আমার অতীব অর্থহীন এবং ক্লান্তিকর লাগে চিরকাল। তা ছাড়া আমি নিঃস্ব বোধ করি একরকম। আমি বলতে পারি না ওদের, জানাতে পারি না যে আসলে আমার সঙ্গে যাবার কেউ নেই।

আমি জানতাম এ প্রশ্ন উঠবে। আমি তার জন্য প্রস্তুত হতে চেয়েছিলাম। বাবাকে বলেছিলাম আসতে। বাবা পারবে না। জুলাই মাসের গরম বাবার সহ্য হবে না কলকাতায়। তা ছাড়া মা হৃদরোগী। তাকে ছেড়ে আসতে বাবার ভরসা নেই।

আমি দাদাদের বলেছিলাম আসতে। ওদের আপিসে কাজের চাপ খুব। আমি তপোব্রতকে বলেছিলাম। তপোব্রতকে মানে মিষ্টিকাকাকে। তপোব্রত মিষ্টিকাকারই নাম। আমাদের সঙ্গে মিষ্টিকাকার পরিবারের ঘনিষ্ঠতাই সবচেয়ে বেশি। তার কারণ হয়তো এই যে মিষ্টিকাকা দায়িত্ব নিতে পছন্দ করে। যে-কোনও

BanglaBook.org

সমস্যায় এগিয়ে আসে বরাবর। মিষ্টিকাকা আমাদের সবার কাছেই নির্ভরের জায়গা। এমনকী মিষ্টিকাকার ছেলে সুহৃদ, আমি যাকে হৃদ বলি, সে প্রায়ই আসে কলকাতায়, আমার আর দিদির কাছে থাকে, সে সবচেয়ে বেশি জানে আমাদের দুঃখ-সুখের কথা, সে আমার অনুজ কিন্তু বন্ধু।

এই মিষ্টিকাকাকে আমি বলেছিলাম। শুনে ও বলেছিল— আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমি কলকাতায় যেতে পারব না। তোর এত তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। এখন থাক। পরে দেখছি।

হৃদকে বলেছিলাম আমি। হৃদ পরিষ্কার বলেছিল ও এর মধ্যে থাকতে চায় না। কারণ হৃদের মা আর মাধবী দুই বোন। আপন না হলেও নিকট আত্মীয়। নির্মলদার সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধটা মিষ্টিকাকিমাই এনেছিল।

দিদি আর নির্মলদা প্রথমেই বলে দিয়েছিল ওদের যেন এরকম কোনও অনুরোধ আমি না করি। আমি তা করতেও চাইনি। ওরা তো এ বাড়িরই একজন। কিন্তু ওরা ছাড়া বাকি সব? প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজ আছে। ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। আছে আমাকে গৌণ করে নগণ্য করে নিজস্ব জীবন এবং সুসময়-অসময়। কার মুখের দিকে তাকিয়ে কাল কাটাব আমি? কে তার জীবনযাপন থেকে দয়া করে একটু সময় আমাকে দেবে, কবে দেবে, সেই অপেক্ষায় আমি স্থগিত রাখব আমার জীবনের সিদ্ধান্ত? চরম সিদ্ধান্ত আমার? কেন রাখব?

আমি বলেছিলাম। আমি কোনও হঠকারিতা করিনি আগের মতো। আমার চারপাশের জগতে কতখানি তুচ্ছ আমি, কী অকিঞ্চিৎকর আমার জীবন— আমি দেখেছি। বুঝে গেছি।

কিন্তু সেকথা বলতে পারি না আমি। ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে যে দর্প নিহিত থাকে, তার মধ্যে এই দীনতার কোনও জায়গা নেই।

আমি চিংড়িগুলি হালকা করে ভাজি। লালচে-সোনালি বর্ণ নিয়ে তারা পড়ে থাকে থালায়। তখন আমার ডাক পড়ে। ফোনের ও-প্রান্তে তপোব্রত আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওরা তিনজন ভ্রূকুটি সমেত, বিরক্তি ও রাগ সমেত ঘিরে থাকে আমাকে। আমি ফোন ধরি। তপোব্রত ফোনে ধমকায়— তোকে বললাম আমি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে!

আমি চেঁচাই না, উত্তেজিত হই না, নিজেকে স্থির রাখা আজ আমার সবচাইতে বড় কাজ। আমি বলি— আমার কারও জন্য কোনও অপেক্ষা নেই।

—আবার হঠকারিতা করছিস তুই।

BanglaBook.org

—না।

—বহু বার হঠকারিতা করেছিস। তার জন্য তোর এই অবস্থা।

—মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এবার আমি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিইনি। অস্বীকার করতে পারো না যে আমি অনেক আগেই তোমাদের প্রত্যেককে জানিয়েছি। দাক্ষিণ্যের ওপর আর আমার জীবনকে নির্ভর করতে দিতে পারি না আমি।

—বেশ আমি এক মাসের মধ্যে যাব। কথা দিচ্ছি। এই এক মাস তুই থাক।

—আর একটা রাত্রিও নয়।

—তা হলে ... তা হলে আর কোনও কথাই তুই শুনবি না!

—শুধু শুধু কথা নষ্ট কোরো না। তোমাদের কথার অনেক মূল্য। তোমাদের কাজের, তোমাদের সময়ের— সব কিছুরই মূল্য আমার চেয়ে অনেক বেশি।

—এর পরিণতি ভাল হবে না তা বলে দিলাম।

—আমার থেকে যাবার পরিণতি ভাল হবে কী করে জানতে পারছ?

—তোর ভাল-মন্দে আমাদের কোনও দায় থাকছে না তা হলে! তুই উন্মাদ হয়ে গেছিস।

—কাকে বলে উন্মাদনা তা আমার চেয়ে বেশি তুমি জানো না মিষ্টিকাকা। আর শোনো, আমার ভালর দায় আমি তোমাদের সবার সঙ্গে ভাগ করে নেব। মন্দের দায় আমার একার।

মিষ্টিকাকা ফোন ছেড়ে দেয়। স্থবির মূর্তিগুলি এ বার নড়ে ওঠে। ফোনের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কথা গেল এবং স্থবির হয়ে যাওয়া এদের বৈশিষ্ট্য। অবসরের আগে শিবানন্দ হঠাৎই ছ'মাসের জন্য একটি বিভাগের প্রধান হয়ে উঠল। ডায়রেক্টর। মাধবী সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগল সে-কথা। 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানো? বিশাল উঁচু পোস্ট!' ঠিকে-ঝি থেকে শুরু করে বস্তায় করে চাল পৌঁছে দেয় যে বুড়ো লোকটা— সে অবধি বাদ গেল না। চলন-বলন কথাবার্তাই পাল্টে গেল ঘরের। জানা গেল, এম ডি সাহেবের পদাধিকার বলে একজন পি এ পান। ঘটনাচক্রে তিনি একজন মহিলা। সেটাও খুব আহ্লাদ করে, হেসে হেসে, সকলকে জানাল মাধবী এবং প্রায়ই স্কুল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হানা দিতে লাগল শিবানন্দর অফিসে। ছ'মাস পরে শিবানন্দর অবসরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্ভট অবতাড়নার ব্যাপারটা শেষ হয়।

সেই ছ'মাসেই দেখেছিলাম ওদের ফোনের সামনে দাঁড়ানো ফ্রিজ-শট। কাজের প্রয়োজনে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাঝে মাঝে ফোন করতেন শিবানন্দকে। শিবানন্দ, হয়তো বা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুমেই যাচ্ছে তখন,

BanglaBook.org

ছুটতে ছুটতে এসে ফোন ধরল। মন্ত্রীর ফোন বলে কথা। সামনে দাঁড়িয়ে গেল মাধবী। নীল থাকলে নীলও।

শিবানন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে— ইয়েস স্যার!

মাধবীর মাথা তন্মুহূর্তে ঝেঁকে ওঠে।

শিবানন্দ হাসে। বলে— ঠিক বলেছেন স্যার। ইউ আর রাইট স্যার!

মাধবীর মুখ, নীলের মুখ হাসিতে ভরে যায়।

শিবানন্দ গম্ভীর মুখে বলে— সার্টেনলি স্যার। ইট মাস্ট বি ডান স্যার। আপনার কোনও চিন্তা নেই স্যার।

পুতুলদের মুখ গম্ভীর হয়ে যায় তখন। আমার মনে পড়ে রানার-রানার স্ট্যাচু খেলার কথা। দৌড়তে দৌড়তে বা ঘুরতে ঘুরতে স্ট্যাচু বললেই থেমে যেতে হবে যেমনকার তেমন। কেউ হয়তো হাসছিল, সে দাঁত বার করে থাকবে। কেউ ঘাড় চুলকোচ্ছিল, তেমনই ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়াবে। একেবারে না নড়ে যে সবচেয়ে বেশি সময় থাকতে পারবে, সে পাবে গোটা দলের ভার!

ফোন শেষ হলে শিবানন্দ হাসে। মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারার গভীর তৃপ্তি মুখে। মাধবীর মুখে গর্ব ঝলমলায়। নীলের মুখেও লাগে তার আঁচ। ওরা শিবানন্দর পিছন পিছন মিছিল করে যায়। মাধবী শুধোয়— কী বলল? মন্ত্রী কী বলল?

নীল কিছু জিগ্যেস করে না। কিন্তু হাসি-হাসি মুখে উদগ্রীব থাকে শোনার জন্য। শিবানন্দ তোয়ালে সামলে চেয়ারে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ হাসে মৃদু মৃদু—তারপর আস্তে আস্তে বলে। হড়বড় করে না। রসিয়ে রসিয়ে এমন ভাবে উচ্চারণ করে প্রতিটি সংলাপ যে আমার কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখা খাবার কথা মনে পড়ে যায়।

মিষ্টিকাকা ফোন ছেড়ে দিলে আমি পাকশালের দিকে হাঁটি। আমার পেছন পেছন ওরা মিছিল করে আসে। সে-মিছিল আপাতভাবে মন্ত্রীজনিত মিছিলের সঙ্গে মিলে গেলেও দুইয়ের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য সম্পর্কে আমি অবহিত থাকি। গ্যাস ধরিয়ে দুই উনুনে দুটো কড়া চাপাই। একটি পুঁই-চিংড়ির। অন্যটি মাছের। মিছিল আমার নিকটে থাকে। শিবানন্দ বলে— কোন অজায়গায় তুমি যাবে? যদি তোমার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, কে নেবে তার দায়?

আমি বলি— এক কাজ করুন, আপনিই চলুন আমার সঙ্গে হস্টেল পর্যন্ত। দেখেও আসবেন সেটা অজায়গা কিনা।

মাধবী ফুঁসে ওঠে— কেন? ও যাবে কেন? ও তোমাকে দিয়ে এল আর তুমি

BanglaBook.org

প্যাঁচ কষলে যে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

আমি গরম খুন্তি হাতে এগিয়ে আসি দু'পা। ছ্যাঁকা দেবার জন্য নয়। মনে করিয়ে দেবার জন্য যে সাত বছরে প্যাঁচ কষার মতো বহু পরিস্থিতি আমি হাতে পেয়েছিলাম, কষিনি।

কিন্তু কিছু বলার আগেই মাধবী গলার সুর নরম করে ফেলে। বলে— শানু, কত ভালবাসি তোমাকে আমরা। আচ্ছা, নীলুর ওপর রাগ করেছ, ক'দিন বাপের বাড়ি ঘুরে এসো। কেন এরকম ছেলেমানুষি করছ! তুমি চলে গেলে কী কেলেঙ্কারি হবে বলো তো? আমাদের মান-সম্মানের ব্যাপারটা একবার ভাববে না?

আমি পুঁইডাঁটার তরকারির ওপর চিংড়ি ছড়িয়ে দিয়ে পাশের কড়া থেকে তুলে নিই সাঁতলানো রুই মাছ। বলি— আমার মান-সম্মানের ব্যাপারটা আপনারা কতখানি ভেবে দেখেছিলেন?

ক্রুদ্ধ চোখ-মুখ সমেত শিবানন্দকে পাল্টে যেতে দেখি আমি। ও বলে— তোমাকে আমরা জোর করে আটকে রাখতে পারি, জানো!

তেলে কাঁচালঙ্কা কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে আমি বলি— পারেন। কিন্তু কত দিন? ছাড়া পেলে তখন সোজা পুলিশের কাছে যাব আমি।

শিবানন্দ নিভে যায়। মাধবী চিৎকার করে— কী ডাকাত মেয়ে! কী ডাকাত মেয়ে!

বহু দিন পরে এই অভিধা আমার কানে মাধবী বর্ষণ করে। আমি বলি— ভাবছি আজও বেরিয়ে প্রথমে থানায় যাব। একটা রিপোর্ট লিখিয়ে রাখা ভাল।

—নীলু, নীলু! কী বিপদে ফেলেছিস আমাদের দেখ একবার! বলতে বলতে মাধবী ছিটকে চলে যায়। নীল শর্টসের ওপরে টি-শার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে। শিবানন্দ ওপরতলায় চলে যায়। রোদ্দুর আরও বেশি ঝকঝক করে। প্রতিমা ফুল দিয়ে যায়। চিংড়ির গন্ধে ম-ম করে বাতাস। সুস্বাদু পুঁই-চিংড়ি খাবার কথা ভেবে আমার খিদে বেড়ে যায়। মাধবী কি আজও আমার গুণ গুনে দুটি চিংড়ি দেবে? ভাবতে মজা লাগে আমার।

অবসর নেবার পরও শিবানন্দ অতিরিক্ত সময়কালের জন্য সরকারি কাজে বহাল আছে। ওর সে-পদও কম লাভজনক নয়। দামি গাড়ি চেপে চকচকে লোকেরা, কখনও সস্ত্রীক, ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। কথা বলে। চা খায়। আর উপহারের প্যাকেট দিয়ে যায়। তার মধ্যে কখনও থাকে শিবানন্দর স্যুটের কাপড়, কখনও প্রচুর মিষ্টি, কখনও মাধবীর জন্য দারুণ দারুণ শাড়ি এবং থাকে আরও সব মুখবন্ধ প্যাকেট বা খাম, যা আমার সামনে চিরকাল মুখবন্ধ আছে।

BanglaBook.org

এক বার এক জন দিয়ে গেল বিরাট বড়-বড় রপ্তানি গুণমানের চিংড়ি। অনেকগুলো! ডিপ ফ্রিজে ঢোকানো গেল না পুরোটা। অন্যান্য ঘরে কিছু বিলোতে হল। হায়-হায় করতে থাকল মাধবী। অভিযোগ করল শিবানন্দকে, যেমন করে সুযোগ পেলেই। কবেকার এ ফ্রিজ! এখন কত আধুনিক ফ্রিজ পাওয়া যায়। কত জায়গা তাতে। এক মাসের বাজার রেখে দিলেও ভরে যায় না। কারা কারা ইতিমধ্যে ওই ফ্রিজ কিনেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও পাওয়া গিয়েছিল সেদিন। এবং মাধবী নিজের হাতে চিংড়ি রেঁধেছিল। নারকোল কোরা দিয়ে চিংড়ি।

খেতে বসেছি চার জন। অন্যান্য পদের সঙ্গে মাঝখানে রাখা স্তূপাকৃতি নারকোল চিংড়ি। সবার পাতে দুটি-দুটি করে দিল মাধবী। এবং ঘোষণা করল— আর কেউ চাইবে না। আর দুটো আছে, আমার।

খেতে বসে সাধারণত কোনও কথা বলি না আমি। কারণ ওদের পরচর্চায় আমার আগ্রহ হয় না। জমি, বাড়ি, আসবাব, টিভি, ফ্রিজ, এসি মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, গাড়ি, গাড়ির বিবিধ মডেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ নৈমিত্তিক আলোচনায় আমার গা গুলোয়। আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে কোনও বই। অপেক্ষা করে সাদা কাগজ ও কলম, কিছু ক্যাসেট। সুতরাং, ওদের অনেক আগেই খাওয়া শেষ হয়ে যায় আমার। আমি দু'খানি চিংড়ি ভোজন করে থালা নিয়ে উঠছি যখন, নীল চামচ দিয়ে ঘেঁটে দেয় নারকোল-চিংড়ির স্তূপ। চিৎকার করে— মা! এত চিংড়ি আছে আর তুমি মাত্র দুটো করে ...

ওর কথা শেষ হয় না। মাধবী হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

—রাখ্, রাখ্!

অপ্রস্তুত মুখে বোকার মতো হাসে। আমি মনে মনে নীলের নির্বুদ্ধিতার নিন্দে করি। আমার সামনে নীলের ও-কথা বলা উচিত হয়নি। এঁটো থালা রেখে এসে বেসিনে মুখ ধুই আমি। নির্লজ্জ কৌতূহলে, মুখ মুছতে মুছতে ওদের পাতের দিকে তাকাই। নারকোল চিংড়ি ছড়িয়ে পড়ছে অধিক পরিমাণে। কলেজ হস্টেলে মৌসুমী সারেঙ্গির কথা মনে পড়ে যায় আমার। কড়ে আঙুলের মতো মাছের পিস পরিবেশন করত ঠাকুর। মৌসুমী দ্রুত ভক্ষণ করে আঙুল চাটতে চাটতে পাশের পাতের দিকে চাইত। আমরা আড়ালে হাসাহাসি করতাম।

কান গরম হয়ে যায় আমার। নিজেকে অবমানিত লাগে। নারকোল-চিংড়ি এ বাড়ির প্রিয় পদ। আরও হবে। আমি তা না খাওয়ার সংকল্প নিই। এভাবেই আমি ছেড়েছি মাখন, চিকেন, মাটন, ইলিশ, কই। এদের প্রত্যেকের পেছনেই আছে

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট ইতিহাস। এমনকী চিংড়ির অন্য কোনও পদও আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। কুচো চিংড়ির এই সব মেশালি পদ, যেমন মোচা, এঁচোড়, পুঁই, লাউ— এ নিয়ে মাধবীর আগুলি-আগুলি ভাব কম। তবু, স্বামী আর ছেলের পাতে বেশি চিংড়ি দেবার সরল ঝোঁক থাকে। সবটা গায়ে মাখি না আমি। ওর প্রক্রিয়ার দিকে নজর রেখে সারাক্ষণ চললে আমার মধ্যেও তা সংক্রামিত হবে না, কে বলতে পারে!

অবশেষে মাধবী ও শিবানন্দ আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে দিদি ও নির্মলদা। আদালতের উকিলের মতো শিবানন্দ জেরা করে দিদিকে— সঞ্চিতা তুমি জানো শানু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়?

দিদি ওর স্বভাবসুলভ নম্রতায় বলে— জানি।

—তুমি কি মনে করো ও ঠিক কাজ করছে?

—এটা ওর নিজস্ব ব্যাপার। আমার কী মনে হয়, তাতে কী এসে যায়?

দিদি বলে। নির্মলদা দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। এ বার বলে— দেখো কাকু, সমস্যা তোমরাও জানো, আমরাও জানি। শানু যদি মনে করে ও আর থাকতে পারবে না, সেখানে আমরা কেন জোর করব?

শিবানন্দ ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকায়। মুখে শ্লেষ ফুটে ওঠে ওর। আমার চেনা মানুষটার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক প্রত্যাশিত অচেনা প্রতিবেশী। গতকালও যে আমার স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছে, এবং আজ সকালে আমার বদখত পাঁচিলের ইট ভেঙে পড়েছে যার উঠোনে বলে সে, শান্ত প্রতিবেশী, ওই ইটের ঘায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পেঁপেগাছের জন্য মুখে পেস্টের ফেণা নিয়ে এসেছে কলহ করতে। প্রত্যাশিত কিন্তু অচেনা। তেমনি শিবানন্দ। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চারপাশে জমে থাকা পেস্টের ক্রুদ্ধ ফেণা।

ও বলে— তোমার জন্য নষ্ট করার মতো সময় আমার আর নেই। যাও! যেখানে খুশি গিয়ে পচে মরো। মনে রেখো, যদি ফিরে আসতে চাও এ বাড়িতে, বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নাকে খত দিয়ে তারপর ঢুকবে।

মাধবী বলে— আসতেই হবে। যাবে কোথায়? জানে না তো কত ধানে কত চাল! মুরুব্বি ধরেছে, মুরুব্বি ধরেছে! নইলে এত সাহস হয়!

শিবানন্দ বলে— নির্মল, তুই আর সঞ্চিতা ওকে দিয়ে আসবি ও যেখানে যেতে চায়! এ বাড়ির একটা সম্মান আছে।

নির্মলদা রাজি হয়ে যায়। আমাকে জিগ্যেস করে— কখন বেরোবে?

—ঠিক একটায়।

BanglaBook.org

বলি আমি। জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোই। পুরনো দিনের বলে এ বাড়িতে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের কোনও আয়োজন নেই। এমন অবারিত তা যে প্রত্যেকের প্রতিটি আনাগোনার হিসেব রাখা যেতে পারে। বিশেষ করে একতলারটা। ছোট তরফের আরও অনেকের সঙ্গে যেটা আমি সাত বছর ব্যবহার করেছি। কোনও জানালা নেই। দরজা বন্ধ করলে আলো ঠেকে না। স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ। নোনা-ধরা দেওয়াল থেকে সিমেন্ট-বালির চাবড়া খসে পড়ে। জলের পাইপের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক মর্চে। প্রায়ই অজ্ঞাত কেউ হিসি করে জল দেয় না বলে খর তপ্ত গন্ধ নাকে লাগে। এমনকী পায়খানার প্যানে লেগে থাকে মল।

গত সাত বছরে, দিনে দু'বার, তিন বার, যত বার আমি স্নান করেছি, শুচিবোধ আসেনি আমার। কিন্তু কী আশ্চর্য অভ্যাসে এই বাথরুমের সব কিছু আমার চেনা হয়ে গেছে। দেওয়ালের শ্যাওলা, হিসি করতে বসার জন্য দু'খানি লাল ইট, পায়খানার জং-ধরা মগ, শ্যাওলা-ধরা মর্চে-পড়া শাওয়ারের জলসমষ্টির আপতন বিন্দু— আমি চোখ বন্ধ করেও নির্ভুল বলে দিতে পারি সব। স্নানের আগে দেওয়াল ধুই। প্যান পরিষ্কার করি। মেঝেয় জল ঢালি। নিজেকে পরিষ্কার করার আগে আমি ঘর পরিষ্কার করি। ওই ওপরে ছিটছিট ঘুলঘুলি দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আলো চুঁইয়ে পড়ে তখন। সেই আলোর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি অপলক। মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে অল্প অল্প জল দিয়ে যাই চুলে। পায়ের পাতায়। বিন্দু বিন্দু ভেজাই নিজেকে। আমার রাশিকৃত চুল সহজে ভিজতে চায় না। আমি মাথা পেতে দিই কলের তলায়। যদি কোনও জমাট আবেগ থেকে থাকে, অবরুদ্ধ কান্না থাকে যদি, তবে জোরে কল খুলে দিয়ে কাঁদি। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি বালতির কানা। যেমন করে দারুন আবেগে ভালবাসার জনের কাঁধ পিঠ ধরে মানুষ।

সে-পর্ব না থাকলে আমি জলের ভাষা বোঝার চেষ্টা করি। বালতিতে যখন প্রথম জল পড়ে তখন শব্দ একরকম। বালতি ভরতে থাকার অনুপাতে শব্দ পাল্টে যায়। এমনকী কলের মুখ নিয়ন্ত্রণ করেও পাল্টে ফেলা যায় শব্দ। আমি সেই সব কিছুকেই মনে করি জলের ভাষা। এক দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন বাক্যগঠন! বিবিধ আবেগে পরিপ্লুত। অন্ধকার অপরিষ্কার বাথরুমে তৈরি হয় আমার এক নিজস্ব জগৎ। এবং আলোর প্রতি আমার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আমার থাকার ঘর, আমার স্নানের ঘর, সর্বত্র অন্ধকারের মধ্যে থাকতে থাকতে উজ্জ্বল আলোয় আমার চোখ টনটন করে। বন্ধ হয়ে আসতে চায় চোখের পাতা। তবু এক-একদিন, আলোর তৃষ্ণায় আমি ভরদুপুরে উঠে পড়ি ছাতে।

BanglaBook.org

ছাতের কোনায় দুটি সুদৃশ্য বাথরুম পাশাপাশি। গোটা ছাতে ঘর বলতে তিনটি। একটি ঠাকুরঘর। আর দুটি বাথরুম।

একটি নির্মলদা করে দিয়েছে দিদির জন্য। সারা দিন খাটা-খাটুনির পর গোলাপি টালি বসানো মায়াবী বাথরুমে গিয়ে ও স্নিগ্ধ হয়ে আসে।

অন্যটি মাধবীর। শিবানন্দ করে দিয়েছে মাধবীকে। নীলও এখানে স্নান করে। কিন্তু আমি করি না। প্রথম প্রথম করতাম। মাধবী বলতে লাগল— যে খুশি এসে হাগবে-মুতবে আমার বাথরুমে!

আমি এক সাধারণ মনুষ্য, কেমন করে নিশ্চয়তা দিই যে স্নান করতে ঢুকে ওই দুটি কম্মো আমি আদৌ করব না! অতএব সুন্দর বাথরুমে স্নান করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয় আমাকে।

দিদির বাথরুমে স্নান করেছিলাম কয়েক দিন। এ নিয়ে আপত্তি তোলার কথা দিদি ভাবতেও পারে না। কিন্তু এক দিন, বহুজন সমক্ষে, আমি স্নান করে নামছি, দিদির শাশুড়ি, অর্থাৎ আমার জ্যেঠশাশুড়ি বলে বসল— ওই দেখো, নামছে, স্নান করে নামছে!

অন্যেরা দেখছে আমাকে। আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। ও বলছে— সঞ্চিতার বাথরুম থেকে চান করে এলে নাকি? ও সঞ্চিতা! দেখো, দেখে যাও! তোমার বোন তোমার বাথরুম থেকে চান করে এল! ঘরতাড়ানি পরজমানি হা হা হা!

আমার গায়ে তখন রাশি রাশি ঘামের বিন্দু। শতধারায় নেমে আসে গা বেয়ে। জমি ভিজিয়ে দেয়। শাড়ি, শপ-শপ করে গায়ে। ব্লাউজ এবং অন্তর্বাস ভেদ করে সহসাই আমি স্বচ্ছতায় আক্রান্ত হই। আমার উদোম উলঙ্গ দৃশ্য ঢাকতে আকাশ থেকে মেঘখণ্ড নেমে আসে। দিদির মুখ অপমানে গনগন করে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, এখনই, আমার সামনে কোনও প্রতিবাদ যেন না করে বসে দিদি। এবং ও তা করেও না। আমাদের পারিবারিক শিক্ষা, আমাদের মায়ের শিক্ষা ও সুরুচিবোধের প্রতিষ্ঠা করে ও সেই গনগনে মুহূর্তেও।

বিষাদ সঙ্গে করে নামতে থাকি আমি। সিঁড়িতে তার ছাপ পড়ে। মেঝেতে তার দাগ লেগে যায়। নিজের ঘরে ফিরে শাড়ির কুচি ভাঁজ করতে করতে আমার মনে হয়— আমাকে আর দিদিকে ওরা বোন থাকতে দেবে না কিছুতেই, দুই জা বানিয়ে ছাড়বে। তারই চক্রান্ত আমি চতুর্দিকে দেখতে পাই।

বাড়িতে আমি আর দিদি একই বিছানায় শুয়েছি কত বছর। একই লেপ গায়ে দিয়ে জড়াজড়ি ঘুমিয়েছি শীতে। এমনকী গরমেও, এই অভ্যাস ছিল আমার, ওকে না জড়িয়ে, ওর গায়ে পা তুলে না দিয়ে, জুতসই হতে পারত না আমার ঘুম।

BanglaBook.org

কখনও গরম বেশি লাগলে ও আমাকে সরে যেতে বলত। গাঢ় ঘুমের মধ্যেও গাঢ়তর অভিমান করতাম আমি। সরতে সরতে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে যেতাম। ও তখন আবার টেনে নিত আমাকে।

পায়ের ওপর পা তুলে সারাদিন বই-পড়া ছিল আমার স্বভাব। মা কোনও ফরমাস করলে ও বলত— না মা, বোন পারবে না, আমি করে দিচ্ছি।

দিদির ছোট হয়ে যাওয়া স্কার্ট পরে আমি বড় হয়েছি, দিদির পুরনো বই পড়ে বড় হয়েছি। ও আমার চেয়ে খুব বেশি বড় না হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যেকার মাতৃত্ব আমার ওপর ঝরে পড়ত। আমি তারই মধ্যে অভ্যস্ত ছিলাম। আজও আছি।

রান্নার কিছুই জানতাম না। এ বাড়িতে আসার সাত দিনের মাথায় মাধবী রান্নার লোক ছাড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল— আমরা দু'জনে করে নেব।

সে আর হল কই! বস্তুত আমাকেই, উঠোনে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হত— দিদি, ছোলার ডালে কী দেব? সুক্তো রাঁধব কী করে? চালকুমড়ো? মাছের তেলের বড়া ছড়িয়ে যাচ্ছে সব।

মাধবীর কাছে রান্নার কোনও পাঠ নিইনি আমি। সে নিয়ে ওর ক্ষোভের শেষ নেই। বলে— আমরা কি সঞ্চিতার চেয়ে কিছু কম জানি?

রান্নাটা যাতে শেষ পর্যন্ত ওর মতো কখনও না হয়ে যায়, সেদিকে আমার সচেতনতা ছিল। মাধবীরও কম ছিল না। ইলিশ মাছ ভাপে রাঁধলে আমি কোনও দিন আদাবাটা দিইনি। ও আদাবাটা ছাড়া রাঁধতই না।

বিয়ের আগেও দিদির কাছে এসেছি তো আমি। থেকেছি। ওর গোলাপি টালি বসানো বাথরুমে স্নানও করেছি। তখন এ বিষয়ে ব্যঙ্গের কিছু ছিল না। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকতার লক্ষণগুলোও পাল্টে পাল্টে যায়। প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তনের সঙ্গে রফা করতে থাকাই আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা বলে আমার মনে হয়।

এসবের ফলশ্রুতি হিসেবেই এই অন্ধকার বাথরুমে আমি নিজেকে সঁপে দিই অবশেষে। আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে যায়— আমি নিজেকে উজাড় করি এখানে। প্রতিদিনের যত গ্লানি, যত ক্লেদ, ঘষে ঘষে তুলে ফেলি রোজ। মৃত্যুর ইচ্ছার পাশাপাশি জীবনের ইচ্ছাকেও লালন করি একই সঙ্গে। দু'জনকেই দিই আমি সমান গুরুত্ব। স্বপ্নের ওপর আস্থা রাখতে চাই। বিশ্বাস করতে চাই তাকে। এই স্বপ্ন— কোনও দিন ছেড়ে যাব। কোনও দিন পাব একটা নিজের মতো জীবন। কোনও দিন, মানে কবে?

BanglaBook.org

অন্য দিন, অনেকক্ষণ স্নানঘরে কেটে গেলে বাইরে থেকে তাড়া আসে— শানু বেরিয়ে আয়। বাথরুমটা কি তোর একার, আর কেউ যাবে না?

—তোর একার জন্যই যে এক ট্যাঙ্কি জল লাগে রোজ। কী করিস এতক্ষণ?

জল খরচের এই অভিযোগ সম্পর্কে নির্বিকার থাকতেই হয় আমাকে। এবং এ কথা সত্যি, বাথরুম আমার একার নয়। সেটের কৃপায় এ বাড়ির লোকসংখ্যা কম নয়। কিন্তু জলের বিষয়ে আমি কৃপণ হই কী করে! আমাকে যে ধুতে হয়। ধুতে হয় ক্লেদ, গ্লানি। ধুয়ে সাফা রাখতে হয় চেতনা। রাখতেই হয়, কারণ মৃত্যু এবং জীবনকে আমি দিই সমান গুরুত্ব।

আজ আমাকে কেউ কিছু বলবে না। তাড়াতাড়ি বেরোতে বলবে না। জল কম খরচ করতে বলবে না। তবু, আজ আমি অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়িই স্নান সেরে ফেলি। ছাড়া পোশাক না ভিজিয়ে সেলোফেন প্যাকে মুড়ে ভরে নিই আমার ঢাউস ব্যাগে। যদিও শ্যাম্পু করতে ভুলি না। ঘষে ঘষে তুলে ফেলি এ বাড়ির ধুলোবালি গা থেকে।

শিবানন্দ খেয়ে বেরিয়ে যায়। আমি অপেক্ষা করি নীল চলে যাবে বলে। কিন্তু ও যায় না। বিছানায় শুয়ে থাকে। আমি ভাবি, মাধবী নিশ্চয়ই স্কুলে যাবে। কিন্তু মাধবী স্কুল কামাই করে।

আমি পরিপাটি চুল আঁচড়াই। ফ্যান চালিয়ে বসি তার নীচে। চুল না ভিজিয়ে স্নান করতে পারি না আমি। ভেজা চুলের রাশি থেকে জল পড়ে আমার পিঠও ভিজে যায়। আমি সেদিনের খবরের কাগজ পড়ি। প্রথম পাতা থেকে শুরু করে শেষ পাতায় যাই। কোম্পানির শেয়ারের দাম, শোকসংবাদ, জ্যোতিষ, জমি ক্রয়-বিক্রয়, টেন্ডার— বাদ যায় না কিছুই। ঠিক বারোটায় আমি খেতে বসি একা। কারওকে ডাকি না। তৃপ্তি করে খাই পুঁই-চিংড়ি, ডাঁটা চিবোই। মাছের কাঁটা চুষে, চিবিয়ে ছাতু করে ফেলি একদম। সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখি ও ওয়ার্ডরোবে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াই।

BanglaBook.org

দেবারতির ত্যাগ

আধো অন্ধকার ঘরটা। গুমোট, বিষাদময়। এ ঘরের দেওয়াল আলমারি দুটো ঘেঁটে কুড়ি বছরের জমে থাকা ধুলো আমি পরিষ্কার করেছিলাম। বাসনগুলি গুছিয়ে, জায়গা খালি করে, বই রেখেছিলাম। আমার এক ট্রাঙ্ক বই। সাত দিনের মধ্যে সেই সব বইতে উই লেগে যায়। এক দুপুরে হঠাৎ আমি তাদের আবিষ্কার করি। চমকে উঠি দেখে। পাগলের মতো একের পর এক বই টেনে টেনে ফেলতে থাকি মেঝেতে। আমার কত কষ্ট করে সংগ্রহ করা বই, আমার বুকের পাঁজর সব, খেয়ে, ফুটো করে, ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওরা। দেখে আমার চোখে জল এসে যায়। আমি আঁতকে উঠি বই থেকে লক্ষ লক্ষ কীট বেরিয়ে আসতে দেখে। যেন, কোটি কোটি অক্ষরই সব, বেরিয়ে আসছে কীট হয়ে, গলগল করে বেরিয়ে আসছে। থোকা থোকা কীটের নড়াচড়া দেখতে দেখতে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। জোরে চোখ বন্ধ করে ফেলি আমি। নীলের বাহু আঁকড়ে টলতে থাকি মাতালের মতো। নীল বলে— এরকম করছ কেন? কী হয়েছে?

বিস্বাদ জলে ভরে গিয়েছে আমার মুখ তখন। আমি, ঘরে বমি করতে নেই, এই অনুশাসনে, সেই জল গিলে ফেলি এবং বলি— আমার কীরকম লাগছে। পোকাগুলো মারো। মেরে ফেলো।

তখনও, কত অনায়াসে, আমি নীলের বাহু আঁকড়ে ধরতাম।

এখন ও আমার মখোমুখি। নাকি আমিই ওর। দুই তরফের দুটি মুখ না হলে মুখোমুখি ব্যাপারটাই বা ঘটে কী করে! ও দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে বলে— তা হলে সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ শান্?

সম্পর্কের একেবারে আদিতে ও এই নামেই আমাকে ডাকত। সকলের সামনে নয়। আড়ালে। এতদিন পর, এই লগ্নে, আবার এ নামে ওকে ডাকতে শুনে আমার গুলগুল করে হাসি পায়। সে-হাসি গোপন করার কোনও চেষ্টাই আমি করি না। ঠোঁট বিস্তৃত করা সে-হাসি আমার মুখে শোভা পেতে থাকে। আর আমি, পরিষ্কার দেখতে পাই, ওর চোখ জলে ভরে উঠছে। ঠোঁট কাঁপছে। চোয়াল শক্ত হচ্ছে ওর।

আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ও আবেগ-স্ফুরিত হয়ে উঠেছে, এমন সরল

BanglaBook.org

বিশ্বাস আঁকড়াতে চায় না আমার মন। সাত বছরে আমার মধ্যে ঘটে গেছে এই চরম কুৎসিত পরিবর্তন। আমি সরল ভাবে ওর কোনও কিছুই আর বিশ্বাস করতে পারি না।

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ও বাঁ হাতে সিগারেট নেয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চেপে ধরে দু'চোখ। জল মুছে তাকায় আমার দিকে। বলে— আমি কত একা হয়ে যাব, তুমি জানো না শান্?

ওর এই কথার উত্তরে আমি অজস্র কথা বলতে পারতাম, যদি বা তা না-ও বলি, আমি এটুকু বলতেই পারতাম যে আমি ওর সঙ্গে বসবাস করতে করতেই একা হয়ে গিয়েছিলাম, সে খবর কি ও জানে না?

বললাম না। কথা বলার ব্যাপারে আমি খুবই সংযমী এখন। সত্যি কথা বলতে কী, এ বাড়িতে আসার পর, হাজার কথার চাপে আমার কথা বলার ইচ্ছেটাই হারিয়ে গেছে। মিতবাক হয়ে গেছি আমি। কোনও কারণে বেশি কথা বলতে হলে আমার শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়। গলা শুকিয়ে আসে। মাথা ঘোরে। গা গুলোয়। ওর কথার জবাবে আমি শুধু নীরব হাসিতে ভরিয়ে রাখি মুখ। সতর্ক থাকি। কথার মধ্যে একটুও অভিমান না বেরিয়ে পড়ে! চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলি— হবে হয়তো! তার জন্য আমি কী করতে পারি!

ও বলে— মত পাল্টানো যায় না?

আমি বলি— না।

অভিমান যাতে প্রকাশিত না হয়, তার জন্য এত সতর্ক হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না আমার। কারণ ওর ওপর আমার আর কোনও অভিমান নেই। কারণ ওর কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই।

গত সাত বছরে আমি শিখেছি যে অভিমান যত্র-তত্র বিলোতে নেই। জীবনে খুব কম মানুষই পাওয়া যায় যার ওপর অভিমান করা চলে। বাকি সবটাই হচ্ছে ঘৃণা, ক্রোধ বা নির্বিকার অবহেলার সম্পর্ক। সেটা খারাপের দিকে। আর ভালর দিকে হল ভদ্রতা। ভদ্রতার ভালবাসা, ভদ্রতার খোঁজখবর, ভদ্রতার নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া। যেমন সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক, যেমন পাশের বাড়ির সঙ্গে। গোটা ব্যাপারটাই বাঁধা এক পরিমিত অনুভবে।

আমি ওর সামনে থেকে সরে আসি। আয়নার কাছে দাঁড়াই। একটা হাত-খোঁপা করি। দেখি আমার নিষ্প্রাণ চোখ। স্তিমিত দৃষ্টি। ভার হয়ে আসা গাল। দেখি শুকনো ঠোঁট জোড়া। আমি, আমার বাবা-মায়ের ছোট সন্তান, তারা দু'জনেই রূপবান মানুষ, আমি কী করে অসুন্দর হতে পারি? আগে কেউ কখনও অসুন্দর

BanglaBook.org

বলেনি আমাকে। মাধবী ছাড়া আর কেউ আমাকে দেখে বলেনি বিশ্রী! কিন্তু এখন? আনন্দ হারাতে হারাতে, খুশি ফুরোতে ফুরোতে, আমি না অসুন্দর, না সুন্দর। জড় নিষ্প্রাণ আমার অভিব্যক্তি। নিজেকে দেখতে দেখতে আমার মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কী ভাবে নষ্ট হয়ে গেল আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর সময়! তার জন্য কে দায়ী? আমিই! আমিই দায়ী সর্বাংশে! এর পর কী হবে? এর পর? আমি জানি না।

আমি উঠোনে যাই। দিদিকে ডেকে বলি, আমি তৈরি। দিদি ওপরে ডাকে আমাকে। বলে— হয়তো আর কখনও আমার বাড়িতে আসা হবে না তোর।

জলে ভরে ওঠে ওর চোখ। আমি ওর কাঁধে হাত রাখি। বলি— আসব। হয়তো কুড়ি বছর পর।

ও দ্রুত চোখের জল মুছে নেয়। ওর ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেছে। সে বরং ভাল। তখন মেজ পরিবার ডাকে আমাকে। মেজশাশুড়ি বলে— আমার আশীর্বাদ রইল। তোর ভাল হবে। এই নে। সন্দেশ খা।

ছোটশাশুড়ি উঠে আসে ওপরে। বলে— চল আমার ঘরে। একটু মিষ্টিমুখ করবি।

আমি নেমে আসি। ছোটর ঘরে যাই। ছোট আমাকে দুটি রসগোল্লা দেয়। আমি খেতে থাকি। ওপর তলার দুটি পরিবার নেমে আসে নীচে। নির্মলদা বলে— গাড়ি বার করি তা হলে?

বলি— করো।

রসগোল্লা খেয়ে আমি প্রণাম করি প্রত্যেককে। তারপর নিজের ঘরে ফিরি। অন্যরা বারান্দায় দাঁড়ায়। শুধু মেজ-জা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে। বলে— তোর গয়না নিয়েছিস?

আমি হাসি। ওকে বলি না যে আমার যা সামান্য ক'টা হয়েছিল, তার বেশিটাই নেই। শেষ দুটি রাখা ছিল মাধবীর কাছে।

মেজ-জার প্রশ্ন ও শুনে থাকবে। ও ছুটে আসে। বলে— শোনো শানু, তুমি কোথায় গয়না নেবে, না নেবে, হারিয়ে ফেলবে, তাই এখন তোমাকে কিছু দিচ্ছি না। পরে চাইলে পেয়ে যাবে।

আমি মাধবীর দিকে তাকাই। ঘাড় নাড়ি। আমি জানি ওই গয়না আমি চাইব না কারণ ওগুলো মাধবী আমাকে গুছিয়ে দিয়েছিল। এবং মাধবীও জানে, গয়নাগুলো ও দেবে না।

আমি বারান্দা সংলগ্ন বসার ঘরের দরজাটা খুলে দিই। নির্মলদা এসে আমার

BanglaBook.org

স্যুটকেসগুলো নিয়ে যায়। বই ভর্তি স্যুটকেস একা টানতে রীতিমতো কষ্ট হয় ওর। আমি হাতব্যাগ কাঁধে নিই। চটি পরি। বসার ঘরের সোফায় পাশাপাশি বসে থাকে মা আর ছেলে। এত দিনের একত্র বসবাসের চোরা আবেগ আমার মধ্যে কাজ করতে থাকে সম্ভবত। আমি মাধবীকে প্রণাম করে ফেলি হঠাৎ। ও কিছু বলে না। বারান্দায়ও যায় না। আমি বারান্দায় সবার মুখোমুখি দাঁড়াই। দেখি ওরা কাঁদছে। দেখে আমার বিস্ময় জাগে। ওরা তো কখনও আপন ছিল না আমার। আমিও ওদের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করিনি কোনও দিন। তবু, এই যাবার বেলা, ওদের কান্না আমাকে বিচলিত করে। পথের নেড়ি কুকুরটা সাত রাত উঠোনে এঁটোকাঁটা খেলে তার ওপরেও মায়া পড়ে যায় মানুষের!

আমি হাত নাড়ি। ওরাও নাড়ে। দিদি সামনে বসেছে। আমি পিছনের সিটে বসি। হঠাৎ মেজ-জা ছুটে আসে। বলে— দাঁড়াও, দাঁড়াও!

আমরা তাকিয়ে থাকি। ও ছুটে আমার পরিত্যক্ত ঘরে চলে যায়। দু'হাতে তুলে আনে আমার রাইটিং ডেস্ক। বিছানায় বসে লেখার জন্য বাবা খুব সুন্দর নকশা দিয়ে ওটা করিয়ে দিয়েছিল। একটা ছোট স্যুটকেসের মতো আকৃতি বলে আমি ওটা রেখে এসেছিলাম। কাঠের জিনিসটা নিতে লজ্জাও করছিল। ও ওটা নিয়ে আমার দরজার কাছে দাঁড়ায়। বলে— এটা তুই ছাড়া আর কে ব্যবহার করবে।

আমি ওটা নিই। পাশে রাখি। কৃতজ্ঞ বোধ করি ওর ওপর। নির্মলদা গাড়ি চালায়। ওদের কান্না দেখেই কিনা জানি না, হঠাৎ হৃদয়-ছেঁড়া কান্না পায় আমার। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিটকে ওঠা কান্না সামলাই। পিছনে পড়ে থাকে অর্ধশতাব্দী প্রাচীন তিন-তলা বাড়িটা। তার কুয়োপাড়, তার উঠোন, অন্ধকার শ্যাওলাধরা স্নানঘর, আর, আমার নিন্দিত ওয়ার্ডরোব সমেত বিষাদময়, অন্ধকার, গুমোট ঘর— যার চারটি দরজা, দুটি জানালা, যার মাত্র একটি খোলা যায়!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্বনির্ভরা

স্বনির্ভরা। এই হস্টেলটার নাম। সল্টলেক স্টেডিয়ামের পাশে এই সরকারি হস্টেল আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যেন আমি যেমন চাই, তেমন। বিশাল ক্যাম্পাস। তার অর্ধেক গাছপালা ও বুনো ঝোপে ভরতি। বাকিটা চমৎকার সাজানো। বিশাল লন ঘিরে একটা এল ধরনের চারতলা বিল্ডিং। পূর্বের অর্ধেক এবং উত্তরের পুরোটা ঘেরা। পশ্চিমে আরও একটা চারতলা বিল্ডিং। লনে নানারকমের ফুলগাছ। এই জুলাইতে দোপাটিই বেশি। এ ছাড়া বেলফুলের গাছ আছে অনেক। সাদা বড় বড় বেলফুল ফুটে আছে তাতে। দুটো বিল্ডিং-এ সারিসারি ঘর। ছোট ছোট ব্যালকনির গা ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়া গাছ। বৃষ্টির আঘাতে তখনও খসে পড়েনি লাল-কমলা কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলি সমস্তই।

মুখোমুখি ঘরগুলির মাঝে লম্বা করিডর। চওড়াও। সিঁড়িগুলোও চওড়া। উত্তর ও পূর্বের ঘরের সারির মাঝখানে একটি বিশাল খোলা অংশ। ফাঁকা। মেঝের মসৃণ মোজেইক নিয়ে, প্রচুর আলো হাওয়া নিয়ে ঝকঝক করছে।

এত খোলা জায়গা, এত অবারিত আলো-হাওয়া, এত প্রশস্ততা— এখানে থাকব আমি, ভাবতেই কীরকম সুখ-সুখ লাগে! আমি দিদির দিকে তাকাই। দিদির মুখেও ভাল-লাগার রেশ। পশ্চিমের বিল্ডিং-এ সুপারের ঘরে বসে আছে নির্মলদা। ও আমাদের সঙ্গে আসতে পারত বড়জোর একতলার গেস্টরুম পর্যন্ত। বেশিক্ষণ থাকবে না বলে ও আর এল না। মেয়েদের হস্টেলে পুরুষের ভেতরে যাবার নিয়ম নেই। যদিও যে আমার স্যুটকেস বয়ে পৌঁছে দিচ্ছে ঘরে, সে একটি ছেলে। উনিশ-কুড়ির ছেলেটি এই হস্টেলের একজন সুইপার। যে আমার ঘর খুলে দিচ্ছে, সেও ওই বয়সেরই একটি ছেলে। তার কাজ আলো জ্বালা, নেভানো, জলের পাম্প চালানো, আরও টুকিটাকি। অফিসে বসেই সুপার এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে। বড়জোর সাতাশ বছর বয়স সুপারের। কত হস্টেলেই আমি থাকলাম। কিন্তু এরকম অল্পবয়সি সুপার আর দেখিনি। যেহেতু এটা কর্মরত মহিলাদের থাকার জায়গা, সেহেতু সুপারের খুব বয়স্ক, কড়া, গম্ভীর হওয়া প্রয়োজন বলে সম্ভবত কর্তৃপক্ষ মনে করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তর এই হস্টেলের দায়িত্বে। তার আধুনিকমনস্কতায় আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

BanglaBook.org

তখন সুপার আমাকে কিছু নিয়ম-কানুন বলে দেয়। প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে ভাড়া দিতে হবে। পর পর তিন মাস বাকি পড়লে সিট বাতিল হতে পারে। রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। যদি এমন কোনও চাকরি হয়, যাতে ফিরতে রাত দশটা পেরিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে চাকরির জায়গা থেকে আনতে হবে একটি স্বীকৃতিপত্র। তৎসহ একটি আবেদনপত্র সুপারের কাছে জমা দিতে হবে যাতে বিষয়টি অনুমোদন করা যায়।

সকালে বেরুনোর কোনও সময় বলা নেই। কিন্তু কেউ দেখা করতে এলে তাকে সময় মানতে হবে। সকালে সাতটা থেকে ন'টা, বিকেলে পাঁচটা থেকে সাতটা।

এ ছাড়া আরও হাজার নিয়মের কথা ও তড়বড় করে বলে যায়। আমি শুনি শুধু। মাথা নাড়ি। কিছু বলি না। প্রথম দিনই এত নিয়ম মনে রাখার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করি না। শুধু চারপাশে তাকিয়ে সরকারের এই উদ্যোগকে মনে মনে প্রশংসা করি। কৃতজ্ঞও বোধ করি সর্বাংশে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন থেকে উদ্বোধন পর্যন্ত লেখা সমস্ত সন-তারিখ দেখে বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

দোতলায় পূর্বভাগের প্রথম ঘরটিতেই জায়গা পেয়েছি আমি। ঘরের নম্বর দু'শো এক। থ্রি সিটার হলেও আপাতত এ ঘরে আমি ছাড়া আর একজন। তার নাম কেয়া। ঘরে ছিল না সে। থাকার কথাও নয়। এ সময় সে তার কাজের জায়গায় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ঘরে ঢুকেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ আমার নাকে লাগে। বড় বড় চারটে জানালার সবগুলোই বন্ধ। আমি আগে বাথরুমের দরজা খুলে উঁকি দিই। বেশ বড় পরিষ্কার বাথরুম। বেসিন, শাওয়ার, কমোড সমেত টিপটপ, ঝকঝকে। আমি ব্যালকনির দরজা খুলে দিই। একটা একটা করে খুলে দিই কাচের জানালা। কাচের মধ্যে দিয়ে আলো আসছিল। এখন তা উদ্ভাসিত হল। আমি দিদির দিকে তাকালাম। ও এতক্ষণ কিছুতে হাত লাগায়নি। দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। আমি ওকে দেখে হাসি। বলি— কী রে! কেমন লাগছে?

ও হাসে, বলে— ভাল। তুই ভাল থাকবি।

হঠাৎ ও আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমিও ধরি ওকে। মুখ রাখি পরস্পরের পিঠে। দু'জনের আবেগ-কম্পন মিশে যেতে থাকে। ওর অশ্রুতে আমার কামিজ ভিজে যায়। আমি ভেজাই ওর পিঠ। কিছুক্ষণ। তারপর পরস্পরকে ছেড়ে দিই আমরা। ও বলে— তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

BanglaBook.org

ওর বড় বড় চোখ জলে ভেজা। লাল। লাল নাকের ডগা। ওর কথার বিনিময়ে আমি চুপ করে থাকি। বলতে পারি না কিছু। বলতে পারি না—আমারও তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

বললে মিথ্যে বলা হত। কপটতা হত। আমি, আমার সহোদরার সঙ্গে, গভীর ভালবাসার সম্পর্কের সঙ্গে, অকারণ কাপট্য করতে পারি না। তখন আমার সঙ্গে দিদিকে বেশিক্ষণ চাইনি আমি। একটু একা হওয়ার জন্য আমি কাঙাল ছিলাম।

আমার নীরবতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলে না ও। একটু অন্যমনস্কভাবে বলে—তুই থাকবি না। ওই বাড়িতে খুব একা লাগবে আমার।

আমি বলি না, ক'দিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে আমার না-থাকা। বলি না, আমি আসার আগে দশ বছর তুই আমাকে ছাড়াই ও বাড়িতে সুখে ছিলিস। বলি না। এবং বলি না বলে আমার স্বস্তি হয়। কীরকম নির্ভার লাগে নিজেকে। কারণ, আমি, সর্বান্তঃকরণে তখন দিদির কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমিও চাইনি দিদি বেশিক্ষণ থাকুক। নির্মলদাও চায়নি। ওর কাজে যেতে হবে। অতএব দিদি বেশিক্ষণ থাকেনি। আমি চাইলে হয়তো ও থেকে যেতে পারত। এখান থেকে ওর বাড়ি পর্যন্ত বাসরুট আছে। বিকেলে বাসে করে ফিরে যেতে পারত ও। কিন্তু একবারও থাকতে না বলে আমি বরং তাড়া দিই ওকে। নির্মলদার কথা বলে ওকে নিয়ে নীচে যাই। গেট পর্যন্ত যাই ওদের সঙ্গে। দিদি, খুব তাড়াতাড়ি এক দিন আসবে, বলে যায়। গাড়ির দরজা খুলে বলে— যদি বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করে, বলিস, রান্না করে নিয়ে আসব।

কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির মতো মাতৃস্নেহের রং ওর মুখে লেগে থাকে। একটু ভারী হয়েছে ও। তার জন্য মুখের ধারালো ভাবটা চলে গিয়ে নরম-সরম লাগছে। আমি ওকে দেখি। ওর মসৃণ ত্বকে জুলাইয়ের দুপুর চিকচিক করে। নির্মলদা গাড়ি চালু করে বলে— কিছু লাগলে বোলো।

আমি মাথা নাড়ি। ওরা চলে যায়। আমি ফিরি। হস্টেলের লন পেরিয়ে যাই। বড় শান্ত, নীরব লাগে এই পরিবেশ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠি। সার-সার তালাবন্ধ দরজার মধ্যবর্তী করিডর দিয়ে হেঁটে যাই। দরজা খুলে ঢুকি ভিতরে। ছিটকিনি দিই। আমার সামনে উন্মোচিত হয় এক নতুন জগৎ। কোনও বন্ধন নেই। শৃঙ্খল নেই। নিশ্চয়তা নেই। তবু, এ জগৎ অপরূপ সুন্দর। মুক্ত। স্বাধীন। আদি পৃথিবীর মতো মনে হয়। আমি চোখ বন্ধ করি। দু'হাত ছড়িয়ে দিই দু'দিকে। আমার মাথার ওপর ফুল স্পিডে পাখা ঘোরে। আমাকে উড়িয়ে নিতে চায়। আমার দু'হাতে ডানার অস্তিত্ব জাগে। মুক্তির অনির্বচনীয় আনন্দে আমি উড়তে থাকি মহাশূন্যে। কোনও শোক লাগে না আমার। কোনও কষ্ট লাগে না। অতীত ঘাড় কামড়ে ধরে না আমার। আলোর ফুলকি ছোটে আমায় ঘিরে। কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলতে ভয় করে আমার। যদি দেখি, চোখ খুলে যদি দেখি, আমি দাঁড়িয়ে আছি ওই অন্ধকার বিষাদময় ঘরটায়— যদি... যদি... তখনই আমি খুলে ফেলি চোখ, আর দেখি ব্যালকনিতে বসে আছে নীল মাছরাঙা। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে নীল শরীর ভাসিয়ে দেয় শূন্যে। ডানা দুটি ওর, অনায়াসে চিনতে পারি আমি। তার নাম আকাশ।

BanglaBook.org

দু'শো এক

কারও সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করতে আমার আপত্তি ছিল। আমি জানি, আমার জন্য প্রয়োজন ছিল একাকী নিস্তব্ধ জগৎ। কিন্তু সিঙ্গল বেড-রুম আমি পাইনি। এই হস্টেলে সিঙ্গল রুমের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। আমাকে বলা হয়েছে, সিঙ্গল রুমের জন্য আমার আবেদন সযত্নে রাখা হয়েছে। ক্রমানুসারে আমি একদিন তা পেয়ে যাব। কবে, তা আগে থেকে বলা যাবে না।

হস্টেলে থাকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার আছে। নীলের সঙ্গেও শেষ তিন-চার বছর আমার যে থাকা, তাকেও আমি ওই হস্টেলের ঘর ভাগ করে থাকার অভিজ্ঞতা দিয়েই মেপেছিলাম। আপাতত সিঙ্গল রুমের জন্য উতলা না হয়ে আমি এই ঘরখানা দেখি। এক দিকের জানালার কাছে কেয়ার খাট। মশারির দু'টি কোণ টাঙানো। চাদর কুঁচকে আছে। বালিশের কাপড়ে ময়লা। এক পাশের মেঝেতে একটি হিটার ও হাঁড়ি-কড়া আমার চোখে পড়ে। ওর খাটের পাশে একটি ছোট টেবিল। তাতে ছোট আয়না, চিরুনি, পাউডার। অন্য দিকের জানালার পাশের বিছানাটিই আমার পছন্দ হয়। এই জানালা থেকে রাস্তা দেখা যায় কেন না তাদের অবস্থান সমান্তরাল। ব্যালকনিটাও এদিকেই। আমার বিছানার পাশেও একটি টেবিল। আসলে এই হল এখানকার বসবাসের চূড়ান্ত আসবাব। একটি খাট এবং একটি দু'ফুট বাই দেড় ফুট টেবিল। টেবিলের নীচে একটি লকার। প্রত্যেকটি খাটেই পাতা আছে পুরু কার্ল-অন তোশক। এবং, মাথাপিছু একটি করে ব্যাকেলাইটের চেয়ার ইতস্তত।

আমি আমার টেবিলের সামনে দাঁড়াই। ছোট ছোট খোলা ঠোঙায় মুসুর ডাল, কালো জিরে, হলুদ গুঁড়ো, নুন ইত্যাদি আমার চোখে পড়ে। চোখে পড়ে টেবিলের ধুলো এবং ধুলোর ওপর আঠালো ছোপ ছোপ দাগ। আমার স্বভাব অনুযায়ী ইচ্ছে জাগে তৎক্ষণাৎ সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিই। কিন্তু অন্যের জিনিসে হাত দিতে অস্বস্তি হয়। আমি হাত দিয়েই ঝেড়ে নিই গদির ওপরটা। তারপর চাদর পাতি। হালকা সবুজ এই চাদরটা অনেক দিন আগে অসম থেকে এনেছিল বাবা। আমার খুব পছন্দ ছিল বলে মা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। ডাবল বেডের পক্ষে চাদরটা খাটো ছিল বলে ও-বাড়িতে ব্যবহার করিনি। সেটা কাজে লাগছে এখন।

BanglaBook.org

এটা আসলে বেড কভার। এর নীচে আরও একটি চাদর পাতার কথা। কিন্তু সে আমার নেই। আপাতত কেনার প্রশ্নও নেই কারণ আমার হাতে অর্থ সামান্য। অথচ অনেক কিছু কিনতে হবে!

তিন হাজার টাকা নিয়ে আমি বেরিয়েছি। এর একটি টাকাও আমার নিজের নয়। টাকাটা দিব্যদা আমাকে দিয়েছে। ধার। এই মুহূর্তে দিব্যদা আমার একমাত্র সহায়। কেউ যদি ধোঁয়ার কুণ্ডলী জড়িয়ে স্বর্গে যাবার স্বপ্ন দেখে— তা যেমন অবাস্তব এবং হাস্যকর, দিব্যদাকে অবলম্বন করে আমার এই নিজের মতো বাঁচতে চাওয়াটাও তাই। তবু এই সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি। কিছু একটা হবে। হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস নিজের ওপর জারি রেখেছি নিরন্তর। কী হবে কেমন করে হবে আমি জানি না। কিন্তু বিশ্বাস রেখেছি। স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের মতো বিশ্বাস।

বাবা বলেছিল— চলে আয়।

আমি বলেছিলাম— দাদাদের ওপর আর নয় বাবা।

বাবা বলেছিল— বেশ। দাদাদের ওপর দরকার নেই। আমার পেনশন তো আছে। তুই ক'টা টিউশন করবি না হয়।

আমি রাজি হইনি। বাবার পেনশন কী আমি জানি। মায়ের ওষুধ কিনতেই তা শেষ হয়ে যায়। বাঁচে যা সামান্য, তাই দিয়ে বাবা নিজেদের টুকিটাকি কেনে। গামছা, সাবান, লুঙ্গি, গেঞ্জি, মায়ের জামা-কাপড়। মাঝে-মধ্যে মাছ-টাছ কিনে এনে সম্মান বাঁচাতে চায়। খাওয়া-দাওয়া এক দিন বড়দার কাছে, এক দিন ছোড়দার কাছে। কোনও ছেলেই বাবা-মায়ের দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। আক্ষরিক অর্থেই ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ওরা দু'জনই খুব সাধারণ কাজ করে। খুব সাধারণ মাইনে পায়। এ বাজারে ওই টাকায় সংসার চালানো কষ্টকর। তাই বাবার মতো ব্যয়ধর্মিতা নেই ওদের। ওরা চালায় হিসেব করে। সেই হিসেবনৈপুণ্য, যত বার যাই, দেখি, আর বাবা-মায়ের জন্য কষ্টে মন ছটফট করে। দু'জনেই মাছ-মাংস বাজার করে। যেদিন বাবা-মায়ের খাবার কথা থাকে না, সেদিন। সোমবার বাবা-মা যদি বড়দার কাছে খায়, তা হলে ছোড়দার বাড়িতে সেদিন মাছ আসে। মঙ্গলবার ওরা ছোড়দার কাছে খাবে। সেদিন বড়দা মাছ আনবে।

হায়রে দু'পিস মাছ— তার জন্য কত কসরত দেখলাম!

খেতে বসলে মাধবী প্রায় দশ মিনিট ধরে বাছত কোনটা কাকে দেওয়া যায়। অনেক সময় ছোট-বড় বুঝতে পারত না। এক দিন একটা পিস আমার পাতে দিয়ে হায়-হায় করে উঠল ও— ইস্‌স, এই পিসটাই বড় ছিল, এটা নীলুকে দিতে পারতাম!

নীলের দিকে তাকিয়ে বললাম— নিয়ে নাও।

BanglaBook.org

নীল তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল— না, না। ঠিক আছে!

হয়তো ইচ্ছে করেই করত মাধবী এসব। আমাকে বুঝিয়ে দিত আমি কত নগণ্য! বুঝিয়ে কী পেত? সে উপলব্ধি আমার কখনও হবে না।

বাবা একসময় যা আয় করেছে, তা-ই ব্যয় করেছে। অভাব ছিল আমাদের কিন্তু কার্পণ্য ছিল না। সঙ্কীর্ণতা ছিল না। দাদারা এ সব কোথায় পেল জানি না। যেখানেই পাক, ওখানে থাকা চলে না। চলে না যে, তা তো আমি আগেই জেনেছি। কারণ এ হল আমার নীলকে ছেড়ে শেষবার আসা।

দিব্যদার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না আমার। নিজের আর কী-ই বা আছে! শেষের দিকে প্রুফ দেখে আর দুটো টিউশ্যান করে হাজারখানেক টাকা উপার্জন করতাম। প্রুফের ব্যাপারটা অনিয়মিত ছিল। স্থায়ী উপার্জন বলতে পাঁচশো টাকা। তাই দিয়ে আমি নিজের একান্ত খরচগুলি চালিয়েছি। আমার সাবান, শ্যাম্পু, খাতা, পেন, চটি, অন্তর্বাস। কোথাও গেলে তার বাসভাড়া। তার থেকে আর কী জমে! প্রুফের টাকা পেলে অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছে জাগত বই কেনার। কিনতাম। তবু আটশো টাকা জমিয়েছিলাম আমি। শেষবার বাবা-মায়ের কাছে যেতে সেটা খরচ হয়ে গেছে।

দিব্যদা ছাড়া আর একজনের কাছ থেকেই টাকাটা চাইতে পারতাম আমি। সে নির্মলদা। কিন্তু চাইনি। কারণ নির্মলদা শেষ পর্যন্ত নীলেরই দাদা। জ্যেঠতুতো হলেও।

তিন হাজার টাকার মধ্যে আজ ষোলোশো টাকা চলে গেছে। এক হাজার টাকা হস্টেলের কশন মানি, ছ'শো ঘর ভাড়া। মাসের মাঝখানে এলেও ভাড়া দিতে হল পুরোটাই। অতএব চোদ্দোশো টাকা আছে আর আমার হাতে। আপাতত অনেক কিছু কিনতে হবে আমার। স্যুটকেস খুলে খাতা বার করি আমি। ব্যাগ খুলে পেন নিই। খাতার পিছনের পাতা সরু করে মুড়ে তালিকা বানাই— তোয়ালে, হাওয়াই চটি, থালা, বাটি, চামচ, চিরুনি, আয়না, সাবান, সাবান রাখার পাত্র, সার্ফ, বালতি, মগ, ভেজা পোশাক তারে আটকাবার ক্লিপ... জীবনযাপনের এই সব অত্যাবশ্যক বস্তুর তালিকা দীর্ঘতর হতে থাকে। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। কোথায় যাব জানি না। কলকাতার কিছুই চিনি না আমি। গেটের মুখে ক্যান্টিনের বুড়ো রাঁধুনের সঙ্গে দেখা হয় আমার। সে বলে— নতুন? আমি হ্যাঁ বলি, সে বলে— রাতে টিফিন নেবেন?

—নেব।

BanglaBook.org

চলে যেতে যেতে হঠাৎ জরুরি কথাটি মনে হয় আমার। ফিরে ডাকি তাকে— শুনুন!

সে দাঁড়ায়। আমি বলি— মিল মানে কত টাকা?

—রোজ খেলে বাইশ টাকা। এক দিন খেলে পঁচিশ টাকা।

—দু'বেলা?

সে হাসে। কালো ছোপ-ধরা দাঁত থেকে এমন ব্যঙ্গ ঝিকোয় যেন আমি কী বোকার মতো বলে ফেলেছি! আঙুল দিয়ে বুকের ময়লা তুলতে তুলতে সে বলে— চাল কত করে? ডাল কত করে? মাছ কত করে? পঁচিশ টাকা দু'বেলা? আমাদের লীলা দিদিমণি ক্যান্টিন তুলে দেবে।

লোকটার পাকা চুল, কুঁজো শরীর, ময়লাটে ধুতি ও গেঞ্জি দেখতে দেখতে আমি টের পাই, আমার রাগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হচ্ছে না। আমি বলি— লীলা কে?

—লীলা দিদিমণি, ক্যান্টিনের লিজ নিয়েছে।

—আপনি কী করেন?

—রান্না করি, খেতে দিই।

আমি দু'পা এগিয়ে আসি তার দিকে। বলি— নাম কী আপনার?

—নাম? আমার নাম দিয়ে কী হবে? আমাকে দিদিরা ঠাকুর বলে।

—বেশ, ঠাকুর, রান্নার আগে হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবেন।

—অ্যাঁ?

সে অবাক চোখে তাকায়। আমি বলি— স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

তাকে ফেলে এগিয়ে যাই আমি। যে বাস দিদির বাড়ি পর্যন্ত যাবে। তারও নম্বর দু'শো এক। তাতে চেপে বসি আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দু'শো এক রুট

বাসের পেছনের দিকে যে লেডিজ সিট, তার দরজা সংলগ্ন সিটটাই আমার পছন্দ। সেটা পেয়ে যেতেই গুছিয়ে বসি আমি। প্রায় ফাঁকা বাস। সে চলতে থাকে অলস ভাবে। কন্ডাকটর ভাড়া চায় আমার কাছে। আমি দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিই। সে বলে— কোথায় যাবেন?

আমি থমকে যাই। কোথায় যাব আমি? নামব কোথায়? ও বাড়িতে শেষের দিকে আমি স্বাধীনভাবে বেরুনোর চেষ্টা করতাম, বেপরোয়া ঘুরতাম নানা কাজে। কিন্তু সে-ও ছিল সীমিত কয়েকটি জায়গা। তখনও দেখেছি, আজও দেখি একা একা ঘুরে-ফিরে বেড়াবার মধ্যে কীরকম জড়তা এসে গেছে আমার। কীরকম ভয়-ভয় লাগে। অথচ কলকাতা শহরকে আমি একাই চিনেছি। কয়েক বছর ধরে কোমরে তীব্র যন্ত্রণা হয় এক-এক সময়। প্রায়ই জ্বর আসে। এর কোনও চিকিৎসা আমি প্রত্যাশা করি না। নিজেই অ্যানালজেসিক কিনি, প্যারাসিটামল কিনি। খাই। সেরে যাই। কিন্তু একা এখানে-ওখানে যেতে গেলে আমার সেই সেরে যাওয়া জ্বর ফিরে আসে। কোমরে যন্ত্রণা হয়। আমি বারবার ঘড়ি দেখি। বেপরোয়া বেরিয়ে এসেও আমার মনে হয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। রোগগ্রস্ত হয়ে উঠি আমি, কেন না গত সাত বছরে যখনই কোথাও বেরিয়েছি, ফিরতে দেরি হলে মাধবী তুলকালাম করেছে। কারণ আমার ছাত্রজীবনের হস্টেলবাস, আমার নাট্যদল বা দলবহির্ভূত পুরুষ বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে গত ছ'বছর আমার কোনও যোগাযোগ নেই, তারা আমার সঙ্গ ছাড়েনি। আমি কোথাও একা যেতে চাই মানেই আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে কোনও পুরুষ। এবং সেই সব অপেক্ষায় সত্যিই কখনও ঢুকে পড়ে কেউ এবং তছনছ করে আমাকে তুলে দেয় মাধবীর হাতে। মাধবী ওই এলোমেলো অবস্থায় ঘিরে চিৎকার করে— খারাপ, খারাপ, খারাপ!

বিশ্বজগতে তা প্রতিধ্বনিত হয়। সবাই যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। বিচার করে না। তাদের চোখেও আমি দেখতে পাই খারাপ, খারাপ, খারাপ। হতে পারে, কারও আমাকে নিয়ে ভাববার সময় নেই। হতে পারে সাময়িক মজা পায় তারা।

BanglaBook.org

একজন ক্লিষ্ট বিপন্ন অভিযুক্ত মানুষকে দেখার মজা। এবং তারা ভুলে যায়। কিন্তু আমি ভুলি না। আমার মনে হয় সারা জগৎ আমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না। এ ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করছে না যে আমি কত খারাপ! কত ঘিনঘিনে আমার ঠোঁট! কী বিশ্রী আমার হাঁটা! আমার হাসি কী অশ্লীল! আমার মনের মধ্যে সারাক্ষণ কতই না কিলবিলে পাপের ইচ্ছা।

অর্থাৎ, মাধবী যা-যা বলে আমাকে নিরন্তর, যা বলে আমাকে নিন্দা করে, বিদ্ধ করে, আমি সে সম্পর্কে বেপরোয়া থাকতে চেয়েও, নির্বিকার থাকতে চেয়েও, ঢুকে পড়ি কাল-আবর্তে। সারাক্ষণের নিন্দাবাদ শুনতে শুনতে আমি আমার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে ভুলে যাই। কেউ আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দেয় না। কেউ বলে না— তুমি ভাল! বারিষওয়ালার মতো হঠাৎ কেউ এসে পড়ে না আমার জীবনে। বলে না—অত টাইট করে খোঁপা বেঁধে রেখেছ কেন? খুলে দাও তোমার চুল। চোখ বন্ধ করো। বলো, আমি সুন্দর! বলো। বলতে থাকো। থেমো না।

আসে না কেউ এবং আমি এ কথাও ভাবতে পারি না— মাধবী কে? কী এমন গুরুত্ব তার? সে যদি চব্বিশ ঘণ্টা আমার সমালোচনা করে, তাতে কী এসে যায়!

আমি সব গুরুত্ব দিই এবং নিজেকে সমালোচনার যোগ্য বলেই ভেবে বসি এক সময়। আমার আত্মমূল্যায়নের ক্ষমতা লোপ পায়। ওই অন্ধকারের তর্জনীই সঠিক এবং আমি এই প্রাপ্তির চেয়ে যোগ্যতর কিছু নই বলে বিশ্বাস জন্মায় আমার। কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আমার কারণ স্কুল পর্বে আমার উজ্জ্বল সাফল্য ছিল, কিছু হতে পারিনি আমি কারণ কলেজ পর্বে ওই সম্ভাবনাকে আমি ধ্বংস করেছি নিজেই। সমস্ত ফলাফল, সমস্ত শাস্তি ঘাড় পেতে নিতে নিতে, তবু, এক-এক সময় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি আমি:

প্রতিদিন দু'বেলা খেতে বসি এবং প্রতিদিন দু'বেলা আমার রান্নার সমালোচনা হয়। এটা ভাল হয়নি। চালটা আরও ভাল করে ধোবে। ডালে কাঁটা দাওনি ঠিকমতো। মাছের ঝোলে হলুদ বেশি দিয়েছ। মোচাটা খেতে ভাল হয়েছে। কিন্তু তেল আরও কম দেবে। ঝিঙে-পোস্তর ঝিঙেটা আর একটু ছোট কাটবে— বাড়িতে কেউ এলে শুরু হয় লম্বা ফিরিস্তি, আমি কী কী জানি, কী জানি না, আমার চলা কেমন, গলায় গানের সুর কতখানি, আমি বারমুখী, না ঘরমুখী!

এক রবিবারের দুপুরে মাটন রান্না করি আমি সযত্নেই। খেতে বসলে শুরু হয় যথারীতি— শানু আজ রেঁধেছে ভাল।

—হ্যাঁ, শুধু গরমমশলাটা আর একটু কম দিতে হত।

BanglaBook.org

—ঝোলটা একটু বেশি টেনে গেছে।

—প্রেসারে একটা সিটি কম হলে একেবারে ঠিকঠাক সেদ্ধ হত।

আমি নীরবে শুনতে থাকি, রোজকার মতো সবার আগে আমার খাওয়া হয়ে যায়, ওরা পরম তৃপ্তিতে হাড় চুষছে দেখতে পাই আমি, হঠাৎ কী হয় আমার, মেনে নেওয়ার ধর্ম বিস্মৃত হয়ে, সহনশীলতার ধর্ম বিস্মৃত হয়ে, আমি বলে উঠি— প্রতিদিন রান্না নিয়ে সমালোচনা করাটা এ বার বন্ধ করুন আপনারা।

শিবানন্দ খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। মাধবীর ঠোঁটে আটকে যায় নলি হাড়। নীল আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নিবদ্ধ করে ভাতে। আমি পর্যায়ক্রমে তিন জনের দিকে তাকিয়ে বলি— প্রতিদিন দু'বেলা রান্না করছি, প্রতিদিন দু'বেলা সমালোচনা শুনছি। কেন? এমন অখাদ্য তো রান্না করি না আমি, যা মুখে তোলা যায় না।

শিবানন্দ বলে— আজ তো তোমার প্রশংসাই করলাম।

—চাই না প্রশংসা।

আমি বলি। আরও বেশি উত্তেজিত হতে থাকি ক্রমশ। বলে যাই— নিন্দা বা প্রশংসা কোনওটাই আমার দরকার নেই। আমি চাই না আমাকে নিয়ে এত আলোচনা হোক, যে যখন বাড়িতে আসবে, আমি দেখেছি, তার সঙ্গে আমাকে নিয়ে আলোচনা হবে। আমি দেখতে কেমন, শুনতে কেমন, আমার রান্না কেমন, হাসি কেমন, আমি ভাল না খারাপ— কেন? বাড়ির আর কারওকে নিয়ে তো কোনও কথা হয় না? চানাচুর নাকি আমি? আমাকে ছাড়া আড্ডা জমে না!

ওরা স্তব্ধ হয়ে থাকে। আমি চলে যাই। থালা রাখি। হাত ধুই। আমার ভেতরটা গনগন করে। হ্যাঁ, আমি কিছুই হতে পারিনি, তবু গনগন করে। এ সংসারে আমার কোনও আর্থিক অবদান নেই, তবু গনগন করে। উত্তেজনায় আমি কাঁপি। খাটের ওপর রাইটিং ডেস্ক তুলে সাদা পাতার দিকে তাকিয়ে থাকি অপলক। প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ প্রত্যাশা করি আমি। এবং স্থির করি মুখে মুখে জবাব আমি দেব না। দিলেই তা দাঁড়াবে ঝগড়ার মতো। ঝগড়া আমি করব না।

তখন, মাংসের সব ঝোল চেটে-পুটে খেয়ে মাধবী দপদপ করে আমার ঘরে আসে। আমার নাকের কাছে নিয়ে আসে এঁটো তর্জনী। বলে— শোনো শানু। নিজেকে কী মনে করো তুমি? দারুণ প্রতিভাবান? শোনো, খাতায় ছাই-পাঁশ যাই লেখো না কেন, মনে রেখো, তুমি কিছুই নও। হ্যাঁ, হতে পারে তুমি ছিলে। কিছু ছিলে। কিন্তু এখন তোমার কিছুই নেই। নিজের চরিত্রটাও ঠিক রাখতে পারোনি। মনে রেখো, এখন তুমি এ বাড়ির বউ। এখানে, এ বাড়ির মতোই তোমাকে থাকতে হবে।

BanglaBook.org

আমি চুপ করে থাকি। ঘাড় শক্ত করে থাকি। ঠাণ্ডা চোখ রাখি মাধবীর ওপর। ও অনেকক্ষণ কথা বলে চলে যায়। ক'দিন আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না। আমিও বলি না। একটি কথাও না বলে দিব্যি আমার দিন কেটে যায়। খাবার টেবিলেও কোনও সমালোচনা হয় না ক'দিন। কিন্তু মাধবী ঝাল মেটাবার অন্য পথ ধরে। যখনই কিছু ফুরিয়ে যায়, এনে দিতে বলি, ও বলে— এই তো সেদিন আনলাম, কী হল!

চাল, চিনি, চা-পাতা, কালো জিরে— কোনও বস্তুই ওর এই মন্তব্য থেকে ছাড় পায় না। একদিন তেল ফুরিয়ে যায়। আমি তেল আনার কথা বলি। মাধবী চিৎকার করে ওঠে— আর আমি কিছু এনে দিতে পারব না তা বলে দিলাম। এত জিনিস আনি, যায় কোথায়? জিনিস আনিয়ে আনিয়ে কি তুমি ফতুর করে দেবে আমাকে?

আমি গ্যাসে কড়া চাপিয়েছিলাম। হাঁড়ি চাপিয়েছিলাম ভাতের। পট পট করে দুটি গ্যাসের নব ঘোরাই তৎক্ষণাৎ। নিবিয়ে দিই। বলি— আপনারা সুস্বাদু রান্নাও চাইবেন, তেল-নুনের হিসেবও কষবেন, তা তো হবে না।

ও বলে— তুমি কি আমার গলায় গামছা দিয়ে সব আদায় করবে?

আমি বলি— না। আমি আর রাঁধব না। আমি সব যোগাড় করে দেব। আপনি রাঁধবেন। রেঁধে দেখুন কতটা কী পরিমাণে লাগে!

মাধবী লাফাতে লাফাতে ঘরে যায়। শিবানন্দ আর নীলের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। ওরা আমাকে কিছুই বলে না। সম্ভবত সংসারের এই দুই পুরুষ সিংহ, মেয়েলি ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায়। রান্না এবং শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্ব, দুটোরই মেয়েলিত্ব সম্পর্কে এ সমাজে আজও কোনও সংশয় দেখা যায়নি।

আমি রান্না থেকে হাত গুটিয়ে নিই পুরোপুরি। সকালে চা পর্যন্ত করি না। আয়োজন করে দিই। তরকারি কেটে ধুয়ে দিই, মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে দিই, মশলা দিই হাতের কাছে, চাল ধুয়ে রাখি, মাধবী রাঁধে। ওর রোজকার জীবনের ছন্দ পাল্টে যায়। সকালে চা খেয়ে, গুছিয়ে সমালোচনা করে, ফাই-ফরমাশ দিয়ে, একঘন্টা ধরে স্নান আর ঠাকুর প্রণাম করে, পিঠময় ভেজা চুল ছড়িয়ে পায়ের ওপর পা তুলে খবরের কাগজ পড়ার বারোটা বাজিয়ে দিই আমি। আমার মধ্যে একটি প্রতিশোধস্পৃহ শয়তান খিক্-খিক্ করে হাসে। কিন্তু খেতে বসে বিস্মিত হই আমি। দেখি, সামান্য তেল-মশলা দিয়ে রান্না করছে মাধবী। কফি সেদ্ধ হচ্ছে না। মাছের ঝোলে আঁশটে গন্ধ। এত খারাপ খেতে লাগছে যে আমারই গলা ফাটিয়ে সমালোচনা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য ও নীরবতায় ওরা নীরবে খেয়ে

BanglaBook.org

নিচ্ছে সব। আমি তেলের বোতল লক্ষ করি। তেলের পরিমাণ কমে না। ওরা কি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়েছে? আমি বুঝি না। তবে এই বোধ আমার জাগে, মাধবী প্রমাণ করে ছাড়বে, আমার অর্ধেক তৈজস পরিমাণে ও রান্না করে দেখিয়ে দিতে পারে!

আমার মধ্যেকার শয়তান আমাকে মধ্যরাতে জাগিয়ে দেয়। আমি প্রত্যেক দিন খানিকটা করে তেল ফেলে দিতে থাকি নর্দমায়।

অবশেষে দশ দিন পেরিয়ে গেলে শিবানন্দ এক সকালে আমার হাত ধরে নিয়ে বসায় বিছানায়। বলে— আর জেদ কোরো না। এবার রান্নার কাজে হাত লাগাও। তোমার মা'র কত কষ্ট হচ্ছে!

আমি চুপ করে থাকি।

ও বলে— আমাকে দেখো! আমি তো কত কিছু সহ্য করি। আমার জন্যই না হয় করো।

কন্ডাকটর আমার জবাবের প্রতীক্ষা করে অধৈর্য হয়ে যায়। বলে— কী হল?

—বনহুগলি।

বলে ফেলি আমি। সে টিকিট এবং টাকা ফেরত দেয়। আশ্চর্য অভ্যাসে বনহুগলি বলে ফেলেই নিজের কাছে লজ্জাবোধ করি। আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটের বিশাল ইমারত, বি টি রোড, সাইকোমেট্রি ইন্সটিটিউট, খালসা মডেল স্কুল। আমি চোখ বন্ধ করি, ভেসে ওঠে কুয়ো, যার সামনে দাঁড়িয়ে কত রাত আমি মৃত্যুর কথা ভেবেছি এবং মরিনি এই জন্য যে আমার ডায়রি, চিঠিপত্র, বন্ধুদের ছবি— আমার একান্ত জগৎ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক, তা আমি চাইনি। ওদের টানে আমি ফিরে গেছি। ওরাই আমার জীবন হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এত কাল।

রেখেছিল কারণ এখন আর ওরা নেই। বস্তুত, আমি সমস্তই কুয়োর মধ্যে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কুয়ো আমাকে সর্বাংশে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সে ছিল অনেক চিঠি। আমার প্রথম প্রেমের। সেই প্রেম, যার দ্বারা প্রতারিত হয়ে আমি ধ্বংস বেছে নিয়েছিলাম। সে ছিল অনেক চিঠি। আমার পত্রবন্ধুর। সে আমাকে চেয়ে চেয়ে ফিরে গেছে বার বার। দশ বছর ধরে যত চিঠি সে আমাকে লিখেছে— তার সব আছে ফাইল বন্দি হয়ে। অ্যালবামে ভরা ছবি তাদের। ডায়রি ভরা অজস্র কথা!

বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেবার পর ওই সমস্ত কিছু আমার কাছে বিষম বাহুল্য হয়ে ওঠে। ফাইলে অ্যালবামে ডায়রিতে বন্দি অতীত আমার আর আজীবন বইতে

BanglaBook.org

ইচ্ছে করে না। নীলের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরও বর্জন করতে চাই। ত্যাগ করতে চাই যাতে নির্ভার হই আমি। শুরু করতে পারি এক নতুন জীবন। সে-জীবন থেকে অতীতের দাগ মুছে ফেলতে ফেলতে শেষ হয়ে যাবে আমার আয়ুষ্কাল হয়তো বা, জেনেও, আমি দুপুরের নির্জনতার সুযোগে কুয়োর জলে নিক্ষেপ করি চিঠিপত্র, নির্মমভাবে ছুড়ে ছুড়ে ফেলি ছবি, অ্যালবামের প্লাস্টিক নিরাপত্তা থেকে নির্দয়ভাবে টেনে নিই তাদের। একটা একটা করে ফেলে দিই আমার গত দশ বছরের সব ডায়রি। ডায়রির ভারী মলাটের চাপে সব ডুবে যায়। অতীতকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে নির্ভার চলেফিরে বেড়াই দু'দিন। তৃতীয় দিন, ওই এক নির্জন দুপুরে উঠোন পরিষ্কার করতে গিয়ে ঝি কীসব আবিষ্কার করে ছুটে আসে আমার কাছে। বলে— কুয়ায় কীসব পড়িয়া গেছে। আপনে যেমন লিখেন, তেমন!

আমি ছুটে যাই এবং কুয়োর পাড়ে গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে যায় আমার। সমস্ত কাগজ জলে ভিজে ফুলে ভেসে উঠেছে। তাদের সবার ওপরে আমার প্রথম প্রেমিকের ছবি। কালো-সাদা পোস্টকার্ড সাইজের ছবিটা সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমার হাত-পা ঝিমঝিম করে। কী সৌভাগ্য আমার যে অন্য কেউ দেখেনি এ দৃশ্য। আমি দ্রুত হাত চালাই। দড়ি-বালতি নিই হাতে। সেই বোকা-সোকা ভালমানুষ ঝি-কে বলি— আমি তুলছি। তুমি সব নিয়ে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে এসো।

সে বিনা প্রশ্নে আমার নির্দেশ পালন করে। সেই মুহূর্তে ডাস্টবিনকেই পরম আশ্রয়স্থল মনে হয় আমার। সব ফেলা হয়ে গেলে আমি সেই প্রথম প্রেমিকের ভেজা নরম ছবিটির দিকে তাকাই। টের পাই আমি— আমার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে গেছে কবে, আমি জানি না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঋতবান

ওর নাম ঋতবান। আমার যখন ক্লাস সেভেন, ও এল ক্লাস এইটে। কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথা। লালচে-ফর্সা গায়ের রং। বড় বড় চোখ। স্কুলে এসেই ও হয়ে উঠল আলোচনার প্রধান বিষয় কারণ এত দিন ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ত। কোনও দুষ্কর্ম করায় মিশন থেকে ও বহিষ্কৃত হয় এবং আমাদের গঞ্জের স্কুলে ভর্তি হয়ে আলোচিত হতে থাকে।

ভর্তি হয়েই প্রথম ষান্মাসিক পরীক্ষায় ওই ক্লাসের ফার্স্ট বয় দীপায়নকে হারিয়ে দিল ও। ফার্স্ট হল। ক্রিকেট খেলায় ও ব্যাট করল দারুণ। স্পোর্টসে ও হল ইন্টারক্লাস চ্যাম্পিয়ন।

কিন্তু ওকে নিয়ে আলোচনা করার কোনও ইচ্ছেই আমার কখনও হয়নি। আমি, চিরকালের ফার্স্ট বেঞ্চার, কোনও পরীক্ষায় কোনও দিন দ্বিতীয় না হওয়া, দু' বিনুনি ঝুলিয়ে সকালবেলা অনিমেষবাবুর কাছে পড়তে যাই। ওখানে দীপায়নও আসে। দীপায়ন কালো, মোটা-সোটা। কথা বলে কম। কিছুটা অমিশুক। আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব বই ও পড়াশোনার মধ্যে সানন্দে সীমাবদ্ধ। আমরা দু'জনেই পাশাপাশি পড়াশোনা করে আরও এক বছর পার করে দিই এবং নতুন ক্লাসে, ও টেন, আমি নাইন, আবার পাশাপাশি পড়ি। এক দিন ওর অঙ্ক খাতায় পেন দিয়ে আঁকা একটি ছবি চোখে পড়ে আমার। মিলিটারি গাড়ির সারি চলছে একের পর এক। বড় থেকে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে সাদা পাতার দিগন্তে, ঠিক যেমন আমাদের স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে মিলিটারি গাড়ি যায় একের পর এক। ছবিটা মুগ্ধ হয়ে দেখি আমি। কালির রংটাও অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে। যে নীল রঙে আমরা লিখি, এ তেমন নয়। আমি জিগ্যেস করি— তুমি এঁকেছ?

ও বলে— না। ঋতবান।

সহসা ঋতবান সম্পর্কে আমার মধ্যে কিছু গড়ে উঠতে থাকে। তা আমার গোচর হয় না। কিন্তু স্কুলে, আমি টের পাই, আমার চোখ খোঁজে ঋতবানকে। আমি কারওকে এ কথা বলি না। খুব তাড়াহুড়োও করি না। আসলে কী করতে হয় জানিই না আমি। শুধু, গোপন রাখার তাগিদ জারি থাকে আমার ভেতর।

BanglaBook.org

শরতে শিউলি ফুলেরা কখন ছেয়ে ফেলে গাছ আর কখন নিঃশব্দে পৌঁছয় ফুটে ওঠার মুহূর্তে, জানা যায় না যেমন, তেমনি আমারও ওই চোদ্দো বছর বয়সে, হৃদয়ে ঘটে যাচ্ছে এক চিরপুরাতন চিরনূতন অনিবার্য অনুভূতির সঞ্চার— আমি তা জানতেও পারি না।

ইংরিজিটা শক্তপোক্ত করে নেবার জন্য বিশ্বজিৎবাবুর কাছেও কোচিং নিতে শুরু করি আমি। আমরা পাঁচ বন্ধু। এক সকালে, বিশ্বজিৎবাবুর ঘরে বসে হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখতে পাই ওকে। গেট খুলে ঢুকছে ও। আমার হৃদপিণ্ড উত্তেজনায় ছলকে ওঠে। ওর সমীপে আছড়ে পড়তে চায়। দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করে এমন যে আমার মনে হয় দু'হাতে চেপে ধরি, থামাই, নইলে সবাই ওর শব্দ শুনতে পাবে!

ও এসে আমারই পাশে বসে। আমি মাথা খাতার সঙ্গে প্রায় লাগিয়ে ফেলি। একটিও কথা বলি না ওর সঙ্গে। এ ভাবে কেটে যায় গোটা সপ্তাহ। সপ্তাহে তিন দিন বিশ্বজিৎবাবুর কোচিং-এ যাওয়ার সময় একই সঙ্গে যাবার জন্য তীব্র আকর্ষণ বোধ করি আমি এবং অনীহা। ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করে এবং ওকে অস্বীকার করতেও।

একদিন ও আমার পাশে বসেই অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে, ওর খাতা খোলা, আমি সে-খাতার দিকে তাকাই এবং মুগ্ধ হয়ে যাই, অসামান্য হস্তাক্ষর ওর। আর ওই কালির রং, যা আমি দীপায়নের খাতায় দেখেছিলাম।

আমাদের টাস্ক দিয়ে বিশ্বজিৎবাবু রোজ বাজার করতে যান। একদিন ও একটি জ্যামিতির সমস্যা দেয় অন্যদের। বলে— তোরা কেউ এটা করতে পারবি? ক্লাস নাইনের সিলেবাসেই আছে।

অয়ন ছাড়া আর কেউ আগ্রহ দেখায় না। ও আমাদের সেকেন্ড বয়, খাতায় ছবি আঁকতে থাকে। অন্যরা বলে— ছাড় তো! কোন শালা এখন জ্যামিতি ভাববে!

ঋতবান হঠাৎ আমাকে বলে— এই, তুমি পারবে?

আমার ভয়-ভয় করে! যদি না পারি! যদিও ক্লাস নাইনের জ্যামিতি প্রথম তিন মাসে শেষ করে দিয়েছেন অনিমেষবাবু। এক্সট্রা করিয়েছেন প্রচুর। উনি বলেন— মনে রাখবি, জিওমেট্রি সলভ করতে হবে শূন্যে। মনে মনে ছবি এঁকে সমাধান করতে হবে।

এক-এক দিন অনিমেষবাবুর নেশা লেগে যায়। টেস্ট পেপার খুঁজেখুঁজে উনি দিতে থাকেন দুরূহতর সমস্যা। আমি কোনওটা পারি, কোনওটা পারি না। যেটা পারি না, উনি করে দেন। আমি বুঝে নিই। এই করে করে আমার মধ্যেও এক্সট্রা

BanglaBook.org

সমাধান করার নেশা লেগে গেছে। কিন্তু ঋতবানের সামনে আমার স্নায়ু দুর্বল হতে থাকে। ও ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়, নরেন্দ্রপুর ফেরত। ও যা পারে না তা আমি কী করে পারি!

তবু, ওর দেওয়া এক্সট্রা টেনে নেই। নিতে বাধ্য হই। আমি বাইরের দিকে তাকাই। বিশ্বজিৎবাবুর কোয়ার্টার্সের সামনের সবুজ মাঠে মনে মনে আঁক কাটি আমি। একটু জটিল এক্সট্রা। এবং শেষের দিকের উপপাদ্য ব্যবহার করতে হবে বলে সম্ভবত অয়ন পারেনি। ও গৌরাঙ্গবাবুর কাছে সায়েন্স পড়ে। ওর ধরন আলাদা।

মাঠ থেকে গোটা ছবি তুলে আনি আমি। খাতায় স্থাপন করি। ও বলে— গুড! তার মানে দীপায়ন যা বলে তা সত্যি।

—কী?

আমি জিগ্যেস করি।

ও বলে— তোমার ক্লাস নাইনের জিওমেট্রি শেষ।

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। জিওমেট্রি শেষ হয়ে যাওয়াটা আমার একান্ত গোপন ব্যাপার। সবার মাঝখানে ও তা প্রকাশ করে দেয়। আমি চুপ করে থাকি। জানলা দিয়ে দেখতে পাই বিশ্বজিৎবাবু ফিরছেন। তখন বলি— অঙ্ক অ্যাডিশনাল নিয়েছি। কম্পালসারি আগে আগে করে না নিলে সামলাব কী করে?

ও হাসে। বলে— অঙ্ক নিলে কেন?

—ভাল লাগে। তোমার কী?

—ফিজিক্স।

আমি হঠাৎ বলে ফেলি— তুমি অসাধারণ ছবি আঁকো।

—কী করে জানলে?

ও অবাক তাকায়। এমনকী বিনয়ও প্রকাশ করে না। বলে না, এ আর এমন কী? বরং ওর প্রশ্নে বোঝা যায়, ও নিশ্চিত ও অসাধারণ ছবি আঁকে। আমি বলি— দীপায়নের খাতায় এঁকেছিলে।

—ও তো এমনি। মিলিটারি গাড়ি যাচ্ছিল। হিস্ট্রি ক্লাসে ভাল লাগছিল না, তাই।

—তুমি কি সত্যি পারোনি?

—কী?

—ওই এক্সট্রাটা?

—সত্যি না।

BanglaBook.org

স্যার এসে যাওয়ায় আমরা কথা থামিয়ে দিই। সারাদিন ওর সঙ্গে বলা কথাগুলো আমার মাথায় ঘোরেফেরে। পড়ার বইয়ের অক্ষরগুলো ও হয়ে যায়। হঠাৎ একটু একা-একা থাকতে ভাল লাগে আমার। ভাবতে ভাল লাগে। স্কুলে সারাক্ষণ ওকে খুঁজে বেড়াই আমি। কিন্তু ওর ক্লাসে গিয়ে কথা বলার সাহস হয় না। সোম-মঙ্গল দু'দিন কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমার হৃদয়কে কানায়-কানায় ভরে রাখে। সেই আনন্দের সঙ্গে যেন কোনও কষ্ট মেশামেশি। সেই কষ্ট পীড়ন করে না। কেবল আনন্দের অন্য রূপেরই সন্ধান দেয় যেন।

বুধবার সকালে খুব দ্বিধার সঙ্গে ব্যাগ গোছাই আমি। পায়ে পায়ে স্কুলে পৌঁছই। দেখি ও সাইকেলে চেপে লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি আমরা। ও বলে— দাঁড়াও।

আমার বুক ধকধক করে। আমার বন্ধুরা প্রেমপত্র দেওয়া-নেওয়া করে। ছেলেরা হঠাৎ মেয়েদের হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। কিংবা কোনও বন্ধুর মাধ্যমে পাঠায়। ও কি আমাকে সেরকম কিছু দেবে? আমার ভয় করে। প্রত্যাশাও তীব্র হয়। আমি দেখতে থাকি। ও ব্যাগে হাত ঢোকায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ও ব্যাগ থেকে বার করে আনে বড় সাদা খাম। আমার পা কাঁপে। ও আমার দিকে তা বাড়িয়ে দেয়। আমার মনে হয় আমি পড়ে যাব। মরণ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না আমার সেই মুহূর্তে। জগৎ সংসার আমার চারপাশ থেকে মুছে যায়। কেবল একটি খাম, একটি সাদা খাম আমার দৃষ্টিচরাচর অধিকার করে। আমি হাত বাড়াই। ও বলে— তোমাকে দেব বলে কাল এঁকেছি।

—কী?

—দেখো।

আমি খাম থেকে বার করি একটি ছবি। জলরঙে আঁকা নদীপারের অপূর্ব নিসর্গচিত্র।

—বাঃ!

আপনা হতে বেরিয়ে আসে আমার মুখ দিয়ে। ও বলে— নেবে তো?

আমি বলি— হুঁ! কেন আমায় দিলে?

—ইচ্ছে করল।

ও সপ্রতিভ জবাব দেয়। আমি ওর চোখের দিকে তাকাই। খুঁজি। কী সুন্দর ওর চোখ। ওর ঠোঁট, নাক, গাল, কপাল, চুলের দিকে তাকাই। খুঁজি। কী খুঁজি আমি জানি না। ওর গালে একটা টকটকে লাল ব্রণ দেখে কেন জানি না আমার গা

BanglaBook.org

শিরশির করে। আমাকে নীরব দেখে ও বলে— উত্তরটা পছন্দ হল না? আচ্ছা বেশ! তুমি এক্সট্রাটা করতে পেরেছ, তাই।

আমি হাসি। পাশাপাশি চলতে থাকি বিশ্বজিৎবাবুর বাড়ির দিকে। একটা কথা ওকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দ্বিধা হয়। পথ ফুরিয়ে আসে আমাদের। আমার মধ্যে থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে আসে— ঋতবান, শোনো।

ও তাকায়। আমি ওকে দাঁড়াতে বলি। দাঁড়ায় ও। আমি বলি— তোমার জন্য আমিও আজ একটা জিনিস এনেছি। তুমি নেবে?

ও, কী জিনিস, জিগ্যেস না করেই বলে— নেব।

আমি ব্যাগ খুলি। বার করি জিনিসটা। বাড়িয়ে দিই ওর দিকে। ও বলে— এটা কী?

আমি বলি— খাতা।

—কীসের?

—আমার জ্যামিতি খাতা। অনেক এক্সট্রা করা আছে। তোমার যেগুলো লাগে, টুকে, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

ও হাসে। কী সুন্দর দেখায় ওকে হাসলে। চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে যায় ওর। বলে— তুমি কি আমাকে খুব পড়ুয়া ভেবেছ নাকি?

—নিশ্চয়ই!

—কী করে ভাবলে?

—তুমি যে নরেন্দ্রপুরে পড়তে।

—যাঃ বাবা! তাতে কী! ওখানে পড়লেই পড়ুয়া হয় নাকি?

—হয় না?

—মোটেই না। আমার মতো অনেক ফাঁকিবাজ ওখানে আছে।

—কিন্তু তারা নিশ্চয়ই খুব ব্রিলিয়ান্ট!

—হতে পারে। নাও হতে পারে! যাকগে! তুমি এনেছ যখন, দাও।

ওর গা-ছাড়া ভাব দেখে আমার অবাক লাগে। কিন্তু এভাবেই বিনিময় শুরু হয় আমাদের। খাতা, গল্পের বই, কলম, ওদের বাড়িতে ফোটা গ্র্যান্ডিফ্লোরার কুঁড়ি আমাদের বাড়ির ফুলদানিতে ফুটে যায়, আমাদের বাড়ির দোলনচাঁপার আদা থেকে নতুন চারা বেরোয় ওদের বাগানের মাটিতে। আমরা উচ্চারণ করি না প্রেম, বলি না ভালবাসি, আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের ভাষা খুঁজে নেয়, আমরা হাত ধরি।

ও আমার প্রাণের মধ্যে ঢুকে যায় একেবারে। সারাক্ষণ ওর অস্তিত্ব আমি টের পাই নিজের মধ্যে। যেন এক দ্বিতীয় সমান্তরাল মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে আমার মধ্যে,

BanglaBook.org

কারণ পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে, এমনকী পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার সময়ও আমি টের পাই, ওকে ভাবছি। তার জন্য কোনও ক্ষতি হয় না আমার। আমি বরং অধিক মন দিই পড়াশোনায়। ওকে কেন্দ্র করে আমার ওই নিভৃত জগতে আশ্চর্য সার্থকতার সন্ধান পাই আমি। বন্ধুরা টের পায় আমাদের সম্পর্কের কথা। একটু কথা হওয়া, একটু বসতে পারা পাশাপাশি, দূরে হেঁটে যেতে দেখা— এরই মধ্যে অপার্থিব আনন্দ পেতে পেতে আমরা বৎসরান্তে পৌঁছই। আমি ক্লাস টেনে উঠি, ও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। মাত্র চৌষট্টি শতাংশ পায়। দীপায়ন পায় বাষট্টি শতাংশ। ও কলকাতায় চলে যায় আবার। যাবার আগে কথা হয় আমাদের। আমার ঠিকানায় চিঠি লেখা চলবে না কারণ বাবা সব পড়ে দেখবে। দীপায়নের ঠিকানায় চিঠি দেবে ও। যে-খামে ছবি আঁকা থাকবে, তার মধ্যে থাকবে আমার চিঠি।

বিশ্বজিৎবাবুর বাড়িতে আমার ফাঁকা লাগে, স্কুলে ফাঁকা লাগে, ওর কথা ভাবতে ভাবতে আমি কল্পনার জগতে চলে যাই— দেখি, একটা বিশাল বন, তার মধ্যে আমি আর ও হাত ধরাধরি করে ঘুরছি। ও অর্কিড পেড়ে দিচ্ছে আমাকে, ওর চিঠির উত্তর লিখি আমি। কত হাজার কথায় ভরাই পাতার পর পাতা।

আমাদের স্কুল এখনও ওর জন্য গর্বিত বোধ করে। স্যারেরা ক্লাসে ওর মতো ফল করার কথা বলেন। কারণ আমাদের স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বছর ফার্স্ট ডিভিশন আসে না। চল্লিশ জনের মধ্যে দশ জন সেকেন্ড ডিভিশন পেলে আমরা বলি স্কুলের রেজাল্ট এ বার বেশ ভাল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবারই রেগুলার ছাত্রসংখ্যার দ্বিগুণ হয় কারণ প্রতিবার অর্ধেক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে। আমাদের স্কুলে এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা এই প্রথম প্রজন্ম স্কুলের পড়ুয়া। যাদের বাড়িতে একটা বানান বলে দেবার কেউ নেই। এমন অনেকে আছে যারা আসলে তাদের বাবার সঙ্গে পানের দোকান চালায় কিংবা হাটে চাল সবজি বেচে। কখনও সময় পেলে স্কুলে আসে। এবং এখানে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষারও অভাব, যা শহরে দেখা যায়, ভাল রেজাল্ট— ভাল রেজাল্ট।

সুতরাং ভাল কেউ করে ফেললে স্কুল তাকে মনে রাখে। ছোড়দাদের ব্যাচের প্রসেনজিৎ নন্দী সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলে রেকর্ড করেছিল। এবারের বার্ষিক উৎসবে ওকে ডাকা হয়েছিল স্কুল থেকে। ছাত্রছাত্রীরা দেখুক, আদর্শ একজনকে কাছ থেকে— যে সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়ে রেকর্ড করেছে!

BanglaBook.org

প্রসেনজিৎ নন্দী এসেছিল। আর আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেছিল ইংরাজিতে।

আমাদের স্কুলের অধিকাংশই ফেল করে অঙ্কে আর ইংরাজিতে।

এক দিন আমাদের কর্মশিক্ষার পিন্টুবাবু একগুচ্ছ খাতা নিয়ে আমাদের ডাকেন। বলেন— বেছে নে যার যেটা ইচ্ছে। কী ভাবে ফাইনাল খাতা তৈরি করতে হয় বুঝতে পারবি।

আমরা সবাই ভিড় করি। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে আমি পেয়ে যাই ওর খাতাটাই। ওর সেই অসামান্য হস্তাক্ষর, ওর সেই বিশেষ রঙের কালি— যা ও তৈরি করে কালো আর নীল কালি মিশিয়ে— সেই খাতা আমি বুকে আগলে নিয়ে যাই, একদিন আমাদের বাড়িতে মুসুরডালের ঠোঙা দেখে চমকে উঠি আমি, ঠোঙায় ওরই হাতের লেখা, পড়ে বুঝতে পারি, ভূগোলের উত্তর, আমি, গৃহকাজে বিমুখ, মুসুরডালের কৌটো এনে ভরে ফেলি সব আর সাবধানে খুলতে থাকি ঠোঙার তলায় আঠা লাগানো অংশটি। এবং মাধ্যমিক পাশ করি আমি। প্রসেনজিৎ নন্দীকে অনায়াসে টপকে নতুন রেকর্ড গড়ি প্রায় আশি শতাংশ নম্বরে। সে বছরই শ্বশুরবাড়ি যায় দিদি। সে বছরই নীলার্ণবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। ইংলিশে পার্ট ওয়ান ওর। আমি ওকে, খুব উৎসাহে জিগ্যেস করি— রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কেমন লাগে আপনার?

'শেষের কবিতা' আমি তখন তৃতীয়বার পড়ছি। ও বলে— শেষের কবিতা? আসলে কী জানো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার বিশেষ পড়া নেই।

দিদি চলে যাওয়ায় নতুন রকম শূন্যতার সন্ধান পাই আমি। বড়দা সদ্য চাকরি পেয়েছে। ছোড়দা ওর নিজের মতো থাকে। দিদিকে ছাড়া বাড়িটা খাঁ-খাঁ লাগে আমার। পাকা তেঁতুল খাবার আগ্রহ চলে যায়। কাঁচা আম কাসুন্দি মাখা ততখানি মনোরম লাগে না। কোনও কোনও রাত্রে একলা বিছানায় দিদির জন্য আমি গোপন কান্না ঢেলে দিই বালিশে। কিন্তু দিদি এলে আমি টের পাই, ও পূর্ণ হয়ে আছে। নির্মলদার সঙ্গে গড়ে ওঠা ওর নতুন ভুবন, ওর কোনও অভাববোধ নেই। শ্বশুরবাড়ির গল্প করে ও। আমি শুনি। আমার হাই স্কুল দেখতে দেখতে একটা বছর। আস্তে আস্তে একাকীত্বে আমার দখল জন্মায়। আমি, আমার একাকীত্ব এবং ঋতবান— এই নিয়ে আমি আত্মস্থ হয়ে যাই। বাসে চেপে বন পেরিয়ে কলেজ যাই। ক্লাস করি। প্রাইভেট কোচিং-এ যাই। অনায়াসে প্রথম হয়ে টুয়েলভে উঠি। ফোর্থ সাবজেক্ট বায়োলজি ছাড়া আর সবই আমি এগিয়ে নিতে থাকি দ্রুত। ইলেভেনেই শেষ হয়ে যায় আমার উচ্চমাধ্যমিকের অঙ্ক সিলেবাস।

BanglaBook.org

এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঋতবান ও দীপায়ন। এ বারও খুব সাধারণ নম্বর পায় ওরা। টেনেটুনে ষাট শতাংশ। কিন্তু এ বার আমার অসুবিধে শুরু হয়। দীপায়ন কলকাতা চলে যাবে। ও আর আগের মতো মুখচোরা অমিশুক নেই। পাল্টেছে অনেক। গোলগাল চেহারাটা ভেঙে লম্বাটে হয়ে উঠেছে। ওর কথায় সর্বজ্ঞ ভাব ফুটে বেরোয়। একদিন ও বলে— তোমার প্রেম এবার শেষ।

—কেন?

আমি জিগ্যেস করি।

ও বলে— আমি চলে গেলে ঋতবান চিঠি দেবে কোথায়?

আমার অসহায় লাগে। আমি ওর কাছে তা প্রকাশ করি না। কী করব ভাবতে ভাবতে অস্থির লাগে আমার। ঋতবানের চিঠি ছাড়া আমি থাকব কী করে! এই দু' বছরে আমি ওকে একবারও দেখিনি। একটি সাদা-কালো ছবি পাঠিয়েছে ও, সেই আমার সম্বল। আমার পাগল-পাগল লাগে। আমি আর থাকতে না পেরে আমার নতুন বন্ধু বল্লরীকে বলে ফেলি। ও বলে— তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না। আমি সোমকে বলে দেব। ঋতবান সোমের ঠিকানায় চিঠি লিখবে।

সেই ব্যবস্থাই হয়। বল্লরীর প্রেমিক আমার প্রেমিকের চিঠি এনে দেয়। সেই চিঠিতে একদিন ঋতবানের আগমন সংবাদ থাকে। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে আমার। ক্লাসে মন দিতে পারি না। ইচ্ছে করে চিৎকার করি। সবাইকে জানাই—ঋতবান আসছে। ঋতবান। আমার ঋতবান!

অথচ জানাই শুধু বল্লরীকে। এক সকালে কলেজের মাঠে ওর সঙ্গে দেখা হয় আমার।

সেবার ও ছিল পনেরো দিন। পনেরো দিনে চারবার দেখা করি আমরা। ও ওর কলেজের কথা বলে। পিয়োর সায়েন্স না নিয়ে ও পড়ছে ইকোনমিক্স। ম্যাক্রো ও মাইক্রো ইকোনমিক্সের মোটা মোটা বইয়ের কথা বলে। শোনায় ওর নতুন বন্ধুদের গল্প। দীপায়ন আর ও একই কলেজে পড়ছে। শুধু দীপায়ন কেমিস্ট্রি অনার্স।

শেষ দিন বিদায়ের বাঁশি বাজে। আমি, বল্লরী, সোম ও ঋতবান পোদ্দার কাফেতে বসি। কিছু কেনার অছিলায় বল্লরী আর সোম কিছুক্ষণের জন্য একা করে দেয় আমাদের। পোদ্দার কাফের ছোট্ট কেবিনে, এই প্রথম, একান্ত তাকাই আমরা পরস্পরের দিকে, টের পাই আমার উল্টো দিকে বসা ছেলেটিকে কী আপ্রাণ ভালবাসি আমি! ও আমার হাত টেনে নেয় হাতে। চুমু খায়। আমি শিউরে উঠি। আঁকড়ে ধরি ওর হাত। ও বলে—তোমাকে বলা হয়নি কোনও দিন।

BanglaBook.org

আমি ফিসফিস করি—কী?

ও বলে—তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি শানু!

আমার ঠোঁট কাঁপে। গলা বসে যায়। একই কথা আমিও বলতে চাই ওকে। কিন্তু বলতে পারি না। ওর হাত টেনে নিই মুখের কাছে। চোখ বন্ধ করে ঠোঁট রাখি তালুর ওপর। ও বলে—কামড়ে দাও। আমার হাতে দাগ করে দাও শানু। তোমার চিহ্ন নিয়ে আমি ফিরে যাব।

বিনিময়ে আমার অশ্রুবিন্দু পড়ে ওর বাহুতে। ও ধমকে ওঠে—কাঁদবে না! একদম কাঁদবে না শানু!

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকে ও। ফোঁপায়। আমি টেবিলে মাথা রাখি। ফোঁপাই। উদ্‌ভ্রান্ত আবেগে আমরা কেঁপে উঠতে থাকি।

এর ঠিক এক মাস পর ঋতবান আমাকে ছেড়ে চলে যায়।

একটি চিঠি লেখে ও। সোম আমাকে এনে দেয়। আমি, ওর অন্যান্য চিঠির মতোই নিভৃতে খুলব বলে অপেক্ষা করি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। ছুঁয়ে থাকি চিঠিটাকে। এই প্রথম আমার চিঠিতে কোনও ছবি আঁকা নেই। সোম, ওর হাতের লেখা চিনে গেছে বলে খুলে ফেলেনি। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ও কেন ছবি আঁকল না? ও কেন ভুলে গেল?

ছবি ছাড়া ঋতবানকে ঋতবান বলে মনে হয় না আমার। আমার ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ও আর্ট কলেজে পড়ুক। আমার ইচ্ছের কথা ওকে জানিয়েছি। ও কিছু বলেনি।

কলেজ শেষ হলে আমি বাসস্ট্যান্ডে চলে যাই। একটি ফাঁকা সরকারি বাসের পিছনের দিকে বসি। বাস ছাড়তে দেরি আছে আধঘণ্টা। গোটা বাসে এখনও একমাত্র যাত্রী আমি, সন্তর্পণে ছিঁড়ি ওর খামের মুখ। সাগ্রহে চোখ রাখি চিঠির পাতায়। এক নিঃশ্বাসে শেষ করি আদ্যোপান্ত। বাংলা ভাষায় লেখা চিঠির অর্থ বোধগম্য হয় না আমার। আমি আবার পড়ি তাকে। আবার। আবার। আমারই অজান্তে কাঁদতে থাকে আমার চোখ। আমি জল মোছার চেষ্টাও করি না। আমার হাতে ধরা খোলা চিঠির ওপর তা ঝরে পড়ে। মুছে দেয় অসহায় বর্ণমালা। মুহ্যমানের মতো আমি বসে থাকি। টের পাই না কখন চলতে শুরু করেছে বাস।

একবারও মনে হয় না আমার, ওকে লিখি, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। কেন এরকম করছ?

আমি পারি না এ কথা লিখতে যে ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমার সব শেষ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

আমি লিখি না ওকে, লিখি না আমার কান্না পাবার কথা, নিরন্তর কান্না পাবার কথা।

আমি বরং, শান্ত কলম চালাই সাদা কাগজে, লিখি, সম্পর্ক দু'জনে গড়ার জিনিস। একজন হাত গুটিয়ে নিলে আর কিছু করার থাকে না। অতএব, যদি এই অনিবার্য হয়, হোক!

আমার হৃদয় ভাঙার শব্দ পৌঁছয় না ও অবধি। আমি তাকে ঢেকে রাখি। আগলাই। কিছু বলি না আমার স্কুলের বন্ধুদের। কিছু বলি না বল্লরীকে। সমস্ত কান্না আমি চেপে রাখি রাত্রে একলা কাঁদব বলে। কাঁদি আমি রাতের পর রাত। আমার মস্তিষ্কে ঘুম জড়িয়ে যায়। চোখে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে। আমি পড়ার টেবিলে বসে থাকি আগের মতোই, কিন্তু ফিজিক্সের অঙ্ক কষতে পারি না, কেমিক্যাল স্ট্রাকচার গুলিয়ে ফেলি, অঙ্কের সূত্র বিস্মৃত হতে থাকি দ্রুত।

আমার পড়তে ভাল লাগে না। কথা বলতে ভাল লাগে না। ছেড়ে গিয়েও ঋতবান আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে আমাকে। নিরন্তর প্রশ্ন জাগে আমার মধ্যে। কেন ও এরকম করল? কেন? কেন? কেন?

বায়োলজি প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ডিসেকশন করতে গিয়ে আমি হাত কেটে ফেলি, বাস থেকে নেমে পড়ি মাঝপথে। বনে বনে ঘুরে বেড়াই একলা। বাসের লোক আমাকে হাঁ করে দেখে। আমি পরোয়া করি না। চিতা, সাপ, বুনো হাতি— কোনও কিছুকেই পরোয়া করি না আমি। আমার মনে হয় না একবারও, এই বনে, একলা আমি, ধর্ষিত হতে পারি। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার তফাত ঘুচে যায় আমার মধ্যে থেকে। আমি শুধু উত্তর খুঁজে বেড়াই— কেন? কেন?

টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্ক প্রশ্ন হাতে নিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকি। বল্লরীকে জিগ্যেস করি—ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টসের নিয়মটা যেন কী?

ও অবাক তাকায় আমার দিকে। ওর বিশ্বাস হয় না। পরীক্ষা দিতে হয় বলে দিই। ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু স্যারেরা গম্ভীর হয়ে যান। কড়া উপদেশ দেন আমাকে। বাড়িতে ভ্রূকুটি ঘনায়। আমি পরোয়া করি না। বল্লরী জিগ্যেস করে—ঋতবান আর চিঠি লেখে না কেন?

আমি পুরনো পত্রিকা ঘাঁটি। একটি পত্রিকায় দেখেছিলাম, পত্রবন্ধুত্বের জন্য ঠিকানা দেওয়া আছে। তার থেকে পছন্দ করে নিই তিনটি নাম। তিন জনকে জানাই আমার আগ্রহের কথা। ফোনের ঠিকানা দিই তাদের। বলি ঠিকানার পাশে তারা যেন ছবি এঁকে দেয়। দু'জন কোনও জবাব দেয় না আমাকে। কিন্তু সুদূর মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে, ঝকঝকে হস্তাক্ষরে ঠিকানা লিখে, ঠিকানার

BanglaBook.org

পাশে ছবি এঁকে পাঠায় একজন। তার নাম সুশান্ত জানা।

আমি সুশান্ত জানার চিঠি খুলি অনাগ্রহে। তার হাতের লেখা চমৎকার। আমি তাকে জবাব দিই অনাগ্রহে। তার ভাষা কবিত্বময়। সে তিনটি চিঠি দিলে আমি দিই একটির জবাব। এই সব চিঠি আমাকে পড়ায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করে না। আমার সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগে। সারাক্ষণ ঘুম পায়। সোম বলে—ঋতবানের হাতের লেখা পাল্টে গেছে না?

পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে দীপায়ন আসে। দাঁড়ায় আমার সামনে। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি, ওর কাছে লুকোবার কিছু নেই। পোদ্দার কাফের কেবিনে মুখোমুখি বসি আমরা। ও গম্ভীর মুখে তাকায় আমার দিকে। আমার চোখ থেকে টপ-টপ করে জল পড়ে। ও বলে—এখনও?

আমি চুপ করে থাকি। আমার মনে পড়ে দীপায়নের খাতার ছবি। মনে পড়ে বিশ্বজিৎবাবুর কোচিং। মনে পড়ে। সারাক্ষণ মনে পড়ে। আমি কী করব?

আমি বলি—কেন? জানো?

ও বলে—শুনলে তোমার কষ্ট বাড়বে। তোমার চোখে জল আমার সহ্য হয় না।

—তবু বলো।

—তার আগে বলো, এক কথায় সব মেনে নিলে?

আমি চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ। বলি—জোর করে এ জিনিস পাবার নয় বলে।

প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি শব্দ উহ্য রাখি আমি। যেন উচ্চারণ করলেই হারিয়ে যাবে গুরুত্ব, খসে পড়বে পবিত্রতা। দীপায়নও উচ্চারণ করে না সেই সব। বিচিত্র গলায় বলে—ঠিক! জোর করে পাওয়া যায় না। চেয়েও পাওয়া যায় না। আমি জানি।

ও হাসে। খুব করুণ দেখায় ওর অসুন্দর মুখ। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অদ্ভুত সীমায়িত। বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় না। দূরত্বও বাড়ে না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। বুঝতে ইচ্ছে করে না ওর এই কথার আড়ালে কী আছে! ওর জন্য মায়া হয় কিন্তু আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করি ঋতবানের কথা শোনার জন্য। ও রুমালে মুখ মোছে। তারপর বলে—ও প্রেম করছে।

আমি চুপ করে থাকি। চোখের পলক ফেলতে ভুলে যাই। ও কেটে কেটে বলে—খুব শাঁসালো পার্টি। কেরিয়ার নিয়ে ঋতবানের আর চিন্তা নেই।

আমি, স্থাণু থাকি, নাকের ওপর মাছি ভনভন করে। আমি তাড়াই না। চুলের গুচ্ছ এসে বাঁ চোখ ঢেকে দেয়। সরাতে ভুলে যাই আমি। দীপায়ন মাছি তাড়িয়ে

BanglaBook.org

দেয়। আলতো হাতে চুল সরিয়ে দেয় আমার চোখ থেকে। তারপর বলে—হোম সেক্রেটারির ভাইঝি। গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলেই ওর চাকরি।

আর কান্না পায় না আমার। ভেতরটা খট-খট করে। জল-জঙ্গল থেকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত এই আমি! দু'চোখ ডলি। অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে। অবিশ্বাসে ছিন্ন-ভিন্ন হই! এত সহজ! এত কাঁচা এই সব সম্পর্ক! আমার পাগল-পাগল লাগে। বমি পায়। টেবিলে পড়ে থাকে ঠান্ডা শক্ত ফিশফ্রাই। আমি হাঁটতে শুরু করি। কেন তা জানি না। হোম সেক্রেটারির ভাইঝির কাছে হেরে যাওয়া করণিকের মেয়েটির উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপ বিপুল বৈরাগ্যে দেখে সমগ্র পৃথিবী। দেখে, আরও এক সাধারণ করণিক-তনয়ের প্রাজ্ঞ নির্বাচনের পরিণতি। দীপায়ন দ্রুত দাম চুকিয়ে আসে আমার সঙ্গে সঙ্গে। ধমকায়। বলে—শানু, কী করছ? কোথায় যাচ্ছ?

আমি রাস্তা ভর্তি লোকের মধ্যে ওর হাত চেপে ধরি। বলি—দীপায়ন, আমি কলকাতায় যাব। তুমি একবার ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে আমাকে? হ্যাঁ বলো দীপায়ন! একবার দেবে?

দীপায়নের মুখ বিব্রত হয়ে ওঠে। তবুও হাত ছাড়িয়ে নেয় না। একটা রিকশা ডাকে ও। আমরা উঠে পড়ি। ছোট জায়গার বহু চেনা লোক দেখে এ-দৃশ্য। সাক্ষী থেকে যায়। ছেলেমেয়ের বন্ধুত্ব কলেজে ক্যান্টিনে, মিছিলে তবুও মানা যায়—কিন্তু ওই অপরিসর রিকশায় পাশাপাশি—! কিছু বা জটিল, কিছু বা নিন্দাঘন। আমি পরোয়া করি না। আগুন-আগুন লাগে আমার। বিদ্যুতের চাবুক মারি নিজের পিঠে। আমার হৃদয় জুড়ে ধ্বনিত হয় ঋতবান, ঋতবান! আমি ওকে ঘৃণা করতে পারি না কিছুতেই। ঘৃণার চেষ্টায় আমার মুখ নীল হয়ে যায়। কষ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা যায় উনষাট শতাংশ নম্বর পেয়েছি আমি। আমার জগৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। মাধ্যমিকের পর বাড়ি ভর্তি করে যারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, তারা ফিরেও তাকায় না আমার দিকে। অনিমেষবাবু বলেন—তোর কেরিয়ারে দু'দাগ লাগবে কখনও ভাবিনি।

শোকের আবহ নেমে আসে বাড়িতে। বাবা রাগ ও ঘৃণা নিয়ে আমার দিকে তাকায়। বলে—এ তো জানাই ছিল। ছেলেবন্ধুর হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াও তুমি। নোংরামো করলে আর পড়াশোনা হবে কোত্থেকে!

আমি শক্ত হয়ে থাকি। মাথা নিচু করে মার্কশিট আনতে যাই। আমার ফাঁকা লাগে! খুব ফাঁকা লাগে। মনে হয় ফেল করারই তো কথা ছিল আমার। কী ভাবে পাশ করলাম?

BanglaBook.org

কলেজে ফিজিক্সের স্যারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেন—কষ্ট পেয়ো না। হতে পারে এরকম। তোমার জন্য ফিজিক্সের ফর্ম তুলে রেখেছি আমি। আমি তোমাকে পড়াব।

অঙ্কস্যার বলেন—তুমি অঙ্কে অনার্স নাও। ওতেই তো তুমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছ।

আমি ফিরে আসি। কোনও কথা বলি না। বাবা আমাকে দার্জিলিং সরকারি কলেজে পাঠাতে চায়। আমি বলি—না। আমি কলকাতা যাব।

বাবা রাগ করে। আমি জেদ ধরে থাকি। আত্মীয়েরা বাড়ি বয়ে এসে আমার নিন্দে করে যায়। শোনা যায়, আমি জঙ্গলে প্রেমিক নিয়ে প্রেম করতাম। শোনা যায়, বাঁধের পাড়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াই কার সঙ্গে। শোনা যায়, কালীবাড়িতে কে আমার সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করি না। শুনি কেবল। শুনি। বাবা রাগে চিড়বিড় করে। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। বড়দা ছোড়দা ধমকায় আমাকে। আমার ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা উহ্য থাকে। কোনও সান্ত্বনা আড়াল করে না আমাকে। আমি পুড়ি। পুড়ি কেবল। ঘন, দম বন্ধ করা একাকীত্বের মধ্যেও আমি আর্তনাদ করি না প্রকাশ্যে। কিন্তু মা, আমার রূপবতী গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মা তা টের পায়। এক দিন, কী এক আশ্চর্য মহিমায় সে সান্ত্বনার হাত রাখে আমার মাথায়। এক মহাবৃক্ষ হয়ে ছায়া দেয় আমাকে। বাবাকে বলে—ও যদি যেতে চায় কলকাতায়, যাক।

বাবা ঘৃণার সঙ্গে বলে—আমি নিয়ে যেতে পারব না। আমার কাজ আছে।

বড়দাও দেয় কাজের অজুহাত। ছোড়দাও কোনও দায়িত্ব নিতে চায় না। মা বলে—আমি ওকে নিয়ে যাব।

আমার মা, সংসারে বন্দি মানুষ, কলকাতার কিছু চেনে না, বাবার মতের বিরুদ্ধে সে কখনও কোনও কাজ করেনি, আমায় নিয়ে রওনা দেয়। ট্রেনে চেপে বসে। আমার খারাপ ফলাফলের জন্য, মা—একমাত্র মা একাই, একবারের জন্য তিরস্কার করে না আমাকে। অথচ, আমার যেদিন মাধ্যমিকের ফল বেরোয়, মা, মা-র জীবনের সকল রস শুষে নেওয়া রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুই আমার সারা জীবনে একমাত্র সুখ!

BanglaBook.org

দু'শো এক

বাস খন্না সিনেমায় এলে আমি ভাবতে থাকি নামব কি না। এখান থেকে আমি চলে যেতে পারি হাতিবাগান বাজারে। প্রয়োজনীয় কোনও কিছুই এই বাজারে মিলবে না এমন নয়। কিন্তু আমি মনস্থির করতে না করতে বাস ফড়িয়াপুকুর পৌঁছে যায়। আমি উঠে দাঁড়াই। নেমে পড়ি শ্যামবাজারে। দাঁড়াই। চলে যাওয়া দেখি বাসটার। ও এখন ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবে, যেখানকার একটি ঘরে আমি সাত বছর কাটিয়েছি। যার অবস্থান, এই শহর কলকাতায় না হয়ে যে-কোনও শহরে নগরে গ্রামে-গঞ্জে হতে পারত। এক অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর, যার দেওয়াল আলমারিতে উইয়ের ঢিবি, যারা খেয়ে ফেলেছে আমার বহু মূল্যবান বই, যে-ঘরে ঘোরাফেরা করে আমার দ্বারা পরিত্যক্ত তিনটি মানুষ, আমার দ্বারা পরিত্যক্ত!

আমি খুশি মনে হাঁটি ফুটপাথ ধরে। আলতো শিস্ দিই। হালকা পদক্ষেপে ভিড় এড়িয়ে যাই। নিজেকে আমার লাগে নতুন একজন। একটি কালো কাচের দরজায় আবছা দেখি আমার প্রতিচ্ছবি। আমি এক মুহূর্ত দাঁড়াই। কাচের দরজার ওপর লেখা লেডিজ বিউটি পার্লার। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ি আমি। চারপাশে নতুন চোখে তাকাই। দেখি দেওয়াল জোড়া আয়না। প্রসাধনী। বিবিধ যন্ত্রপাতি। দেওয়ালে সাজানো নকল নখ। নকল খোঁপা। নকল চোখের পাপড়ি। পার্লারের মালকিন সার্টিফিকেট নিচ্ছেন এক নামী সংস্থা থেকে—বড় করে বাঁধানো তাঁর ফোটোগ্রাফ। মেঝেতে, কোণের দিকে জড়ো করা কিছু চুলের কাটা নজরে পড়ে আমার। এই প্রথম আমি কোনও বিউটি পার্লারে এলাম।

দুটি মেয়ে এগিয়ে আসে আমার দিকে। মিষ্টি করে বলে—বলুন দিদি! কী করাবেন দিদি? ফেসিয়াল?

আমি ফেসিয়াল করাইনি কখনও। ও বাড়িতে একটি মেয়ে আসত মাধবীর জন্য। ও এসব করাত। আমি ওদের রেট জানতে চাই। ওরা রেস্তোরাঁর মেনু কার্ডের মতো একটি ছাপানো কার্ড দেয় আমাকে। ফেসিয়ালের দাম দেখে আমার চোখ আটকে যায়। আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিই নিজেকে। বলি—আমি শুধু চুল কাটব।

BanglaBook.org

একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ আমায় একটি চেয়ারে বসিয়ে দেয়। খোঁপা খুলে দিয়ে ছড়িয়ে দেয় চুল। বলে—কী সুন্দর চুল আপনার দিদি! কেটে ফেলবেন? কী করবেন? স্টেপস?

আমি মাথা নাড়ি। আয়নায় দেখি নিজেকে। ওই লম্বা লম্বা চুলের বোঝা অসহনীয় লাগে আমার হঠাৎ। আমার ছেড়ে আসা জীবনের মতোই ওদের ছেঁটে দিতে চাই আমি। কখন আমি চুল কাটার প্রস্তুতি নিয়েছি, নিজেই জানি না। কী ছাঁটে কাটব, কেন কাটব কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজেকে বোঝার চেষ্টাও করি না আমি। ইচ্ছের হাতে ছেড়ে দিই। বলি—একেবারে কেটে ফেলতে চাই।

—বয়েজ কাট?

—হ্যাঁ!

মেয়ে দুটি বারবার হাত বুলোয় চুলে। মায়া ভরে দেখে। বলে—বড় চুলেও আপনাকে সুন্দর লাগছে কিন্তু।

আমি হাসি। কিছু বলি না। তাকিয়ে থাকি আয়নার আমির দিকে। ওরা চিরুনি, কাঁচি, ক্লিপ নিয়ে প্রস্তুত হয়। আমার কেমন বুক দুরদুর করে। হাতের তালু ঘেমে যায়। একজন চুল আঁচড়াতে থাকে। একজন জল স্প্রে করতে থাকে। আমি টানটান হয়ে বসে থাকি। আমার কাঁধের কাছে কুচকুচ করে কাঁচি চালায় ওরা। একজন চালায়, একজন বড় বড় গুচ্ছগুলি সংগ্রহ করে যত্নে। আমি চোখ বুজি।

চোখ খুলি। মাথাটা হালকা লাগে আমার। একমনে দেখতে থাকি নিপুণ কাঁচির কারুকাজ। ধীরে ধীরে একটা নতুন মুখ ফুটে উঠতে থাকে আয়নায়। সে-মুখে পেলবতা কম। একটু রাগী। কিন্তু ঝরঝরে। বিবাহিত জীবনের কোনও ছাপ নেই।

পার্লারের দাম মিটিয়ে নতুন মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসি আমি।

টুকিটাকি জিনিস, বালতি, বাসনপত্র, বালিশ ইত্যাদি নিয়ে হস্টেলে পৌঁছই আমি সন্ধ্যা নাগাদ। ঘরে ঘরে মেয়েরা ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার রুমমেট ফেরেনি। ভিজিটিং রুমে কথা বলছে লোকজন। হস্টেলের গেটের কাছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের রচনা করা গভীর দৃশ্য ইতস্তত ছড়ানো দেখতে পাই। প্রেমিকার টানে আসা প্রেমিকেরা— ওই দুটি মানুষের জোড়ের মধ্যে বাস করে ভালবাসা। ভালবাসা...! আমি দোতলায় উঠি। দরজা খুলি। জানালা দিয়ে হু হু হাওয়া ঘরে আসে। বেলফুলের গন্ধ সঙ্গে করে উড়ে আসে সে। আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঘরের দুটো টিউব জ্বালিয়ে দিই আমি। গোছগাছ শুরু করি। একা-একা। সাতটা নাগাদ কেয়া আসে। রোগা মিষ্টি মেয়েটি মোটা লম্বা বিনুনি সমেত হাসে আমার দিকে তাকিয়ে। বলে—তুমি তো দেবারতি?

BanglaBook.org

—তুমি তো কেয়া?

ও ব্যাগ রেখে শুয়ে পড়ে বিছানায়। শুয়ে শুয়েই সালোয়ার খুলে ফেলে। ছুড়ে দেয় খাটের তলায়। পা ভাঁজ করে পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। আমার দিকেই পা থাকায় আমি ওর রোগাটে থাই এবং একফালি প্যান্টি দেখি পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিই। আমার অস্বস্তি হয়। এ আমার দীর্ঘ সাত বছরের অনভ্যাস। না হলে, আমি বহু কালের হস্টেলে থাকা মেয়ে, আমি জানি লজ্জায় কুঁকড়ে থাকার প্রয়োজন এখানে হয় না।

ও ওঠে। বলে—দাঁড়াও, তোমার টেবিলটা পরিষ্কার করে দিই।

ওর পরিচ্ছন্নতার ওপর আমার ভরসা হয় না। আমি বলি—তার চেয়ে এসো দু'জনে ধরাধরি করে খালি টেবিলটা এখানে নিয়ে আসি। এটা ওখানে দিয়ে দিই।

—চলো।

টেবিল বদলে ও স্নানে যায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে। আমি ততক্ষণে গুছিয়ে ফেলি আমার বই। টেবিলের ওপর তারা তিন সারে তিন ফুট হয়ে ওঠে। তবু তারা ফুরোয় না। থেকে যায় আমার কবিতার ডায়রি, লেখার খাতা, আরও কিছু বই। আমি খালি বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে তার ওপর গুছিয়ে রাখি সব। যত দিন কেউ আসছে না, থাকুক।

মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোয় ও। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকায় বড় বড় চোখে। বলে—তুমি কি কলেজে পড়াও?

আমার মধ্যে দ্রুত একটি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম আমি প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। কী উত্তর দেব আমি? ভেবে আসিনি। কিন্তু আমার মধ্যেকার এক অন্য আমি প্রস্তুত ছিল বুঝি-বা। সে সতর্ক করে দেয় আমাকে। গোপন করো, গোপন করো। সত্য ভাষণের উলঙ্গ প্রকাশ স্বীকার করার শক্তি নেই আমার। যাবতীয় ভুল এবং অনিশ্চয়তা আমার—তাকে আমি কারও আলোচনার বিষয় হতে দিতে চাই না। আমি বলি—না।

ও বলে—তা হলে?

আমি বলি—আমি খবরের কাগজে কাজ করি।

—জার্নালিস্ট?

—বলতে পারো।

অনর্গল মিথ্যাভাষণের অভ্যাস নেই আমার। আমি সাবান, তোয়ালে, পোশাক নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাই। নিজের চারপাশে থরে থরে মিথ্যা সাজাই। পিচ্ছিল মিথ্যা সাবানের ফেনার সঙ্গে বিছিয়ে যায় মেঝেয়। অনৃতভাষণের জন্য হৃদয়কে

BanglaBook.org

গড়েপিটে নিতে থাকি আমি। কী বিচিত্র এ জীবন! অকারণ মিথ্যাভাষণের জন্যই নীলের প্রতি আমি প্রথম বিরূপ হয়েছিলাম। আজ আমিই দাঁড়িয়ে আছি বিবিধ মিথ্যার ওপর। এই হস্টেলে থাকার আবেদন করার জন্য ন্যূনতম আয় দরকার তিন হাজার টাকা। সিঙ্গল রুম পাবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা। দিব্যদা দেখিয়েছে, ওর কাগজের আপিস আমাকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দেয়। তারই ভিত্তিতে আজ এই প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাথরুমে আমি সাবান মাখছি। প্রস্তুত হচ্ছি আরও বিবিধ মিথ্যে বলার জন্য। তারই ভিত্তিতে সিঙ্গল রুম দাবিদারের তালিকায় ফাইলবন্দি আছে আমার নাম। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় কী ছিল? এখনও, এই ভারতে, বিবাহবিচ্ছিন্ন একটি মেয়েকে কোন বিচারে দেখে সমাজ? সন্দেহ ও সমালোচনার দৃষ্টিতেই কি নয়? এমনকী এই ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলও কি একই চোখে তাকায় না? আমার মতো আরও বহু জনের এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও? কত দূর বেপরোয়া হতে পারি আমি? কতখানি উপেক্ষা করতে পারি, আমাকে নিয়ে তৈরি হওয়া রসালো জল্পনা—যেখানে আমার কোনও নিশ্চয়তা নেই? যেখানে আমি আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল থাকব কি না তা জানি না?

যাবতীয় নিরুপায়তা দিয়ে মিথ্যাভাষণজনিত বিবেকযন্ত্রণার উন্মেষ টিপে ধরি আমি ঠিক তেমন ভাবেই, যেমন করে মাথা কেটে, নলি টিপে ফিনকি রক্তের নির্গম রোধ করে মুরগির ঘাতক।

এবং ঝরঝরে বেরিয়ে আসি আমি। এই প্রথম, স্নান করে, মাথায় তোয়ালে জড়াতে হয় না আমার।

হিটার জ্বেলে ভাত বসিয়েছে কেয়া। ছুরি দিয়ে তরকারি কুটছে। আমাকে দেখে ও বলে—তুমিও আমার মতো?

—কী?

আমি জিগ্যেস করি।

ও বলে—রাতে স্নান করো? দিনে করো না?

—করি তো। দু'বেলাই করি।

—ও। আমি দিনে করি না। রাতে করি।

—ও।

আমি বাথরুমের বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াই। ওখানে একটা আয়না আছে। এক সেকেন্ডে কাজটি সমাধা হয়ে যায়। জট ছাড়াতে হয় না। শুকনোর জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয় না। ফুরফুরে লাগে আমার। আমি শিস দিই। ও বাড়িতে আমার মুখে শিস শুনে সারা বাড়ি শোরগোল তুলেছিল। একটি মেয়ে, তায় বাড়ির

BanglaBook.org

বউ, ঠোঁট সুঁচালো করে শিস দিচ্ছে, এই অশ্লীল এবং অশৈলী দৃশ্যে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অলক্ষ্মীর যে চিহ্নটুকু আমার মধ্যে মাধবীর দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য পড়েছিল, তার ষোলোকলা পূর্ণ করেছিল আমার শিস দেবার স্বভাব। আমার প্রতি বর্ষিত ছিছিক্কার যতখানি আমাকে বেজেছিল—তার চেয়ে দিদিকে বেজেছিল বেশি। আমি জেদ করে শিস দেওয়া বাড়িয়েও দিতে পারি—এই উপলব্ধিতেই সম্ভবত, ও কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—কেন করিস এ সব? তোকে নিয়ে এত কথা আমার ভাল লাগে না।

না লাগারই কথা। আমি মেনে নিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে এমন তুলকালাম নিন্দে-বান্দা হলে আমারই কি ভাল লাগত?

অতএব প্রকাশ্য শিস আমি প্রত্যাহার করেছিলাম।

তবু একই দৃশ্য এবং ছিছিক্কারের অবতারণা হয় আরও এক দিন। সেদিনও দিদি সজল চোখে এসে দাঁড়ায় আমার কাছে। বলে— কেন করিস এসব? তোকে নিয়ে এত কথা আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু সেদিন আমি নীরব প্রতিবাদ করি, এমনকী দিদির বিরুদ্ধেও। ওদের চালাক অস্ত্র আমি বুঝতে পেরে যাই। আমার মতো মা দিদিকেও সকল মানতে শিখিয়েছে। ও মানন প্রক্রিয়ার সফল যন্ত্র। আমার মতো বিগড়োয়নি কখনও। ওকে নিয়ে কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু ওকে কাঁদিয়ে, বিরক্ত করে ওরা আমাকে চাপে রাখতে চায়। শিস প্রত্যাহার করে আমিই সেই অস্ত্র ওদের হাতে তুলে দিয়েছি।

এ বার সেই অস্ত্র প্রতিরোধ করি। পরোক্ষে মুক্তি দিই দিদিকেই। নইলে, প্রত্যেক বার ওরা এই পথই ধরবে। এবং আমি পরিষ্কার জারি রাখি এই ঘোষণা— তোমরা যা বলবে, তার সবটাই আমি মানব না। কোনও শর্তই গ্রহণ করি না আমি। কী অসভ্য, কী অশ্লীল, কী নোংরা— ইত্যাকার কোনও কটূক্তিকেই গ্রাহ্য না করে টান-টান শুয়ে থাকি।

বিয়ের পর, সেদিন আমি প্রথম সালোয়ার-কামিজ পরেছিলাম। তারপর বাড়িতে শাড়ি পরা ছেড়ে ধরেছিলাম হাউস কোট।

মাধবী অবশ্য হাল ছাড়েনি সহজে। বেশ কিছু কাল আমি সালোয়ার পরলেই ও রাগে দাপাদাপি করেছে। চিৎকৃত নিন্দাবাদ দিয়েছে আমার। বলেছে— বাবা-মায়ের শিক্ষা নেই! বুকে লজ্জা নেই!

আমি তবু পরেছি লজ্জাহীন সালোয়ার কামিজ। পরেছি সর্বাঙ্গ ঢেকে থাকা অশ্লীল পোশাক। উনিশশো বিরানব্বই সালের কলকাতার এক বসন্ত সন্ধ্যায়।

BanglaBook.org

এবং, ছ'মাসের মধ্যে, আমার জায়েরা দিঘা-পুরী বেড়াতে যাবার সময় লুকিয়ে আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে গেছে সালোয়ার। দিদি পর্যন্ত। এক বছরের মাথায়, ওরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে নিজের জন্য। তবে হ্যাঁ, শ্বশুরবাড়িতে পরবে না ওরা। বাইরে পরবে। বাপের বাড়িতেও।

প্রকাশ্যে সালোয়ার-কামিজ জারি রাখলেও শিসের বেলায় গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়েছিল আমাকে। পাখি ডাকলেই, শিস দিলেই, পাল্টা শিস গজগজিয়ে উঠত আমার ভেতরে। আমি ছাতে চলে যেতাম। পাখির ডাকের প্রত্যুত্তর জমে উঠত চমৎকার।

এখানে আমার অনেক গোপনের দায়। কিন্তু প্রাণ খুলে শিস দিতে পারি আমি। নাচতে পারি। ডিগবাজি খেতে পারি, মদ্যপান করে বমি করতে পারি ঘরময়। এখানে আমি প্যান্ট পরতে পারি, স্কার্ট পরতে পারি, শর্টস আর হাতকাটা টি-শার্ট পরলেও কারও কিছু বলার থাকে না। এখানে আসা-যাওয়ার কোনও কৈফিয়ত নেই, রাত্রিবাসের কোনও কৈফিয়ত নেই, পুরুষ-বন্ধু মেয়ে-বন্ধুর হিসেব-নিকেশ নেই। এখানে খোলা আকাশ। খোলা জানালা। খোলা রোদ্দুর। এখানে খোলা হাওয়া।

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে পালে শিসে বাজাই আমি। নিখুঁত পারি না। তবু বাজাই। বাজাতে ভাল লাগে। এই গান ভাল লাগে। ইদানীং শত-শতবার মনে মনে এই গান আমি গেয়েছি। গান যে কতখানি প্রেরণা হতে পারে, শক্তি হতে পারে, মর্মে বুঝেছি আমি। এ গান, হরতনীর মতো বলতে ইচ্ছে করে আমার, এ গান কোনও দিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই জন্যে! কেমন করে বাঁধলে?

আমার জীবনের পরতে পরতে লেগে আছে এই গান। সকাল আমার মিছে গিয়েছে। বিকেল চলেছে তারই পিছে পিছে। সত্যিই কি ঝড়ের গলা ধরে বেরিয়ে পড়িনি আমি? কাছি টুকরো করে ডোবার সম্মতিতেই কি নই আমি আজ এমন টান-টান?

একমাত্র প্রাণ বাজি ধরলেই সম্পূর্ণ বেপরোয়া ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

আমি জানি। আমি ভেবে রেখেছি। কিছুই যদি না হয়, বিকোব না নিজেকে। মরে যাব।

দশটা দোকান ঘুরে আমি কিনে রেখেছি দশ-দশকে একশোটা ডায়াজিপাম। এমনকী, প্রয়োজন হলে দ্রুত খেয়ে ফেলতে পারি যাতে, দ্বিধার সময় নিজেকে যাতে দিতে না হয়, তার জন্য ফয়েল থেকে খুলে কৌটোয় রেখেছি সব। ডায়াজিপাম, দ্য মিরাকল।

BanglaBook.org

সেটাই হবে আমার শেষতম পরাজয়!

আমি শিস দিই। কেয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে,

—বাঃ! ভাল শিস দাও তো।

আমি হাসি। ও ভাত নামিয়ে কড়া চাপায় হিটারে। প্রশ্ন করে— ক্যান্টিনে খাবে?

—হ্যাঁ।

আমি বলি। প্রশ্ন করি— তুমি খাও না?

—নাঃ। বড্ড খরচ।

—দিনে কোথায় খাও?

—অফিসের কাছে হোটেল আছে। বারো টাকায় মাছের ঝোল ভাত।

—কোথায় কাজ করো তুমি?

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। রিসেপশনে। তোমার মতো বড় চাকরি নয়।

আমি থমকে যাই। মিথ্যার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হই আমি। ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে আমার। নীল, কারও সঙ্গে আলাপ হলেই কোনও প্রসঙ্গ টেনে শুরু করত— আমি যখন বিদেশে ছিলাম ...

ব্যাপারটা ফাঁদত এমন, মনে হত দীর্ঘকাল ও বসবাস করেছে লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিসে। সেখানে কাজ করেছে। অথচ আমি জানি, ওর বিদেশযাত্রা মানে ওর মামার কল্যাণে এক মাসের জন্য ঘুরে আসা রিয়াধ। বিদেশি ব্যাঙ্কের কর্মী ওর মামা রিয়াধে পোস্টেড ছিল কিছুকাল। সেই সময়, বস্তুত দিদিমার এসকর্ট হয়ে ও রিয়াধ যায়।

বেশ কিছু দিন ওর এই প্রবণতা লক্ষ করে এক দিন আমি প্রতিবাদ করলাম— তুমি এ ভাবে বলো কেন?

—কী বলি?

—তুমি জানো কী বলো! তোমার কথা শুনে লোকের ভুল ধারণা হয় তোমার সম্পর্কে।

—হলে আমি কী করব?

—মিথ্যে ধারণা তুমি দেবে কেন?

ও চুপ করে যায়। তর্ক করে না। কিন্তু আমি টের পাই, এ ভাবেই শুরু করে ও। এ ভাবেই ফাঁদ পাতে ...

আমি জল খাই। প্রস্তুত করি নিজেকে। বুঝতে পারি ওর ছোট চাকরি সংক্রান্ত জটিল মনস্তত্ত্ব। আমি ওর চেয়ে ভাল জায়গায় আছি এরকম ভুল ধারণার মাঝে

BanglaBook.org

ঝাঁপ দিই। বলি— আমিও খুব বড় চাকরি করি না।

—তুমি তো জার্নালিস্ট।

—তোমার কোনও ধারণা নেই।

—কী?

—এমন জার্নালিস্টও আছে যারা এক পয়সাও রোজগার করে না।

—সত্যি?

—সত্যি। এমন জার্নালিস্ট আছে যারা রিসেপশনিস্টের চাকরি পেলে জার্নালিজম ছেড়ে দেবে। যেমন আমি।

ও হেসে ফেলে। আমিও হাসি। বারফট্টাই নেই বলে মেয়েটিকে ভাল লেগে যায় আমার। বয়সেও ও আমার চেয়ে ছোট। অন্তত পাঁচ বছরের ছোট। ও জিগ্যেস করে— কী কাগজে আছ তুমি?

—প্রভাতী সংবাদ।

—নাম শুনিনি তো।

—তা হলে আর তোমাকে কী বলছি? খুব অল্প সার্কুলেশন। খুব ছোট সংস্থা। সত্যি কথা বলতে কী, কাগজটা কত দিন চলবে, তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

—তাই?

—হ্যাঁ।

—তা হলে?

—সাপ্তাহিক চিরায়ততে সামান্য কাজ পেয়েছি। যদিও তাতে দিন চলবে না।

—সাপ্তাহিক চিরায়ত?

—হ্যাঁ। ওদের দৈনিক নয়। যে-কাগজ ঈশ্বরকে ছাড়া আর কারওকে ভয় করে না, সেটায় নয়। ওদেরই সাপ্তাহিক পত্রিকাটায়। এ ছাড়া চাকরি খুঁজছি। অন্য কোথাও পেলে ছেড়ে দেব।

—তুমি জার্নালিজম নিয়ে পড়েছ?

—না।

ও আর এ নিয়ে কথা বলে না। ওর কৌতূহল অন্য দিকে ছোটে। বলে— আগে অন্য হস্টেলে থাকতে?

আমার মধ্যে থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসে সঠিক ও যথার্থ জবাব— না। দিদির শ্বশুরবাড়িতে থাকতাম।

দীর্ঘকাল দিদির শ্বশুরবাড়িতে থাকাটা সমীচীন নয়, একথা ওকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না বলে আমি স্বস্তি পাই। তোমার এত কৌতূহল কেন? নিজের

BanglaBook.org

চরকায় তেল দাও। এসব বলে আমি ওকে থামিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু হস্টেলবাসের অভিজ্ঞতায় আমি জানি রুমমেটের সঙ্গে সদ্ভাব থাকা কতখানি জরুরি। তা ছাড়া, এসব প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে বারংবার। কেয়ার সঙ্গে বেশ একটা রিহার্সাল হয়ে যাচ্ছে। এক সময়ের একনিষ্ঠ নাট্যকর্মী হিসেবেও আমি এ-ও জানি, জীবনে রিহার্সাল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

—আমার সঙ্গে খাবে? আর একটু ভাত করব?

ও বলে।

—না। আজ থাক। ক্যান্টিনে বলা আছে।

আমি বলি।

—তুমি কি ক্যান্টিনেই রোজ খাবে?

—ভাবছি। যা খরচ! তা ছাড়া আমার অফিসের কাছে কোনও ক্যান্টিন নেই। হোটেলও নেই।

—নিজে রান্না করে খেলে সস্তা পড়ে।

—আমার তো হিটারও নেই। হাঁড়ি-কড়াও নেই।

—আমারটা ব্যবহার করতে পারো। অবশ্য হস্টেলে হিটার ব্যবহার নিষিদ্ধ। মাঝে-মাঝে সরকারি অফিসাররা ইনপেকশনে আসে। প্লাগে হিটার লাগানো দেখলে ঘরের লাইন কেটে দেয়। তখন ফাইন দিয়ে লাইন পেতে হয়। আমাদের অবশ্য লাইন ফিট করা আছে। ইনপেকশনের খবর থাকলে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তখন সব হিটার খাটের তলায়। এই ভয়ে সবাই ক্লিক্স কিনে নিচ্ছে। কেউ কেউ স্টোভে রান্না করে। আমার কিন্তু স্টোভে খুব ভয়।

—আমারও। তা ছাড়া খুব ঝামেলা। কেরোসিন আনো। ফিতে পরাও। কালি পরিষ্কার করো। ক্লিক্স কেনা যায় না?

ও আমার চোখে চোখ রাখে। বলে— বারোশো টাকা।

—বাপরে!

আর্থিক অনটন মাঝখানে রেখে আমরা দু'জনেই হাসি কিছুক্ষণ। এত সহজ স্বাভাবিক ভাবে আমি কত দিন পরে হাসছি? নতুন করে বিস্ময় জাগে আমার। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। এ কি আমি? সেই আমি? আমি সত্যি মাধবী-নীল-শিবানন্দর ঘেরাটোপে নেই? আজই আমি ছেড়ে এসেছি ওই জগৎ? আমার মনে হয় কত দিন আগেকার কথা! কোন বিগত জন্মের! দুটি অবস্থানের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আমার মন ভুলিয়ে দেয়।

ও বলে— একসঙ্গে খেলে খরচ কম হয়।

BanglaBook.org

আমি আঁকড়ে ধরি ওর কথা। বলি— খাবে একসঙ্গে?

—হ্যাঁ। ভাবছিলাম বললে যদি তুমি কিছু মনে করো!

—ধুস! আমার বরং ভাবতে সংকোচ হচ্ছিল। তোমার হিটার। তোমার হাঁড়ি-কড়া-খুন্তি!

—তাতে কী?

রাত বাড়ে। খিদে পায় আমার। এতক্ষণ কিছু খাওয়ার কথা মনে হয়নি। ও বাড়ির ভাত কখন হজম করে ফেলেছি। ও বাড়ির শেষ ভাত! শেষ ভাত? শেষ? হে ভগবান, তাই যেন হয়।

যদি না হয়? যদি না হয়?

চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী। একশোটা ডায়াজিপাম এনেছি আমি। অ্যান্ড, ডায়াজিপাম, দ্য মিরাকল!

কেয়া খেতে বসে। আমিও যাই ক্যান্টিনে। একতলায়। বিশাল ঝকঝকে ডাইনিং হলের বড় বড় খোলা জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। মেয়েরা খাচ্ছে। কথা বলছে। আমি এক কোণে বসি। কারও সঙ্গে আলাপ জমাতে আমার ইচ্ছে করে না। ঠাকুর আমাকে খাবার দিয়ে যায়। ডাল দিয়ে ভাত মাখি আমি। তরকারি দিয়ে খাই। বিস্বাদ ব্যঞ্জন গলা দিয়ে নামে না আমার। নিজের জন্য দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। কত যত্নে কত স্বাদু ব্যঞ্জন আমি রেঁধেছি সাতটি বছর এবং সমালোচিত হয়েছি। অন্যমনস্ক ভাত খেতে খেতে হঠাৎ সজাগ হই আমি। একটি কণ্ঠস্বর আমার চেনা লাগে। আমি উৎসুক তাকাই। সাত বছর পর কোনও কণ্ঠস্বরকে নির্ভুল কি চেনা যায়? মুখের পর মুখ পেরিয়ে যেতে যেতে অন্য টেবিলের এক ধারে আমি আবিষ্কার করি সৌমিত্রীকে। সৌমিত্রী আমার চেনা, কত কালের চেনা, আমার নাটকের দলের বন্ধু, কত স্মৃতি আমাদের, যৌথ কাজের কত আশ্চর্য যাপন। আমার মধ্যে আবেগ ছলকায়। আমি ওকে ডাকতে যাই— সৌমিত্রী!

ডাকি না। থেমে যাই আমি। সৌমিত্রীর বাড়ি ছিল কলকাতাতেই। তা হলে ও হস্টেলে কেন?

আমিও তো নীলকে বিয়ে করে গৃহী হয়েছিলাম। আমি তা হলে হস্টেলে কেন?

সৌমিত্রীকে ডাকব কি ডাকব না স্থির করতে না পেরে আমি মাথা নিচু করে খাওয়া সারি কোনও মতে। আমি চাই না সৌমিত্রী আমাকে দেখে ফেলুক। ঠাকুর চাটনি পরিবেশন করতে এলে, বস্তুটি প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, আমি না বলে দিই।

BanglaBook.org

উঠে, বেসিনে হাত ধুয়ে, দ্রুত বেরিয়ে পড়ি ওখান থেকে। দ্রুত উঠি সিঁড়ি দিয়ে যেন আমাকে কেউ তাড়া করেছে। নানান প্রশ্ন ঘোরে আমার মাথায়। নানান দ্বিধা। আমি কি আদৌ সৌমিত্রীর কাছে ধরা দেব? যে কোনও দিনই তো আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে! সৌমিত্রীর সঙ্গে আমাদের দলেরই অনিন্দ্যর সম্পর্ক ছিল। স্কুল থেকে প্রেম করত ওরা। তা হলে কি ওদের বিয়ে হয়নি? সৌমিত্রীকে সত্যি বলব, না মিথ্যে বলব আমি? কী মিথ্যে বলব? কেন বলব? ও তো জানে নীলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা। যদিও আমার নাটকের বন্ধুদের আমি বিয়েতে নিমন্ত্রণ করিনি ...!

আমি আমার বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখি। সোডিয়াম ভেপারের আলোয় পরিষ্কার চওড়া রাস্তা দিয়ে হুস-হাস করে গাড়ি যায়। বাতাসে বেলফুলের গন্ধ ভেসে আসে। কেয়া এসে আমার বিছানায় বসে। বলে— খেলে?

আমি মাথা নাড়ি। হাসি অল্প। ও বলে— কেমন?

—খুব খারাপ।

—ওই তো। টাকা নেবে একগাদা। খাওয়াবে জঘন্য।

—কাল থেকে তোমার সঙ্গেই খাব। এসো, প্রথমে আড়াইশো করে দিয়ে একটা ফান্ড করি।

—চলো।

—তুমি হোটেলে খাওয়া ছেড়ে দাও। দিনের পর দিন হোটেলে খেলে পেটের বারোটা বেজে যাবে।

— বেজে গেছে। গ্যাস অম্বল বুকজ্বলা...

ও স্বর বিকৃত করে হকারদের নকল করে। আমরা হেসে উঠি। কিন্তু বিষয়টা ভাবায় আমাকে। এর আগে যখন আমি হস্টেলে ছিলাম, স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুমাত্র ভাবিনি। যা পেয়েছি, খেয়েছি। এখন এইসব গ্যাস-অম্বলের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা আমার মনে হয়। যা-ই খাই, ঘরের খাবার খাওয়াই ভাল— এই শুদ্ধতাবাদের পক্ষে সওয়াল করে বলি— তাই তো বলছি। হোটেলে আর খেয়ো না। ছেড়ে দাও।

—দিয়ে?

—সকালে আমরা ভাত খেয়ে বেরোই। দুপুরে কিছু টিফিন করে নিলেই হবে।

—কিন্তু আমি যে সকালে উঠতে পারি না। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজেই অফিসে চলে যাই।

BanglaBook.org

—রাতের রান্নাটা তুমি কোরো। সকালের দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি। চা থেকে শুরু করে ভাত পর্যন্ত।

—পারবে সকালে এত?

আমি হাসি শুধু। বলি না, এত কাল এই ছিল আমার কাজ। এ ভাবেই আমি শুধে এসেছি খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের সুকঠিন ঋণ। রান্না, ঘর গুছনো। রান্না, কাপড় কাচা। রান্না, বাসন মাজা। রান্না, সমালোচনা। রান্না। রান্না।

দু'জনের সামান্য ভাত-তরকারি আমার কাছে কী! ওকে বলি— তুমি খেয়ে যাবার সময় পাবে তো?

—হ্যাঁ। তৈরি খাবার পেলে খাব না? তবে আমার চায়ের নেশা নেই।

—আমি তোমায় নেশা ধরিয়েই ছাড়ব।

—কেন?

—বাঃ! না হলে আমাদের আধাআধি হিসেব হবে কী করে?

হাসতে থাকি আমরা। লক্ষ করি, ওর শরীর একটু বেশি রোমশ। মুখেও রোমের প্রাধান্য। তবু ওকে মিষ্টি লাগে। ও জিগ্যেস করে— বাড়ি কোথায় তোমার?

আমি বলি ওকে উজানিনগরের নাম। ও বলে— মা-বাবা আছেন?

—আছেন। তোমার বাড়ি কোথায়?

—আসানসোল।

ওর মা-বাবা আছেন কিনা জিগ্যেস করতে পারি না আমি। ওর ওই প্রশ্নের মধ্যেই, আমি আশঙ্কা করি, আছে দুঃখময় জবাব। ও নিজেই বলে— মা আর ভাই থাকে ওখানে। বাবা হঠাৎ চলে গেলেন। বাবার কোম্পানিতেই চাকরিটা পেলাম। ইংলিশ অনার্স নিয়েছিলাম। পার্ট টু আর দেওয়া হল না।

ওর হাই ওঠে। ও একবার ধীর পায়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। খোলামেলা পোশাক ওর গায়ে। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ায় বড় বড় চুল। ওখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে— প্রেম করো?

আমি চমকে উঠি। প্রেম! কী বলছে ও? প্রেম? কী বলব ভেবে পাই না। আমাকে নীরব দেখে ও বলে— করো। না? বয়ফ্রেন্ড আছে?

আমি সচকিত হই এবার। বলি— আমার বয়ফ্রেন্ড শব্দটায় আপত্তি আছে।

—কেন?

ও ঘরে আসে। আমার বিছানার কাছে দাঁড়ায়। আমি বলি— হয় বন্ধু, নয় বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু। বন্ধুর কোনও বয় গার্ল হয় না কেয়া। এটা একটা ভুল শব্দবন্ধ। বয়ফ্রেন্ড! গার্লফ্রেন্ড!

BanglaBook.org

ও বলে— বাব্বা! এত কে ভাবে? আসল কথা হল তুমি প্রেম করো কি না।

— না।

— আমিও করি না। কিন্তু করতে চাই। মাঝে-মাঝে মনে হয়, খুব পয়সাওলা কোনও প্রেমিক থাকলে ভাল হত।

— কেন?

— টাকার এত টানাটানি— ভাল লাগে না। বয়ফ্রেন্ডের ঘাড় ভাঙা যেত।

— এটা কি কোনও সমাধান?

— কেন নয়?

— বেশ। সন্ধানে থাকো। পেলে লেগে পড়ো।

— পেলে তো!

কেয়া লম্বা হাই তোলে। এ নিয়ে কথা বাড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। আমি দাঁত ব্রাশ করতে বাথরুমে যাই। ফিরে-ফিরে সৌমিত্রীকে মনে পড়ে আমার। কেয়া আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। আমিও শুই। কেয়া বলে— জানো, পুরো এক বছর ধরে এ রুমে আমি একা।

আমি অবাক হই। বলি— সে কী! হস্টেল এত ফাঁকা থাকে নাকি?

—থাকেই তো! এ রুমে ছিল একজন। সে নামেই। থাকত না।

—ও।

—তুমি আসছ শুনে ভাবনায় পড়েছিলাম। কেমন-না-কেমন হবে। যদি ও ঘরের মতো হয়!

—ও ঘর মানে?

—উল্টো দিকের ঘর। ওখানে একজন আছে। দেখো না। কত বয়স্ক। কিন্তু স্কার্ট পরে। র‍্যান্ডাম সিগারেট খায়।

আমি অন্ধকারে বিষণ্ণ হাসি। সৌমিত্রীও সিগারেট খেত খুব। এখনও কি খায়? সৌমিত্রীর কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে আমার।

কেয়া বলে চলে— ওর সঙ্গে আমি এক দিনও কথা বলিনি।

সংস্কার। তার গোপন সংক্রমণ থেকে কারও রেহাই নেই। কিছু কম-বেশি এই যা। কোথাও শিস, কোথাও সালোয়ার কামিজ, কোথাও বড়লোক প্রেমিক সমাধান, কোথাও একজন বয়স্ক মহিলার স্কার্ট এবং সিগারেট। অথচ এগুলোর কোনওটারই কোনও মানে নেই। প্রয়োজন নেই।

আমার নীরবতার ফাঁকে কেয়া ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসে না। হাজার কথা মাথায় ভিড় করে আসে। পুরনো কথা। বর্তমান। ভবিষ্যৎ। দিদি। মা। বাবা।

BanglaBook.org

কিন্তু নীলের জন্য কষ্ট হয় না আমার। পুরনো জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থাকা ছাড়া ওর কোনও ভূমিকা নেই আর আমার কাছে। বার বার নিজেই নিজের পরীক্ষা নিই আমি এবং সফল হওয়ার সন্তোষ পাই। আমি ভাবি! নির্ঘুম চোখের ওপর সোডিয়াম ভেপারের হলুদ আলো পড়ে। একলা চলার প্রথম রাত্রি আমার। বাবা বলেছিল ফিরে যেতে। আমি যাইনি। বলেছি— এক বছর নিজেকে চালাতে দাও। না পারলে চলে যাব।

যাব কি? না পারলে? না যাব না। কারও মুখাপেক্ষী হয়ে কোনও দুয়ারে আর দাঁড়াব না এ জীবনে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কিন্তু বাবাকে তা বলা যায় না। বলা যায় না যে আমি আত্মবিক্রয় করব না এই সংকল্পে, বেঁচে থাকার যুদ্ধে যদি হেরে যাই, বাবা, তার সমাধান একশোটা ডায়াজিপাম।

দিব্যদা বলেছে— তিন মাস তোমাকে দু'হাজার টাকা করে দেব আমি। এর মধ্যে তোমাকে কিছু খুঁজে নিতে হবে।

আমি রাজি হয়েছি। কী খুঁজে নেব, কোথায় পাব, আমি জানি না। শুধু জানি, পেতে হবে, যে-কোনও কাজ, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে যা করা যায়।

দিব্যদা মিষ্টিকাকার ছাত্র। সেই সূত্রে আমার চেনা। রাজনগর দৈনিকের সাংবাদিক ও। সংবাদ জগতে প্রতিষ্ঠিত নাম। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় ছদ্মনামে দার্জিলিঙে ছিল ও। অনেক ঝুঁকি নিয়েছিল। ওর তখনকার প্রতিবেদন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রভাতী সংবাদে ও অতিরিক্ত সময়টুকু দেয়। যদিও সাংবাদিকের কোনও বাড়তি সময় থাকে না। সাংঘাতিক পরিশ্রমী ও। বরাবর। পরপর সাত দিন ও না ঘুমিয়ে একটানা কাজ করতে পারে। ওরই জন্য সাপ্তাহিক চিরায়তয় আমার যোগাযোগ হয়েছে। বিভিন্ন নাটক, গানের অনুষ্ঠান, চিত্রকলা প্রদর্শনী— সংস্কৃতি জগতের যে-কোনও কিছুই ঘুরে দেখে এসে ওই পত্রিকায় সমালোচনা করতে হবে আমাকে। মাসে যদি তিনটে সপ্তাহেও একটি করে ছাপা হয়, তা হলে আমি বাড়তি সাড়ে চারশো টাকা পাব।

চিরায়তর কাজ শুরু হবে এ সপ্তাহেই। প্রভাতী সংবাদের কাজ শুরু হবে কাল। দিব্যদাকে আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনি না। ওপর-ওপর জানি মাত্র। ও আমাকে তিন মাসের বেশি মাইনে দিতে পারবে না, তবু আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। ও না হলে আমার এই হস্টেল হত না। বেরোনো হত না। চিরায়তর কাজটা হত না। শুধু তিন হাজার টাকাই নয়, ওর কাছে আমার একজন্ম ঋণ। তবু ও যদি আমাকে প্রভাতী সংবাদে আরও তিন মাস রেখে দেয়, আমি থাকতে চাই না। চাই না কারণ

BanglaBook.org

দিব্যদাকে আমি ভয় পাই। মেয়েদের জড়িয়ে দিব্যদার ভীষণ বদনাম। তার সবটাই বানানো নয়, আমি জানি।

সমস্ত অনিশ্চয়তা বুকে নিয়ে একা জেগে থাকি আমি। ঘুম আসে না। ঘুমোতে ইচ্ছেও করে না আমার। আমি উঠে পড়ি। ব্যালকনিতে দাঁড়াই। কারও ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে মিষ্টি ঘণ্টা বাজে। রাত দুটো। ডান হাতে জীবন, বাঁ হাতে মৃত্যু নিয়েও আমার কীরকম আনন্দ হয়। মুক্তির আনন্দ। ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ফেরত পাঠাই আমি, কেন না আলোতে আনলেও যাকে অন্ধকার দেখায়, তাকে নেড়ে-চেড়ে লাভ কী! আমি মুহূর্তে বাঁচি। অনুভব করি আমার প্রথম স্বাধীন রাত। স্বাধীনতা নিরবচ্ছিন্ন সুখ নয়। স্বাধীনতা অনিশ্চয়তা। স্বাধীনতা বিষাদ। স্বাধীনতা একাকীত্ব। তবু স্বাধীনতা আনন্দ, কারণ স্বাধীনতা আত্মসম্মান।

আমি জানি, মানুষের চূড়ান্ত স্বাধীনতা বলে কিছু হয় না। এই-ই মানুষের সংগ্রাম। সে সারাজীবন শুধু স্বাধীনতা ক্রয় করে বা অর্জন করে এবং ব্যয় করে। ব্যয়। ব্যয়ের মধ্যেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরিণতি!

আমি দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। সেতারের সুরেলা বাদন আমার শ্রবণে ধরা দেয়। এমন মধ্যরাতে কে বাজায়? নাকি রেকর্ডে শোনে? সৌমিত্রী কোন ঘরে, কোন ফ্লোরে থাকে আমি জানি না। আমি সেতারের শব্দ সন্ধান করি। আমার মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকে যে শব্দের উৎসে আমি ওকেই খুঁজে পাব।

এই মুহূর্তে, আমার এই মানসিক অবস্থায়, সেতারের সুরের ধ্বনিমন্থন বিশেষ অর্থ দেয় আমার জাগরণকে। আমি খুঁজি। খুঁজতে থাকি। আমাদেরই ফ্লোরের অন্য প্রান্তে, সিঙ্গল রুমের দিকে হেঁটে যাই। একটি মাত্র খোলা দরজা দিয়ে সুরের সঙ্গে সঙ্গে আলোও এসে অন্ধকার প্যাসেজে লুটোপুটি খায়। আমি খোলা দরজায় দাঁড়াই নিঃশব্দে।

টেপ চলছে। বিছানায় পা গুটিয়ে বসে কী কাজ করছে ও। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল ওর মুখে এসে পড়েছে। চশমার কাচে ওর চোখ ঢাকা কারণ অল্পত টিউবের আলো বিম্বিত। আমি আস্তে ডাকি— সৌমিত্রী!

ও শুনতে পায় না। আবার ডাকি— সৌমিত্রী!

ও চমকে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত অপলক দেখে আমাকে। তারপর লাফিয়ে নামে খাট থেকে। ছুটে আসে। 'দেবারতি, দেবারতি' ঘরঘরে গলায় বলতে থাকে ও।

—তুই এখানে কেন? কেন? কী করে!

ও শক্ত করে চেপে ধরে আমার হাত। এত শক্ত করে যে আমার কব্জিতে ওর নখ বসে যায়।

BanglaBook.org

দেবারতি, সৌমিত্রী, দেবারতি

—আমি জানি না কী ভাবে কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা!

সেতারের ক্যাসেট থেমে গেছে। বিছানার এক পাশে গুছিয়ে রাখা ওর কলেজের পরীক্ষার খাতা। অ্যাশ ট্রে-তে অন্যমনস্ক ছাই ফেলছে ও। ফুরিয়ে আসতে থাকা রাত খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ছে ঘরে। অল্প অল্প চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। আমি ভাবছি, উঠে গিয়ে আমার বিছানার পাশের জানালাগুলো বন্ধ করে আসব কিনা। ভাবিই শুধু। যাই না। বরং সৌমিত্রীর কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি চুপচাপ। সম্পর্ক ফুরিয়ে গিয়েছিল। সম্পর্ক ফুরোয়। সম্পর্ক ভাঙে। সম্পর্ক শেষ হয়। সম্পর্ক নামের এই নিরবয়ব বস্তুকে আমি একটি আকৃতি দিতে চাই। কিন্তু পারি না। যা গড়ে ওঠে, ভাঙে, ফুরোয়— তাকে দৃষ্টিগোচর করা যায় না কিছুতেই। ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পর্কই কী সহজে, কী অনায়াসে গড়ে ওঠে! কিন্তু আমি এবং সৌমিত্রী দু'জনেই জানি এখন, কিংবা আমি জেনে গেছি, টের পেয়ে গেছি সেই আঠারো বছর বয়সেই, যে সম্পর্ক ভেঙে ফেলা, ছিঁড়ে নেওয়া, উপড়ে নেওয়া নিজের মধ্যে কত বেশি কঠিন, কত ব্যথাদীর্ণ, কী তীব্র যন্ত্রণার!

সিগারেটের শেষাংশ ও একটানে ফুরিয়ে ফেলে। দগ্ধ তামাক মুহূর্তে আগুনের দলা হয়ে ছাই বনে যায়। ও ফিল্টারটা পিষে ফেলে অ্যাশট্রেয়। অসহনীয় সম্পর্কের মতোই— টানতে টানতে, টানতে টানতে, শেষের দিকে দগ্ধে পিষে না ফেললে তা যেন আর ফুরোয় না।

ও একটা নতুন সিগারেট নেয় ঠোঁটে। লাইটার জ্বালে। লাইটারের আগুনে ওর মুখ তাম্রাভ দেখায়। আমি তাকিয়ে থাকি ওর ভ্রূ-র দিকে, কুঁচকে থাকা, তাকাই ওর ঠোঁটের দিকে, কাঁপতে থাকা— মনে হয় আমার ও উদ্বেজিত!

ও বলে— ওদের বাড়িতে কেউ আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি, ওর মা কখনও আমার ওপর সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমি কখনও ও বাড়ির একজন বলে নিজেকে ভাবতেও পারিনি। কত আগে থেকেই তো সবাইকে চিনতাম। তবু পারিনি।

আমি কি পেরেছিলাম? না। পারার চেষ্টাও করিনি। ওর আর আমার বাহ্যিক

BanglaBook.org

ঘটনাবলি সম্পূর্ণ আলাদা। তবু, ওর প্রত্যেকটি অনুভূতিকে আমি চিনতে পারি, ছুঁতে পারি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ও বলে যায়। আমি শুনি।

—ওদের দোতলায় গেলেই আমার দম আটকে আসত। মনে হত ভুল করে এসে পড়েছি। আমি পালিয়ে যেতাম একতলায়। আমার নিজের ঘরে। সেটাই আমার জগৎ ছিল।

আমি নামি। জল খাই। বসি ফের। ও বলে চলে।

—সারাদিন সব ঠিকঠাক। রাত্রি হলেই আমার উদ্বেগ শুরু হত। ভয় করত। ও আসবে। চাইবে। আমি দিতে পারব না। আমার ইচ্ছে করবে না। ও রেগে উঠবে। শক্ত করে আমার কব্জি ধরবে। ঝাঁকাবে আমাকে। জিগ্যেস করবে, কেন? কেন? কেন? আমি কী বলব? ওর কাছে এলে, আমার স্রেফ ইচ্ছে করে না। বিয়ের এক বছর না যেতেই।

নৈঃশব্দ্য। মাথার ওপর ফ্যানের বাতাস কেটে ঘুরে চলার শব্দও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনিন্দ্যর মুখ আমার মনে পড়ে। আমি কারও পক্ষপাতী না হওয়ারই চেষ্টা করি। কারণ সৌমিত্রী যতখানি, অনিন্দ্যও ততখানি বন্ধু ছিল আমার। কিন্তু নিজের সঙ্গে যুঝতে হয় আমাকে। চিরকাল, লিঙ্গসচেতনতা অস্বীকার করতে চাওয়া আমি, সৌমিত্রীর প্রতি অধিকতর সহানুভূতি টের পাই নিজের ভেতর। অনিন্দ্যরও সৌমিত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকতে পারে— এই নিরপেক্ষ যুক্তিবোধ আমার মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। সৌমিত্রীর জন্য বেদনা নিয়ে আমি শুনতে থাকি।

—একদিন মাঝরাতে ও মা-র কাছে চলে গেল। গিয়ে বলল— মা, সৌমিত্রী কিছু করছে না। দিনের পর দিন। আমার তো একটা সহ্যের সীমা আছে মা। আমি তো একটা মানুষ।

আমি জিগ্যেস করি— এই কথাগুলো তুই জানলি কী করে?

—ওর মা-ই বলেছেন। পরদিন ডেকে। 'কী ব্যাপার তোদের, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কেন এরকম করছিস!' আমি কিছু বলিনি। কী বলব! বিয়ের এক বছরের মাথায় যদি বলি, আমাদের সম্পর্কটা মরে গেছে, কে শুনবে?

ঠিক। আমি বুঝতে পারি ওকে। পুরোপুরি। ওর সঙ্গে ঐকমত্যে কোনও দ্বিধা হয় না আমার। একজন পুরুষ ও নারী, বিয়ের আগে তাদের সম্পর্ক যেমনই থাকুক, ঘনিষ্ঠ বা তিক্ত, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রকৃত সুসম্পর্কের সূচনা হয়— সমাজ এমনই ভাবে। ভাবতে শেখায়। এ হল বিবাহপূর্ব সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চাওয়ার প্রবণতা। সংস্কার। কেন না আজও বাবা-মায়ের পছন্দ

BanglaBook.org

করা পাত্র বা পাত্রীর হাত ধরে নতুন প্রজন্ম জীবন শুরু করে। আজও সেটাই সবচেয়ে শালীন পরিণয়। তারই জন্য, সৌমিত্রী-অনিন্দ্যর মতো সম্পর্ক, বিয়ের আগে যারা ঘনিষ্ঠ মিশেছে অন্তত আট বছর, তাদের বিয়ের এক বছরের মধ্যে সম্পর্কের সব রস শুকিয়ে এলে, তা লাগে বিস্ময়কর, অর্থহীন, প্রায় অসামাজিক কর্মের মতো গর্হিত। তারই জন্য, আমি নীলের সঙ্গে এক মৃত সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যাই সাত বছর। তারই জন্য ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিয়ে দিয়ে দেয় আদালত। বিয়ে হলেই সব অপরাধের অবসান। নারী-পুরুষের মধ্যেকার সকল অপমান বিয়ে হলেই সম্মানিত!

ও বলে— তর্ক করতে করতে, ঝগড়া করতে করতে, দিনের পর দিন কেবল তর্ক করতে করতে, ঝগড়া করতে করতে, একদিন হঠাৎ বুঝলাম, আসলে ওর সঙ্গে আমার কোথাও মেলে না। ওর সঙ্গে আমার কমন ইন্টারেস্টের কোনও জায়গা নেই। আমরা কবে, কখন, নিজের নিজের জায়গায়, নিজের নিজের জগৎ গড়ে নিয়েছি বিচ্ছিন্ন ভাবে, বুঝতেই পারিনি। ওরই জন্য আমি নাটকের দলে যেতাম। নাটক সম্পর্কে আমার আলাদা কোনও আগ্রহ, কোনও টান ছিল না। প্রথম দিকে আমি তা-ও বুঝতে পারিনি। তুই চলে যাবার এক বছরের মাথায় আমিও নিয়মিত দলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।

অনিন্দ্যর একটা কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওকে আমি বলি তা— অনিন্দ্য বলত, তর্ক করবি, ঝগড়া করবি, তা হলে সম্পর্কে কোনও অস্বচ্ছতা থাকে না। আমি আর নীল, যে-কোনও মতবিরোধ এড়িয়ে যেতাম দেখে ও বলেছিল এ কথা।

—হ্যাঁ। একসময় আমারও তা-ই মনে হত। তর্ক হচ্ছে, ঝগড়া হচ্ছে নানা বিষয় নিয়ে মানে আমরা পরস্পরের কাছে দারুণ ট্রান্সপারেন্ট। আমাদের মধ্যে লুকোবার কিছু নেই। এড়াবার কিছু নেই। আসলে এটা ভুল। আসলে আমাদের কোথাও কোনও মিল ছিল না। স্বচ্ছতা-স্বচ্ছতা করে আমরা এই কথাটা উপলব্ধিকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

ও সিগারেট শেষ করে। এ নিয়ে ক'টা হল? গুনে দেখিনি। আমার মনে হয়, আসলে তর্ক করা বা না-করা, কোনওটাই ব্যক্তিগত সম্পর্কের শর্ত নয়। তা হলে কী শর্ত? কী? আমি জানি না। মানুষের চিত্ত স্বাধীন, সমাজ সেই স্বাধীন চিত্ততায় নানারকম বাঁধন দেয়। তবু, কোথাও-না-কোথাও কোনও-না-কোনও পরিমাণে মানুষের চিত্ত স্বাধীন, ইচ্ছা স্বৈরাচারী, চিন্তাপ্রক্রিয়া জটিলতম। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাকরণ গড়ে ওঠে না কখনও।

BanglaBook.org

ও বলে— আমি ভাবতাম, ভালবাসার জন্য কোনও আধার দরকার নেই। কোনও লক্ষণ দরকার নেই। কিন্তু ভুল ভাবতাম। এখন বুঝি, ভালবাসার জন্য দরকার ভাবনা ও রুচির অন্তত সত্তর শতাংশ মিল।

—বাকি অমিলের ত্রিশ শতাংশের জন্য দরকার অন্তত শ্রদ্ধাবোধ। সম্মান।

—হ্যাঁ। তোর একটা কিছু আমার ভাল লাগে, তোর চোখ, তোর হাসি, তোর হয়তো আমার গজদাঁতটা ভাল লাগে, তুই ছবি আঁকিস, সেটাও আমার ভাল লাগে, আমি গান গাই, সেটাও তোর ভাল লাগে, তার ওপরে হয়তো একটা সম্পর্ক, একটা ভালবাসা তৈরিও হয়— তখন সেই ভালবাসাটাকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য দরকার কিছু অন্য উত্তর। আমরা দু'জনেই কি আর্ট ব্যাপারটাকে ভালবাসি? গান ভালবাসি? পরস্পরকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যৌথভাবে ভালবাসার কিছু ক্ষেত্র দরকার।

আমার বাবা-মা-র কথা মনে হয়। যৌথভাবে ভালবাসার কিছু ছিল ওদের? আমার আর নীলের কী ছিল? তবু তো আমরা চার ভাইবোন জন্মালাম! জন্মালাম তো! তবু তো আমি ...

আমার হাসি পায়। পেটের ভিতর থেকে গুলগুল করে বেরিয়ে আসে সব। আমি হাসতে থাকি প্রকাশ্যেই। হাসির দমকে আমার শরীর কাঁপে। ঘরের থমকে থাকা গাম্ভীর্য আমার হাসির দাপটে টাল খায়। সৌমিত্রীও হাসে। সংক্রমণে। জিগ্যেস করে— হাসছিস কেন?

আমি বলি— ওই জন্যই তো, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মিল না হলে, স্বামী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন থাকলে, বা ধর উল্টোটাই, ওঃ ওঃ ওঃ ...

আবার হাসির দমকে আমি অস্থির হয়ে উঠি। ওরও হাসি বিস্তারিত হয়। ও বলে— বল, বল, উদাসীন হলে? উদাসীন হলে?

—একটা বাচ্চা আনো ... একটা বাচ্চা হোক ... সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর কমন ইন্টারেস্ট থিয়োরি, সৌমিত্রী, হা হা হা, হো হো হো ... তোর কমন ইন্টারেস্ট!

—হা হা হা! হো হো হো!

সৌমিত্রীও হাসে। হাসতে হাসতে আমরা কাত হয়ে যাই। দু'হাতে পেট চেপে ধরি। হাসি পায় আমাদের। জটিল বিষয়ের তরল সমাধানে হাসি পায়। ও হাসতে হাসতে নামে। বাথরুমে যায়। বেরিয়ে বলে— কফি খাবি?

—খাব।

BanglaBook.org

আমিও নামি। বাথরুমে যাবার জন্য দাঁড়াই। ও আলো জ্বালে। ক্লিক্ জ্বেলে কফির জল চাপায়। আমি বলি— সেই আদালতের গল্পটা জানিস?

—কোনটা?

—এক দম্পতি ডিভোর্সের আর্জি নিয়ে এসেছে। বিচারক মোটামুটি সমস্ত জট ছাড়িয়ে ফেলেছেন। কে কী পাবে, কে কী ছাড়বে। এখন সমস্যা একটাই, ওদের তিনটে বাচ্চা। কে দুটো নেবে, কে একটা! কিছুতেই সমাধান হয় না। শেষ পর্যন্ত তুলকালাম ঝগড়ার পর স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে একটান মেরে বলল— 'চলো! চলো এখুনি।' বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলল—'মহামান্য বিচারপতি! আগামী বছর আমরা চারটে বাচ্চা নিয়ে আসব!'

হাসতে হাসতে আমি বাথরুমে ঢুকে যাই। কমোডে বসতে গিয়ে আমার বাম হাঁটুতে খচ করে লাগে। মাথা ঝনঝন করে আমার। এক মুহূর্ত। আবার সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ব্যথার তীব্রতা আমাকে বিস্মিত করে। মাঝে মাঝে আমার কোমরে তীব্র যন্ত্রণা হয়। পেন কিলার খাই তখন। এ তার মতো নয়।

বেরিয়ে আসি আমি। বসি। ও দু'কাপ কফি একটি ছোট ট্রে-তে নিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। সামান্য বিদ্যুৎ চমকেছিল, কিন্তু বৃষ্টি আসেনি। বরং আকাশে নীলচে রং ধরেছে। দু'একটা পাখির ঘুম জড়ানো স্বর। এখানে অনেক গাছপালা। তাই অনেক পাখি। তাদের মধ্যে একজন আদর মাখানো শিস দেয়। আমি তাকে নকল করি। সৌমিত্রী বলে— তুই পারিস এখনও?

প্রত্যুত্তরে শিস দিই আরও কয়েক বার। ও কফির কাপ তুলে নেয়। আমিও নিই। চুমুক দিই। ও শুরু করে— একবার আমরা সাত-আটজন লাভা-লোলেগাঁও গেলাম। এত দিন ধরে একসঙ্গে আছি, যেখানে যত বন্ধু, সবাই আমাদের দু'জনের। আলাদা বন্ধু তো নেই কোথাও!

—অনিন্দ্যও গেল?

—না! ও গেল না। ওর কীসব কাজ আছে বলল। আমরা গেলাম! দারুণ জায়গাটা। তুই গেছিস নিশ্চয়ই। তোদের বাড়ির ওদিকেই তো!

—আমি যাইনি কখনও। গোরুমারা, চাপরামাচি, কালিঝোরা, হলং, জলদাপাড়া, জয়ন্তী, বাক্সাদুয়ার— এসব গেছি। কিন্তু লাভা, লোলেগাঁও যাইনি।

—যাস একবার। অসম্ভব সুন্দর। আমরা তো ফিরতেই ইচ্ছে করছিল না। এত সবুজ আর এত পাখি— ভাবছিলাম, ওখানেই যদি একটা স্কুলে চাকরি পাওয়া যেত, থেকে যেতাম। রিষভ বলে একটা জায়গা আছে ওখানে। সেটাও অসাধারণ জায়গা। বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। চারপাশে ঘন বন। পাহাড়। পাখির ডাক ছাড়া আর

BanglaBook.org

কোনও শব্দও নেই। আমাদের মধ্যেই কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে মনে হচ্ছিল, কানে লাগছে। শেষ রাতটা ওখানেই থাকার কথা ছিল আমাদের। দুপুরের দিকে হাঁটতে বেরোলাম। গেস্ট হাউজে শুনেছিলাম, সামসিংটং বলে একটা জায়গা আছে। একটা গ্রাম। একটা আশ্রম আছে ওখানে। পাহাড়ি বস্তিগুলোতে কাজ করে ওরা। যতখানি সম্ভব চিকিৎসা করে। ওষুধপত্র দেয়। বাচ্চাদের পাঠশালা করেছে। শুনে বেশ আগ্রহ হল। দেখতে গেলাম। দারুণ লেগে গেল আমার জায়গাটা। ঘন বনের মধ্যে একটা ছোট গ্রাম। পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট বাড়ি। আশ্রমটাও ছোট। যোগী লাল মহারাজ নামে একজন এই আশ্রম গড়েছিলেন, তাঁর শিষ্যের সংখ্যা অল্প। কিন্তু তাদের টাকাতেই এই আশ্রম চলে। বছরে দু'বার মিলনোৎসব হয়। মনে হল, আমি যেন ক্যানভাসে আঁকা একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এত শান্তি সেখানে, এত মমত্ব, আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, পৃথিবীতে এরকম কোনও জায়গা থাকতে পারে! ক'দিন থেকে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করল। বন্ধুদের বললাম। ওরা নানারকম আওয়াজ দিল। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করলাম। এক-এক করে। কেউ রাজি নয়। ভাবছি, একাই থেকে যাব কিনা! তখন, অরুণাংশু বলল, ও থাকবে।

কফি শেষ হয়ে গেছে। ও একটা ফ্লাস্ক থেকে ঢালল আরও এক কাপ করে। আমি নিঃশব্দে চুমুক দিলাম। ও বলল— অরুণাংশুকে চিনতাম আমি। ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমাদেরই বন্ধু সুমিতের সঙ্গে ও মাঝে মাঝে আসত। এ বারেও সুমিতের সঙ্গেই ও এসেছে। খুব ঘনিষ্ঠ নয় বলে আমি আর আলাদা করে ওকে বলিনি। কিন্তু ও থাকবে বলাতে আমার ভালই লাগল। আশ্রমে খোঁজ নিলাম। ওদের অতিথি নিবাস আছে। থাকার কোনও অসুবিধে নেই। তবে খাবার নিরামিষ। আর মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমাদের তাতে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক হল, পরদিন সকালে ওরা ফিরে যাবে, আমি আর অরুণাংশু আশ্রমে চলে যাব। সামসিংটং থেকে ফেরার পথে লক্ষ করলাম, সবাই কেমন চুপচাপ। এত দিনের হুল্লোড়ে আমেজের ওপর বিমর্ষরেখা টানা। রাতটাও ওরকমই গেল। ক্যাম্পফায়ার করে হুইস্কি নিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু আগুন বেশিক্ষণ জ্বলল না। সবারই কেমন তাড়া। রাত্রি ফুরোলে বাঁচি ভাব। শুতে যাবার আগে বারান্দায় এসে বসলাম। আরও ক'জন ছিল। অরুণাংশুও ছিল। আমার ভাবতে ভাল লাগছিল যে কাল আর ফিরছি না। আশ্রমটা অসম্ভব টানছিল। মনে মনে অরুণাংশুর ওপর কৃতজ্ঞও বোধ করছিলাম। আমি তো থাকতামই। ও না থাকলে একাই। ভাবছি এসব, ঠিক তখন সুমিত বলল— দ্যাখ সৌমিত্রী, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

BanglaBook.org

আমি বললাম— কী বল তো?

ও বলল— এই যে, তুই আর অরুণাংশু আশ্রমে থেকে যাচ্ছিস।

—তোদেরও তো থাকতে বললাম। থাকছিস না তো আমি কী করব?

—আমাদের কাজ আছে।

—তোদের কাজ আছে বলে আমি আমার ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারব না?

—ন্যাকা সাজিস না সৌমিত্রী! আমি কী বলতে চাইছি তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস।

—না। বুঝতে পারছি না। তোদের কাজ আছে, তোরা থাকবি না। আমার কাজ নেই, আমি থাকব। এর মধ্যে বোঝা না-বোঝা, ন্যাকামির কী আছে!

—আফটার অল তুই একজনের স্ত্রী, সৌমিত্রী, তোর হাজব্যান্ড তোর সঙ্গে নেই। এ অবস্থায় তুই একা অরুণাংশুর সঙ্গে থেকে যেতে পারিস না। অনিন্দ্যকে গিয়ে আমরা কী বলব, বলতে পারিস?

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। অদ্ভুত লাগছিল ভাবতে যে এরা আমার কত কালের বন্ধু! কত বিষয় নিয়ে কত দিন আমরা তর্ক করেছি। কিন্তু এ কোন মানসিকতার পরিচয় ওরা দিচ্ছে? সুমিতের কথায় প্রতিবাদ করছে না কেউ। আমি সোজা হয়ে বসলাম। বললাম— দাঁড়া, দাঁড়া! জট পাকিয়ে ফেলিস না। আফটার অল আমি একজনের স্ত্রী তা আমি মনে করি না। আমি আফটার অল সৌমিত্রী মুখার্জি, নিজের দায়িত্ব আমি নিতে শিখেছি। আরও কতগুলো সামাজিক পরিচয়ের মতো আমি অনিন্দ্যর স্ত্রী। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার এবং ক্ষমতা আছে, তার জন্য অনিন্দ্যর আমার সঙ্গে থাকা বা না-থাকার কোনও মূল্য নেই। অনিন্দ্য যেমন এক কাপ কফি খাবে কিনা, বা হুইস্কি খাবে কিনা দু'পেগ কিংবা হয়গ্রীব চরিত্রটা তোকে না দিয়ে পার্থকে দেবে কিনা— এই সব সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা করে না এবং করার দরকারও আছে বলে আমি মনে করি না, সেরকমই, আমি আশ্রমে ক'দিন কাটাব, তার জন্য আমি কারও স্ত্রী কিনা, আমার বর আমার সঙ্গে আছে কিনা এসব প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না।

সুমিত হাল ছাড়ে না। বলে— তাই বলে একা অরুণাংশুর সঙ্গে...

আমি বলি— আগে ঠিক কর আমি একা না কি অরুণাংশু আছে?

—সেটাই তো? অরুণাংশু...

—যদি আমার একা থাকাটা সমস্যা হয় তা হলে তো মিটেই গেল। অরুণাংশু আছে। আর যদি অরুণাংশুর সঙ্গে যাওয়াটা সমস্যা হয়, তা হলে বলি, শুধু

BanglaBook.org

অরুণাংশু কেন, আশ্রমিক পুরুষের সংখ্যা দশের কম নয়। তাদের সঙ্গেও আমি রাত্রিবাস করতে চলেছি। আর গোটা গ্রাম ধরলে তো মোট দু'শো পুরুষের সঙ্গে থাকতে চলেছি আমি! সত্যিই কী ভয়ঙ্কর, না রে সুমিত!

ও আর কথা বলেনি কিছুক্ষণ। ভাবলাম থেমেছে বুঝি। না। শেষ মরিয়া চেষ্টার মতো ও বলল— অরুণ আমার বন্ধু, অনিন্দ্য আমাকেই বলবে যা বলার।

আমি হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। বললাম— এই দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। আমি তাহলে অরুণাংশুর হাতে ইলোপড হতে চলেছি।

তখন অরুণাংশু বলল— তুই আমার দায়িত্বটাও নিজের কাঁধে নিচ্ছিস নাকি সুমিত! নিস না!

খুব সুন্দর কেটেছিল আশ্রমে। সাত দিন ছিলাম আমরা। ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনেছিল ও। কখনও ছবি আঁকত। আমি পাশে থাকতাম। কখনও ঘুরতাম গ্রামে। দু'জনে অথবা একা। সন্ধের পর, আলো ছিল না তো, আশ্রম থেকে একটা হ্যারিকেন দিয়ে যেত। সেটা ঘরের কোণে রেখে আমরা কথা বলতাম। কথা বলতে বলতে, কথা বলতে বলতে, মনে হল, ও আমার কত কালের চেনা। যেন অনিন্দ্যকে চেনার আগেই আমি অরুণাংশুকে চিনেছিলাম। যেন আমাদের দেখা হওয়ার কথাই ছিল এখানে। যেন এই উপলব্ধি অপেক্ষা করছিল যে আমাদের ভাবনা, আমাদের চাওয়া, আমাদের বোধ মিলে যায়, খুব মিলে যায়। এতগুলো বছরে অনিন্দ্যর সঙ্গে যা হয়নি, তা হল ওর সঙ্গেই। আমি কী বলতে চাই, ও বুঝে নিল সহজেই। ও কী বলতে চায়, আমিও সহজে বুঝতে পারলাম। এই ক'দিন, আমরা পরস্পরের কাছে কোনও প্রত্যাশার কথা বলিনি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকেও দেখাইনি ওই লণ্ঠনের আলোয় নেড়েচেড়ে। চুমু খাইনি। স্পর্শ করিনি। তবু, একজন বন্ধু পাবার ভাল লাগা, আনন্দ, মনে কানায় কানায় হয়েছিল যখন কলকাতায় ফিরলাম। কিন্তু ফিরে দেখলাম, অদ্ভুত পরিবেশ। কেউ আমার সঙ্গে কোনও কথা বলছে না। গত বছর যখন আমার মা মারা যায়, তখন শ্রাদ্ধ করতে চাইনি বলে ঠিক এরকম পরিবেশ হয়েছিল। আমি সেই চাপটা নিয়েছিলাম। মা শ্রাদ্ধ-শান্তি বিশ্বাস করত না। আমিও করি না। ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আমাদের দু'জনের। আমাদের বিশ্বাসের। আমাদের সম্পর্কের। তবু এটা নিয়ে আমার চেনাজানা প্রত্যেকের সমস্যার অন্ত ছিল না। আমি তাদের প্রতিহত করেছিলাম। এবারও, আমি প্রস্তুত হলাম মনে মনে। রাত্রে অনিন্দ্য আমার মুখোমুখি হল। সরাসরি বলল— ব্যাপারটা কত দিনের?

আমি বললাম— কোন ব্যাপারটা?

BanglaBook.org

—এই তোর আর অরুণাংশুর?

—ব্যাপার বলতে তুই কী বোঝাচ্ছিস?

—তুই জানিস আমি কী বোঝাচ্ছি। যে ব্যাপার হলে সাত দিন একসঙ্গে কাটানো যায়!

—অনিন্দ্য, আমরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। যে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। তুই নিশ্চয়ই মনে করছিস না যে আমি লুকিয়ে প্রেম করছি। আশ্রমে অরুণাংশু না থেকে যে-কেউ থাকতে পারত। এমন কেউ থাকতে পারত যাকে আমি আগে থেকে চিনি না।

—কী হলে কী হতে পারত সেটা কোনও কথা নয়। তুই ছ'জনকে সাক্ষী রেখে ওর সঙ্গে থেকেছিস। তুই ওর সঙ্গে শুয়েছিস কিনা আমি জানতে চাই না। কিন্তু লোক দেখিয়ে ইউ স্পেন্ট সেভেন বিউটিফুল নাইটস উইথ দ্য গাই। সৌমিত্রী, বন্ধুরা এটা নিয়ে গসিপ করছে। সারা শহর জানে এই ব্যাপার!

—জানে তো? আমি তো কোনও গোপন কম্মো করতে যাইনি। একটা জায়গা আমার ভাল লেগেছে। আমি থেকে গেছি। অরুণাংশুর ভাল লেগেছে, ও-ও থেকে গেছে। ব্যাস! এর মধ্যে এত জটিলতার কী আছে!

—কী আছে বোঝার মতো বুদ্ধি যদি তোর ঘটে থাকত তাহলে তুই ঢাক পিটিয়ে এসব করতিস না।

—ঢাক পিটিয়ে? অনিন্দ্য, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যদি সাক্ষী না রেখে চুপিচুপি গিয়ে আশ্রমে থাকতাম, উইথ এনি ড্যাম পার্সন, তাহলে তোর কোনও আপত্তি ছিল না?

—আপত্তি হত কিনা জানি না, তবে তোর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত।

—আমি বুঝতে পারছি না অনিন্দ্য, রাতের পর রাত জেগে আমি তোদের সঙ্গে নাটকের সেট করেছি। রিহার্সাল দিয়েছি সারা রাত। পনেরো কুড়িটা ছেলের সঙ্গে আমি একা।

—না। একা নয়। তখন দেবারতি থাকত। শান্তাদি থাকত।

—শান্তাদি কোনও দিন রাত জাগত না।

—জাগত।

—না। জাগত না। শান্তাদি ক'দিন দলে এসেছে বল তো?

—দেবারতি থাকত।

—হ্যাঁ। থাকত দেবারতি। কিন্তু চুলে করে দ্যাখ, এমন অনেক রাত গেছে যখন আমি নেই, দেবারতি একা মেয়ে বা দেবারতি নেই, আমি একা। তখন তো কোনও

BanglaBook.org

কথা হয়নি। নাকি তখনও তোরা আমাকে আর দেবারতিকে নিয়ে আড়ালে গসিপ করতিস?

—তুই ভুলে যাস না সৌমিত্রী, তুই বিবাহিত এখন, তুই এ বাড়ির বউ, তোর বেচাল আমাদের পরিবারকে অসম্মানিত করে।

—ও। শেষ পর্যন্ত তা হলে এই! তোর প্রগতিশীলতা শেষ পর্যন্ত বাড়ির বউতে এসে ঠেকল! কিন্তু ব্যাপারটা যে একই অনিন্দ্য। আমি যদি বলি, তুই আমাদের বাড়ির জামাই, তুই বারে গিয়ে মদ খেলে আমাদের পরিবারের মানহানি হয়, তাহলে মানবি তো?

—কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা করছিস তুই? সমাজ বলে একটা ব্যাপার আছে। তোর কোন স্বাধীনতায় আমরা হাত দিচ্ছি! কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। এ বাড়িতে থেকে কোনও বেলেল্লাপনা করা চলবে না তা বলে দিলাম।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। ওদের চোখে যা বেলেল্লাপনা, সে রকম কোনও কাজ ভবিষ্যতে আর করব না, এই প্রতিজ্ঞা করি কী করে?

সকালেই স্যুটকেস গুছিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মা চলে যাবার পর বাড়িতে শুধু বাবা আর ভাই। গিয়ে বুঝলাম, ওদের কাছেও অভিযোগ পৌঁছেছে। ভাই কোনও কথা বলল না। বাবা বলল— আমার মুখে চুনকালি দিয়েছ। এ বাড়িতে তোমার জায়গা নেই। সাত দিন সময় দিলাম। তারপর তুমি চলে যাবে।

এই সাত দিন বলতে গেলে কলকাতা চষে বেরিয়েছি আমি, একটু থাকার জায়গার জন্য। উল্টোডাঙায় একটা পেয়িং গেস্ট হিসেবে জায়গা পেলাম। তারপর এখানে। স্বনির্ভরায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্বনির্ভরা

একটু থাকার জায়গার জন্য যে সৌমিত্রী কলকাতা চষে বেরিয়েছে, এ নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমিও বেরিয়েছি। তিন মাস। ও সাত দিনে যা পেয়েছে, আমার তা পেতে লেগেছে তিন মাস। এপ্রিল, মে, জুন— এই তিন মাস, ভয়ঙ্কর গরমে, আমি দমদম গিয়েছি, বেলঘরিয়া গিয়েছি, শ্যামবাজার, বাগবাজার, উল্টোডাঙা, কলেজ স্ট্রিট— এমনকী পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত।

বেপরোয়া ঘুরেছি আমি। হাতে টাকা নেই, তাই হেঁটে হেঁটে যতটা সম্ভব! এ শহরের অধিকাংশ বেসরকারি লেডিজ হস্টেল অত্যন্ত বিশ্রী। নোংরা। এক-একটি ঘরের মধ্যে গাঁতিয়ে ঢোকানো থাকে ছোট ছোট বিছানা। যেমন বিছানায় বাহিত হয় সস্তার শব। সরু। চাপা। কোনও মতে ধরে যায় একখানি নিথর দেহ।

ঘুরতে ঘুরতে, দেখতে দেখতে আমি টের পাই, এ জগৎ, একলা মেয়েদের শব-ই মনে করে সম্ভবত। মর্গের মতো এক-একটি রুমে শুধু দেহের জটলা। দড়িতে টাঙানো আধুনিক ও বহুমূল্য পোশাক। সেই পোশাক হাতে নিয়ে, ডাভ সাবান হাতে নিয়ে, বাথরুমে যাবার অসাধ্য সাধনা ভোর থেকে শুরু হয়। তিরিশ জনের জন্য একটাই বাথরুম। অতএব প্রায় মধ্যরাত থেকে শুরু হয় দখলদারি। সাত মিনিটের মধ্যে সারতে হবে প্রাতঃকৃত্যাদিসহ স্নান। এমনকী, মেয়েদের দীর্ঘ ঘন মেঘের মতো চুল, তাতে শ্যাম্পু করতে হলেও সময়ের বরাদ্দ বাড়ে না। সামান্য সময় বেশি লাগলেই দরজায় ব্যস্ত বিরক্ত কড়া নড়ে ওঠে— তাড়াতাড়ি! আর কতক্ষণ!

এবং দেরি করায় অভিযুক্ত মেয়েটি, বেরুলেই, লাইনের বাকিরা তাকায় আগুন-ঝরা চোখে। রাগী, বাঁকা মন্তব্যে তাকে নখরাঘাত করে। ছিন্নভিন্ন করে দেয়। উত্ত্যক্ত অবস্থায়, বিদ্ধ হতে হতে সে তখন প্রসাধন সারে। সে-ও বুঝি বা দেয় দু'চার তিক্ত উত্তর এবং তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। সে এক হাতে ঠেকায় আঘাত, অন্য হাতে ভ্রূ আঁকে, চোখ আঁকে। দু'ঠোঁট জড়ো করে বিবাদের বাক্য গঠন করে এবং পরক্ষণেই দেয় লিপস্টিকের গাঢ় প্রলেপ।

এ ভাবেই চলে। এ ভাবেই চলেছে। সকালের ঝগড়া সন্ধ্যায় ফুরিয়ে যায়।

BanglaBook.org

সন্ধ্যায় উৎপত্তি হয় নতুন ঝগড়ার। কেউ আলো নিবিয়ে দিতে চায় কারণ তার মাথা ধরেছে, কারও তখুনি আলো দরকার কারণ সে বিছানার তলা থেকে স্যুটকেস বার করে ছড়িয়ে বসেছে।

কোথায় গলাগলি, কোথাও সমালোচনা, কারও বুক দুটো উন্মত্ত বৃহৎ কেন— তা নিয়ে গভীর প্রাজ্ঞ মতামত, কারও প্যাডেড ব্রেসিয়ার হয়ে ওঠে আলোচনার মূল জায়গা। কাকে প্রায়ই গাড়ি করে পৌঁছে দেয় অফিসের বস— তার কোনও মূল্যবান পোশাক মাত্রই বসের দান, এ বিষয়ে মতামত নিশ্চিত হয়। প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা এখানে এবং প্রচণ্ড স্বার্থান্বেষ। সমগ্র বিশ্বজগৎ নিজেকেই দর্শন করে এখানে এক সংক্ষিপ্ত রূপে। প্রসঙ্গ হতে প্রসঙ্গান্তরে যেতে যেতে রাত গড়িয়ে নামে। দুই থেকে তিন ঘণ্টার পরম শান্তি আসে ঘরগুলোয়। ঝগড়া-বিবাদ নেই, কলহ-সমালোচনা নেই, স্বার্থ সংঘাত নিয়ে নতুন প্রত্যুষ আসার আগে ঘুম নেমে আসে তিরিশ জোড়া চোখের পাতায়। যে বিয়ে হওয়ার আগেই বুড়িয়ে গেছে, ঘুম তার চোখে এঁকে দেয় যুবতী বয়সের স্বপ্ন, প্রেমিক যাকে ছেড়ে গিয়েছে, সে স্বপ্নে পায় এক নতুন প্রেমিক, গোপন রোগ আছে যার, শ্বেতী, মৃগী, এপিলেপসি— সে দেখে স্বপ্নে এক সুস্থ নীরোগ দেহ। তাদের ঘুমন্ত মুখগুলি দেখার জন্য কেউ জাগে না শিয়রে। জাগত যদি, দেখতে পেত, কী পবিত্রতা ওই মুখগুলিতে, কী তৃপ্তি, কী আনন্দ! এইটুকুই তাদের জীবন। শবদেহেরই মতো পড়ে থাকা— তবু মৃত্যু নয়, জীবন!

আমি ঘুরে ঘুরে দেখি এই বসবাস। আমার মনে পড়ে যায় ভারতীয় মহিলা সংসদ আবাসের কথা। কালীঘাট ফায়ার স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকের এই হস্টেলটায় আমি প্রায় আড়াই বছর ছিলাম। কলেজ হস্টেল থেকে বেরিয়ে নীলের সঙ্গে বিয়ের আগে পর্যন্ত। আমার সেই দিশাহীন সময়ে ওই হস্টেলের অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেষি বসবাস আমাকে আলাদা করে পীড়ন করেনি। কী এক ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে সময় তখন! সেই ক্লাস টুয়েলভে পড়ার কালে শতদ্রুর যে ঘোর আমাকে দিয়েছিল, তা ছিল অসুস্থতা এক প্রকার, তারই মধ্যে, তখনও আমি প্রতিদিন মরছিলাম।

কপাল জোরে ওই হস্টেলের ডর্মিটরিতে থাকতে হয়নি আমায়। তিনতলায় একটি চার বেডের রুম পেয়েছিলাম। ঠাসাঠাসির বিচারে তারও কোনও ঔদার্য ছিল না। কিন্তু একটা সুবিধা ছিল, আমাদের ঘরের সংলগ্ন ছিল একফালি জায়গা। সেই জায়গা পেরোলে একটি ছোট্ট ঘর। এতই ছোট যে একফালি খাট রাখার পরেই ঘরের সমস্ত জায়গা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণাদি থাকত ওই ঘরে। সি এ

BanglaBook.org

পড়ত। আমার সঙ্গে যখন ওর পরিচয় হয়, তখন ওর পরীক্ষার সপ্তম বছর। তার আগে ছ'বার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফাইনাল পরীক্ষায় ও অকৃতকার্য হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থনায় পৌঁছেছিল। ছ'বছর আগে ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল আমার। তারপর ও দিল্লি চলে যায়। আর যারা দিল্লি চলে যায়, তাদের সঙ্গে, যারা কলকাতায় থেকে যায়, তাদের আর কোনও যোগাযোগ থাকে না।

কৃষ্ণাদিকে যাতায়াত করতে হত আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়েই। ওর আর আমাদের ঘরের মধ্যবর্তী একফালি জায়গাটি আমরা বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করতাম। একটি কল ছিল ওখানে। দিনে দু'বার জল আসত। আমরা বালতিতে জল ধরে রাখতাম।

স্নানের ব্যাপারটা ওই একফালি বাথরুমেই সমাধা করতাম বলে আমাদের সমস্যা খানিকটা কম ছিল। যদিও প্রাতঃকৃত্য করতে হত সকলের বরাদ্দ বাথরুমেই। কুড়িজনের জন্য একটি মাত্র পায়খানা। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক ছিল না। প্রায়ই মলে উপচে থাকত পায়খানার প্যান। জলের প্রাচুর্য ছিল না বলে কেউ-ই পর্যাপ্ত জল ঢালতে পারত না। মল উপচানোর স্টেটাও অন্যতম কারণ হয়ে থাকবে।

এ রকম হলেই আমরা হস্টেলের সুপার অসীমাদির কাছে যেতাম। অসীমাদি গম্ভীর মুখে বলত— দেখি! কী করা যায়! সদল নামে একটি ওড়িয়া ছেলে ছিল আমাদের মুশকিল আসান। কিন্তু দুটি ফ্লোর মিলিয়ে পঞ্চাশ জনের এবং একান্নতম অসীমাদির ফাইফরমাশ খেটে ও যখন সমাধান নিয়ে পৌঁছত, তখন হয়তো দুপুর গড়িয়ে গেছে!

কিন্তু প্রাকৃতিক কর্ম, প্রাণীমাত্রই জানে, এমনই তার বহির্গমন প্রবণতা— চাপিলে চুপিলে মানে না, তদুপরি মেয়েমানুষ সব, কোথায় এ সব সমাধা করে! হতে পারে এমন জায়গায় কেউ চাকরি করে যেখানে ল্যাট্রিন— বাথরুম নেই!

অতএব, আমরা, অসম্ভব ঔদাসীন্যে, ঘৃণা-ভয় ত্যাগী সন্ন্যাসীরই মতো উদ্গত মলে ভরা ল্যাট্রিনে বসি। মাথা উঁচু করে রাখি যাতে মলে চোখ না পড়ে। কিন্তু অবাধ্য চোখ তবু নেমে আসে। মল হতে উঠে আসা সাদা কীট, যদি গায়ে-পায়ে ওঠে! অল্প অল্প জল খরচ করে তাদের ঠেলে মলে পাঠাই। ফের তাকাই ওপরে। আবার চোখ নামাতেই দেখি চারখানা ধেড়ে পুষ্ট ইঁদুর। ইঁদুর না ছুঁচো আমি তফাত করতে পারি না। কিন্তু তারা আমাকে মনুষ্য প্রজাতির কিনা আদৌ ভেবে সন্দেহ

BanglaBook.org

করে বসে। কারণ একটা হৃষ্টপুষ্ট, পুরনো বাড়ির গর্তে থাকা ইঁদুরও জানে, মানুষ এ রকম ভাবে বাঁচে না।

তারা আমার দিকে কড়া চোখে তাকায়। ছিক্ শব্দ করে মুখে। এক প্যান ভর্তি মলের ওপর, কীটের ওপর, ঝুলন্ত বসে থেকে, চারখানা ধাড়ি ইঁদুরের মোকাবিলা করতে গিয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে যাই।

হস্টেল খুঁজতে খুঁজতে, দেখতে দেখতে ওই নরকে ফিরতে ইচ্ছে করে না আমার। এক নরক থেকে পরিত্রাণ পেতে অন্য নরকে যেতে ইচ্ছে করে না। আমার এক হাতে জীবন, অন্য হাতে মৃত্যু। তবু, নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারি না আমি যে জীবনের জন্য কী তীব্র আর্তি আমার! কত চাই আমি তাকে! তাকে না পেলেই আমি মৃত্যু জড়িয়ে ঘুমোব চিরদিনের ঘুম।

অতএব, আমি হস্টেল দেখি, আর হতাশ হয়ে উঠি ক্রমশ।

নীলের সঙ্গে বিয়ের সময় যখন হস্টেল ছাড়লাম, বলেছিলাম— আর কখনও হস্টেলে থাকব না।

হাঃ! সেই আমি, গলির পর গলি, ঘাটের পর ঘাট খুঁজে চলেছি হস্টেল। সাত বছরে হস্টেলগুলি আরও ঘিঞ্জি হয়েছে। আরও নারকীয়। কিন্তু জায়গার মূল্য বেড়ে গেছে অনেক।

এক-একটি নিথর শয্যা এখন মাসান্তে বড় কিমতি পড়ে। দু-একটি অভিজাত হস্টেলের সন্ধানও পাই, কিংবা খবরের কাগজ দেখে ফোনে যোগাযোগ করি পেয়িং গেস্টের জন্য— তাদের চড়া মূল্য আমাকে প্রতিহত করে। মাসে আড়াই হাজার শুধু থাকার জন্য ব্যয় করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

অতএব আমি হন্যে হয়ে ফিরি, হতাশ হই এবং মরিয়াও হই। জুলাই মাসের মধ্যে এ বাড়ি আমাকে ছাড়তেই হবে। যেভাবেই হোক। নিজের জন্য এর বেশি সময় আমি ধার্য করি না কিছুতেই। মনে হয়, আমি কি তবে গভর্নেস হয়ে যাব? দিল্লিতে চায়, বম্বেতে চায়, ব্যাঙ্গালোরে, হায়দ্রাবাদে— পিছুটানহীন মহিলা— রান্না ও সংসারের কাজ জানা— এরা আমাকে শংসাপত্র দেবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার সাত বছরের অভিজ্ঞতা!

আমি কল্পনা করি নিজেকে। কেয়ারটেকার। গভর্নেস। কিংবা হাউজকিপার। এখানেই বা আমার তার বেশি মর্যাদা কোথায়?

আমি কাগজ-কলম নিয়ে আবেদন করতে বসি। কিন্তু আমার হাত অসাড় হয়ে যায়। আমার সামনে কর্কশ চোখের দৃষ্টি সমেত এসে দাঁড়ায় চারটি হৃষ্ট-পুষ্ট ইঁদুর। এই ঝুলন্ত অবস্থায় ওদের কী ভাবে সামলাব ভেবে আমি গলদঘর্ম হয়ে যাই!

BanglaBook.org

ওদের মাংসলোভ আমি টের পাই। মুহূর্তে, সমস্ত জগৎ আমার মাংসলোভী প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। আমি আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকি বিছানায়। ভাবি, কতখানি ঝুঁকি নিতে পারি আমি, কতখানি?

কখনও কখনও অসুস্থ লাগে আমার। যদি কোথাও থাকার জায়গা না পাই? ক্ষণে ক্ষণে আমার ফ্লু হয়। শীত করে। জন্ডিস হয় আমার। মুখ-চোখ হলুদ হয়ে যায়। হাত-পা হলুদ হয়ে যায়। যকৃৎ কঁকিয়ে ওঠে বেদনায়। আমার গা বমি-বমি করে। একটি ভদ্রগোছের বাসস্থান লাভের অনিশ্চয়তায় একাকী থাকলেই ম্যালেরিয়া হয়। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। এতসব অসুখ-বিসুখ আমি একাই সামলাই। নিজেই নিজের চিকিৎসা করি। নিজেই নিজের। মা বলেছিল— অসুখ হলে কে দেখবে তোকে? শরীরের ভাল-মন্দ...

হায়! আমি বলতে পারিনি মাকে। বলিনি কিছুই। মা, মাগো, কত জ্বরের রাত্রি আমি একাই পেরিয়েছি! টাইফয়েডের চূড়ান্ত উত্তাপ! নীল এল। দেখল। কপালে হাত রাখল না একবার। দিদি আমার মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল। আর আমার, মা, বিশ্বাস করো, ইচ্ছে হচ্ছিল খুব— নীলের হাত আমার কপালে নেমে আসুক। ও, খুব উদাসীন, চলে যাচ্ছে আড্ডা দিতে। শিবানন্দ বলছে— কোথায় যাচ্ছিস? ডাক্তার ডেকে আন।

— ওই তো, বউদি আছে।

নীল চলে গেল। শিবানন্দ নিজেই গেল ডাক্তার ডাকতে। আমার দু'চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ল টুপটাপ। বালিশের ঢাকনায়। চারদিন হল এমন জ্বর। মাধবীর মেজাজ খুব খারাপ। আজ ডাক্তার। আজ ওষুধ। চারদিন পর। চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ার কথা আমি মাকে বলিনি। কিন্তু সেই থেকে, অসুখ-বিসুখ করলে সারিয়ে তুলি নিজেই নিজেকে। ভয় নেই। এসবে ভয় নেই আমার। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক থাকার একটা জায়গা আমি কোথায় পাব? কীভাবে পাব? কম খরচে ভদ্র রাত্রিবাস কোথায়?

পথ পাই না। তিন মাসের মধ্যে থেকে খসে পড়ে এক-একটি দিন। আমি অতঃপর বুড্ডির কাছে যাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বুড্ডি

এ বাড়ি থেকে একটা অটোতে বা রিকশায় উঠলেই বুড্ডির বাড়ি যাওয়া যায়। খুব কাছে।

বুড্ডি আমার কলেজের বন্ধু। তখনই ওর একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল আমাদের কাছে, কারণ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তপোময়ের সঙ্গে প্রেম করত। আমরা অসীম কৌতূহলে ওকে জিগ্যেস করতাম— তুই ওদের বাড়ি যাস?

ও মিটিমিটি হাসত আর বলত— হ্যাঁ।

—ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিস?

—হ্যাঁ।

—উনি কেমন?

—চমৎকার মানুষ। আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন।

আমরা ওর দিকে তাকাই বিস্ময়ে। বুড্ডি কোন সুদূর নক্ষত্রলোকে গিয়ে সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছুঁয়ে আসে। ওকে সুখী দেখায়। ওর ভবিষ্য জীবনের উপচানো সুখ আমরা প্রত্যক্ষ করি। টের পাই, ও শুধু তপোময়কেই ভালবাসে না, ও সঞ্জীবনের ছেলেকেও ভালবাসে। এমনকী বিয়েও ও তপোময়কেই শুধু করবে না। তার সঙ্গে সঞ্জীবনের খ্যাতি এবং খ্যাতিমানের নিকটাত্মীয় হওয়ার গৌরবকেও করবে।

আমরা ঈর্ষা করি না ওকে। বরং অবান্তর প্রশ্ন করি। ও তার আশ্চর্যতর উত্তর দেয়।

আমরা বলি— উনি কখন লেখেন? দিনে, না রাতে?

ও বলে— কেউ জানে না। ওঁর লেখার ব্যাপারটা ঈশ্বরপ্রদত্ত।

—সত্যি?

—সত্যি। সারাক্ষণ পড়েন উনি। কী গভীর জ্ঞান! এই পড়ার মধ্যে লেখা হয়ে ওঠে কখন, কেউ জানে না। কেউ বোঝে না।

—তা ঠিক। আমরা বুঝব না ওসব।

BanglaBook.org

বাস্তবিক, লেখকমাত্রই পরম জ্ঞানী, আদর্শবান এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ— এই সবই আমি তখন বিশ্বাস করেছিলাম। কখন তাঁরা লিখে ফেলেন তাঁদের উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা— কেউ জানতে পারে না। যেমন মিষ্টিকাকা, সে-ও লেখে কবিতা, প্রবন্ধ। আমাদের ওই অঞ্চলে মিষ্টিকাকাকে চেনে না এমন লোক অল্প। আমরা মিষ্টিকাকার বাড়িতে থেকে যাই দিনের পর দিন। কখনও খবরের কাগজের মাথায়, কখনও চিঠির খামে, কখনও হৃদের বইয়ের মলাটে সে লিখে রাখে কবিতার এক-একটি লাইন। ঠিকই, আমাদের তা চোখে পড়েই যায়। কিন্তু কখন সেই একটুকরো ভাষ্য সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠে আর ভরিয়ে তোলে ডায়রির পাতা— টের পাই না। সুতরাং অলক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটা আস্ত উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এবং এতদ্‌সত্ত্বেও কলেজ শেষ হয়ে যাবার পর, অন্যান্য বন্ধুদের মতো বুড্ডির সঙ্গেও আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

না। অন্যান্য বন্ধুদের মতো বলা চলে না। নীলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরও বছরখানেক দিব্যেন্দুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল।

সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নীলদের বাড়ির আশেপাশেই কোথাও থাকেন জানা সত্ত্বেও আমার কখনও যাবার আগ্রহ হয়নি। আর তপোময়ের সঙ্গে বুড্ডির বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা, তা-ও আমি জানতাম না।

একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা। ছেলেকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিল ও। কলেজ স্ট্রিট যাব বলে বাসের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। ও পাল্টে গেছে। মোটা হয়েছে। ওর সমস্ত অস্তিত্বে একটা মসৃণ সুখী ভাব। দেখামাত্র, ছেলের হাত ছেড়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

—তুই এখানে কোথায়?

এই বলে আমরা শুরু করলাম। এ দিকে ছেলের স্কুলের বেলা বয়ে যায়। ও বলে—চল ওকে দিয়ে আসি।

—চল।

আমি ওর সঙ্গে ছেলের স্কুলে যাই। ছেলে চোখের আড়াল হতেই ও আমার হাত চেপে ধরে। বলে—কোথায় যাচ্ছিলি?

—কলেজ স্ট্রিট।

বলি আমি।

ও বলে—কোনও জরুরি কাজ আছে?

আমার কাঁধব্যাগে প্রুফের তাড়া। একটি ছোট প্রকাশনা সংস্থা আমাকে এই

BanglaBook.org

প্রুফ দেয়। আমি ওদের প্রুফ দেখি। বইয়ের বিষয়সূচি বানাই। এই সব কাজ আমি শুরু করেছি বছর দেড়েক হল। কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু করছি। কী ভাবে যে কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়! মিষ্টিকাকার একটি প্রবন্ধ সংকলন করবে ওরা। আমি তার পাণ্ডুলিপি পৌঁছতে গিয়েছিলাম। তখন ওরাই আমাকে প্রুফ দেখতে বলে। কারণ আমাদের ওই সুদূর উজানিনগরে প্রুফ যাবে, মিষ্টিকাকা দেখে ফেরত পাঠাবে, সে অনেক দিনের ব্যাপার। মিষ্টিকাকার সঙ্গেও কথা হয় এ বিষয়ে। সে বলে—ঠিক আছে। সব রেডি করে যেন ফাইনালটা আমাকে পাঠানো নয়।

অতএব আমি শুরু করি। মিষ্টিকাকার বই দিয়েই প্রুফ রিডিং এবং ইনডেক্স তৈরির হাতেখড়ি হয় আমার। অভিধানের পেছনে দেওয়া ছিল প্রুফ দেখার পদ্ধতি। তা-ই অনুসরণ করি আমি। অভিধানের মতো এক অসামান্য জ্ঞানী সত্তা আমাকে শিখিয়ে দেয় বিবিধ চিহ্ন। যদিও, ডি টি পি-র যুগে, অনেক চিহ্নই আর প্রয়োজন হয় না। তবু, আমি মনে রাখি সব। প্রুফ দেখার বিদ্যা অর্জন করি। কাজটা আমার কীরকম ভাল লাগতে থাকে। অভিধান তার আশীর্বাদ আমার ওপর ছড়িয়ে দেয় বলেই কিনা জানি না, আমি টের পাই, প্রুফ দেখা এক মগ্ন পাঠ-ও বটে, যার মধ্যে দিয়ে অন্য জগতে চলে যাওয়া যায়। ভুলে থাকা যায় কিছুক্ষণ—যত অনিশ্চয়তা, যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনার দীর্ণ ইতিহাস। এবং প্রুফ দেখা একটি আয়ের পথও বটে।

আমি প্রকাশকের কাছে আবেদন করি। সে মিষ্টিকাকাকে জানে। মিষ্টিকাকার কোনও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রকাশক সেই সূত্রে বিচার করে আমাকেও। সে বলে—এসব কি তোমাদের কাজ মা?

আমি বলি—কেন? এই যে বইটা করলাম।

—সে একটা। দিনের পর দিন প্রুফ দেখতে ভাল লাগবে কেন?

—লাগবে।

—বেশ। ফার্স্ট প্রুফ প্রতি পাতা এক টাকা, সেকেন্ড প্রুফ প্রতি পাতা পঞ্চাশ পয়সা। থার্ড প্রুফ সাধারণত লাগে না। যদি লাগে তবে প্রতি পাতা পঁচিশ পয়সা। রাজি?

আমি হিসেব কষি তখন। একটা দু'শো পাতার বইয়ের প্রুফ দেখলে আমি পাব তিনশো টাকা। সঙ্গে বাড়তি লাভ—প্রচুর বই আমি পড়তে পারব। প্রকাশকের কথায় সম্মত হই আমি। বলি—রাজি।

সেই শুরু। সেই প্রুফ নিয়ে আমি চলেছি। এই বেরোনো নিয়ে মাধবী কোনও

BanglaBook.org

আপত্তি করে না। কিন্তু ঘড়ি দেখে। এই ক'বছরে এগুলো এখন গা-সওয়া আমার। বুড্ডিকে আমি প্রুফের কথা বলি না। বরং আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে কথা বলতে। ফলে ওর কথার জবাবে আমি বলি—অন্য দিন গেলেও হবে।

ও বলে—চল, আমাদের বাড়ি।

আমি বলি—কোথায়? সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি?

ও হাসে। বলে—হ্যাঁ। তপোময়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে আমার।

আমি যাই ওর সঙ্গে। আমার কাঁধে প্রুফের তাড়া ভারী হয়ে বসে। ওদের বাড়ির কাছে গিয়ে উত্তেজনা হয় আমার। আমি জিগ্যেস করি—উনি আছেন?

ও বলে—হ্যাঁ। আছেন। চল না, আলাপ করিয়ে দেব।

আমি চারপাশে তাকাই। বড় দোতলা বাড়িটি আমাকে মুগ্ধ করে। বড় বড় গাছে ঢাকা সবুজের মধ্যে তাকে আবছায়া লাগে। অজস্র পাখির ডাক শুনতে পাই আমি। ওদের কিচির-মিচিরের মধ্যে আমি শিস দিয়ে উঠি। বুড্ডি আমার হাত চেপে ধরে। বলে—একদম না!

আমি অবাক তাকাই।

ও বলে—মেয়েদের শিস দেওয়া উনি একদম পছন্দ করেন না। তোর সালোয়ার কামিজ দেখেও হয়তো উনি ক্ষুণ্ণ হবেন।

—তুই পরিস না?

—মাথা খারাপ!

—আমাকে বাড়িতে ডাকলি কেন বুড্ডি?

—উনি তো আর তোকে কিছু বলবেন না।

—তোকে বলবেন।

—সে তো সব সময়ই বলছেন।

কথা বলতে বলতে আমরা ভেতরে আসি। বড় বড় ঘর সুন্দর করে সাজানো। বিরাট মাছের বাক্স, তাতে রঙিন মাছেরা ঘুরছে। দেওয়ালে বড় বড় ছবি। থাকে থাকে সাজানো বই।

বুড্ডি আমাকে নিয়ে ওপরে যায়। আমি দেখি। যেদিকে তাকাই, বই—শুধু বই। আমার মনে হয়, এই তো আদর্শ সাহিত্যিকের বাড়ি। বুড্ডিকে ফিসফিস করে বলি—উনি বই ধার দেন?

বুড্ডি বলে—দিলে তো বাঁচতাম। কিছু ভার কমত। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আমার জীবন গেল।

দারুণ তিক্ততা নিয়ে কথাগুলো বলে ও। আমার মতো ফিসফিস করেই বলে।

BanglaBook.org

এবং বলা শেষ হলেই অপূর্ব মোলায়েম করে ডাকে—বাবা! বাবা! আসব?

—কে ? মা? দাদুভাইকে স্কুলে দিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবা!

আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ মটকে হাসে। আমি ভাবতে থাকি, আমি পারি না কেন এরকম? তিক্ততা চেপে মোলায়েম হতে পারি না কেন? ও বাড়িতে সারাক্ষণ আমার সত্তায় লেগে তাকে অসুখী বিষাদ। কোনও কিছুতেই তাকে ঢাকা-চাপা দিতে পারি না আমি। আমি অপলক দেখতে থাকি ওকে। ও বলে—বাবা, আমার এক বন্ধু এসেছে। নিয়ে আসব?

—বন্ধু?

আমি সাহিত্যিকের কণ্ঠস্বর শুনি। খুব গাঢ় নয়। সামান্য তরল। কিছু-বা সানুনাসিক। ওঁর লেখার মতোই কতকটা। চৌবাচ্চায় অবগাহনের মতো। গভীরতা নেই। কিন্তু ভাল লাগে।

কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসা প্রশ্নও আমি লুফে নেই তৎক্ষণাৎ। দু-চারটি বাড়তি জ্ঞানচক্ষু আমার জীবনে নীলের পরিবারের অবদান।

বুড্ডিরও রয়েছে ওই জ্ঞানচক্ষু আমি টের পাই। কারণ সেই মুহূর্তে ও নিজেকে শোধন করে নেয়। বলে—বান্ধবী বাবা। দেবারতি। আনব?

—এসো।

অনুমত্যনুসারে ঘরে পা দিই আমরা আর হতবাক হয়ে যাই আমি।

উঁচু আসনে কোনও গেরুয়াধারী গুরুর ছবি। পাশে দক্ষিণাকালী। এছাড়া সমস্ত ঘরময় বিভিন্ন বিচিত্র ঠাকুর-দেবতা, সন্ন্যাসী এবং মৃত আত্মীয়ের ছবি। শুধু ছবি আর বই।

উঁচু আসনের তলে কম্বলের ওপর তিনি বসে আছেন। সামনে একটি খোলা খাতা। তাতে অসামান্য হস্তাক্ষরে বাক্য তৈরি হচ্ছে। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে ছবির মতো বাক্য। সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। সাদা পাতলা ফতুয়ার নীচে সাদা ঝকঝকে পৈতে আমার নজর এড়ায় না।

আমি ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাস করি না, পৈতের ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। আমি মনে করি, যে-কোনও জ্ঞানী, মানবিক, সুচেতনাসম্পন্ন মানুষই ব্রাহ্মণ। উপনয়নের মাধ্যমে দ্বিজ হওয়ার দরকার হয় না মানুষের কারণ প্রত্যেকটি মানুষই, আমার মতে শতজ। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে অজস্রবার জন্মায়।

সাড়ম্বর পূজা-পার্বণ উপবাস তিথি পালনেও বিশ্বাস নেই আমার। এক সময় ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল না। জীবন, ধীরে, পর্যায়ক্রমে, আমাকে ঈশ্বরকে অবলম্বন

BanglaBook.org

করতে শিখিয়েছে। জানি না ভবিষ্যতে পূজা-পার্বণেও আমার আস্থা জন্মাবে কিনা, পঞ্জিকা অনুসরণে উপবাস ষষ্ঠী তিথি-নক্ষত্রও মানতে শুরু করব কিনা, তাও জানি না, তবে সেই মুহূর্তে, আমি নিশ্চিত, আমি পূজাপাঠে অনাগ্রহীই ছিলাম—তবু, ওই ঘর এবং ঘরের মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগল। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম।

এ প্রণাম আমি কাকে করলাম? তাঁর সাহিত্যকর্মকে, নাকি আমার মধ্যে আজন্মলালিত গোপন সংস্কার এই ঘরের পরিবেশ দ্বারা বশীভূত হল?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবার আগেই তিনি আমাকে বসতে বলেন। আমি কম্বলের বাইরে, মেঝেয়, তাঁর মুখোমুখি বসি। তিনি আমার নাম জানতে চান। দেবারতি। উচ্চারণ করেন তিনি। বলেন—বাঃ! কী চমৎকার নাম। দেবারতি। দেবের আরতি। যেমনি তোমার নাম, তেমনি তুমি শুদ্ধ। তোমাকে দেখেই বুঝেছি মা।

মিষ্টিকাকা ছাড়া এই প্রথম আমি কোনও সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলছি। মিষ্টিকাকাকে আলাদা করে কবি ভেবে মেশা সম্ভব হয়নি। অতএব আমি ভাবতে থাকি—সাহিত্যিক যদি মার্ক্সিস্ট না হয়, তা হলেই এমন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যায় কিনা।

সন্ন্যাসীর মতো। কম্বলে শোয়। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে, মৃত আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে রাত্রিবাস করে। সন্ন্যাসীরই মতো। কিন্তু সন্ন্যাসী নয়।

তিনি আমায় প্রশ্ন করেন—স্বামী আছেন?

—হ্যাঁ।

—হাতে শাঁখা নেই?

আমার মধ্যে বিদ্রোহ জন্ম নিতে থাকে। শাঁখা না পরা নিয়ে ওই পরিবারে যুদ্ধ করেছি আমি। শুনেছি কুৎসিত বাক্য। মাধবী বলেছে—ও শাঁখা-সিঁদুর পরবে কেন? পরলে যে পুরুষেরা বুঝে ফেলবে ও বিবাহিত। ফস্টিনস্টি জমবে কী করে?

অথচ মাধবী এত ঘরোয়া নয় যে বুঝবে না, ফস্টিনস্টি অবিবাহের অপেক্ষা রাখে না। যে-কোনও বয়সের যে-কোনও পরিস্থিতির নারী বা পুরুষ, চাইলেই তা করতে পারে। এ জগতে ফস্টিনস্টির চেয়ে সহজলভ্য আর কিছুই নেই।

আমার দ্রোহ তবু শান্ত রাখি আমি। সঞ্জীবনকে বলি—শাঁখায় আমার বিশ্বাস নেই।

—সিঁদুর তো দেখছি না মাথায়।

BanglaBook.org

—সিঁদুরও বিশ্বাস করি না। তবে কিছু একটা না পরলে পরিবারের লোকের অসুবিধে হয়। তাই পরি পালা-পার্বণে।

—বেশ, বেশ। পরিবারকে মান্য করো দেখে ভাল লাগছে মা। শ্বশুর-শাশুড়ি সব আছেন?

—আছেন।

—তাঁদের আপন বাবা-মায়ের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করো। সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে। আজকাল এসব শুনলে লোকে হাসে। বিশেষত মেয়েরা। কিন্তু এর চেয়ে খাঁটি কথা আর কিছু নেই।

—আর রমণী সুখী হয় কার গুণে?

—পরিবারের সকলকে সুখী রেখেই রমণীর সুখ।

আমি কিছু বলি না। শুনি কেবল। ভাবি এই সব বটিকা আর গেলানো যাবে না আমাদের। নারীর আদর্শ স্থির করে দেবার তুমি কে হে পুরুষ?

তখন, তিনি সেই অমোঘ প্রশ্নটি করেন—মা হয়েছ?

—না। আমি বলি। মাথা নিচু না করেই বলি। কোনও ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ইতিহাস ইত্যাদি বলার প্রয়োজন আমি বোধ করি না।

তিনি বলেন— মা না হলে মেয়েরা সম্পূর্ণতা পায় না। মা হও।

এতক্ষণে আমার বোধোদয় হয়। এসে বসার পর থেকে লেখকমশাই আমাকে শুধু প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এবং এমন প্রশ্ন সেই সব, যার উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসেবে অবশ্যই কিছু আদেশ-উপদেশ দেওয়া চলে। এই অধিকার তিনি কী ভাবে পেয়ে যান? আমিই বা কী করে তাঁকে এতখানি প্রশ্রয় দিই? কেন বলি না, এসব বলার আপনি কে?

বলি না কারণ শিষ্টাচারের শিক্ষা আমাকে চুপ করিয়ে রাখে। পিতাঠাকুরের বয়সি না হোক, সোনাকাকা বা ফুলকাকার বয়সি একটা লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না— এই শিক্ষায় আমি সহ্য করতে থাকি। হজম করতে থাকি। মানিয়ে নিতে থাকি ঠিক সেই রকম যেমন ও-বাড়িতে মানাই।

সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক একটিও মৌলিক প্রশ্ন আমাকে করেননি, এ বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে যাই। আমার মেধাকে উনি জানতে চান না, আমার আগ্রহ, আমার পাঠাভ্যাস, সংগীত-সাহিত্য-বিজ্ঞান-চিত্রকলা-ক্রীড়া ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রে আমার পারঙ্গমতা আছে কিনা জানতে চান না। উনি কেবল জানতে চান, সমাজ যেভাবে একটি মেয়েকে চায়, সেভাবেই আমি আমার যথাযথ ভূমিকা পালন করি কিনা। উনি জানতে চান না, নীল ওর শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মা মনে করে

BanglaBook.org

কিনা, জানতে চান না আমাকে সুখী করার জন্য নীল সচেষ্ট কিনা। জানতে চান না কারণ সমাজও তা জানতে চায় না। উনি প্রশ্ন করার অধিকার পেয়েছেন একজন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক পুরুষ হিসেবে। আসলে প্রশ্নগুলো করছে সমাজ একজন নারীকে।

কোন সমাজ এ? মাধবীর সমাজ। শিবানন্দর সমাজ।

আমি মনে মনে এই সমাজকে অস্বীকার করতে চাই। ঘৃণা করতে চাই। আমি বিশ্বাস করতে চাই, কোথাও একটা সুন্দরতর জগৎ আছে। সে জগৎ আমি অর্জন করব।

আমি সঞ্জীবনকে বলি— মাতৃত্বের সঙ্গে প্রসবের সম্পর্ক আছে বলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না!

উনি বলেন— তা তো আছেই। মা হয়ে ওঠার যে পদ্ধতি, যে অনুভূতি, তা অন্য এক ধর্মের সন্ধান দেয়।

—তা হলে মা সারদা জগজ্জননী হলেন কী করে?

—উনি বিশেষ। মা! বিশেষ আর সাধারণকে গুলিয়ে ফেললে চলবে কেন?

—মা টেরিজা?

—উনিও অসাধারণ।

—বেশ। যাঁরা বিশেষ, যাঁরা অসাধারণ, তাঁরাই সাধারণের পথপ্রদর্শক। বিশেষের ধর্ম যদি সাধারণের ধর্ম হয়ে উঠতে না পারে তাহলেই দুর্যোগ আসে। তাই না?

সঞ্জীবন হাসেন। বলেন— তোমার ভাবনায় অস্বচ্ছতা আছে। তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। তবে ভাল লাগছে যে তুমি গভীরভাবে ভাবতে পারো। এই ভাবনাকে সংসারের কল্যাণে লাগাও।

বুড্ডি এবার তাড়া দেবার সুযোগ পায়। বলে— ওকে নীচে নিয়ে যাই বাবা? আপনি কাজ করুন!

—যাও মা। যাও। দেবারতি, এসো আবার।

—আসব।

বলি আমি। বুড্ডির সঙ্গে সঙ্গে যাই। দু'জনে বসি মুখোমুখি। বুড্ডি বলে— সারাক্ষণ ওই! শুধু জ্ঞান দেবে। এদিকে নিজের বউয়ের কাছে কেঁচো হয়ে থাকত।

—থাকত কেন?

আমি জিগ্যেস করি।

BanglaBook.org

ও বলে— স্বর্গে গিয়ে আমায় বাঁচিয়েছেন। নইলে দু'জনে মিলে যা করত আমায়, মনে হত মরে যাই।

ক্রমে আমরা কথার ঝুলি খুলে বসি। ও ওর সমস্ত ব্যথা-বেদনা তিক্ত স্মৃতি উগড়ে দেয়। আমিও দিই। শ্বশুরবাড়ির নিন্দায় মুখর আমরা দুই বধূ ভুলে যাই, কলেজ জীবনে এরকম কোনও দৃশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। নিন্দার মধ্যে সংকীর্ণতা আছে, নীচতা আছে, এই বিশ্বাসে, মাধবীর প্রতি তিতিবিরক্ত হয়েও আমি কখনও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কাছে মাধবীর নিন্দে করিনি। নিন্দাচর্চার মধ্যে থাকাও আমি পছন্দ করি না। কিন্তু বুড্ডির কাছে এসে নিজের এই নিন্দুক স্বভাবের উন্মোচনে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই। সকল নীচতা এবং ইতরতাসমেত নিন্দে করে, ঝুলি খুলে নিন্দে করে, আমার ভীষণ হাল্কা লাগে। এমনকী এতটুকু বিবেক যন্ত্রণাও হয় না— কেন আমি এমন নিন্দে করলাম!

আমরা, দুই পুরনো বান্ধবী, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিই সেদিনের মতো। বুড্ডি বলে— যখন খুশি চলে আসবি।

—আসব।

বলি আমি। বাড়ি ফিরে জানাই আমি সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। জানাই যে ওঁর পুত্রবধূ আমার পুরনো বান্ধবী। মাধবী শোনে আগ্রহভরে। শুনবে আমি জানতাম। এবং এর পর, বুড্ডিদের বাড়ি যাচ্ছি, বলে বেরোলে খুব আপত্তি করেনি। সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত মানুষ তো!

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত, কলেজ স্ট্রিট যাচ্ছি বা বুড্ডির কাছে যাচ্ছি বলে বলেই আমি হস্টেল খুঁজেছি এখানে ওখানে।

সেই যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে প্রায়ই আমি বুড্ডিদের বাড়ি যাই। কিন্তু ওকে কখনও আমার বাড়িতে ডাকিনি। ও এলে সামান্য ভদ্রতা তো করতে হবে ওর সঙ্গে। এক গ্লাস পানি, একটু মিষ্টি খাওয়াতে হবে। আমার হাতে টাকা তো থাকে না সব সময়। তা ছাড়া ও এলে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প ছাড়া অন্য কোনও কথাই আমার বলার থাকবে না। কারণ মাধবী, নীল, শিবানন্দ, বাড়ির এ-ও-সে সারাক্ষণ আসবে, যাবে। কোনও নিভৃতি নেই।

এত কথা আমি ওকে বলিনি। আসল কথা হল, যে-বাড়িতে আমার নিজেরই স্বস্তি নেই, সে-বাড়িতে আমি আমার বন্ধুদের ডাকি কী করে! বিয়ের পর, প্রথম দিকে, আমার নাটকের দলের বন্ধুরা কয়েক বার এসেছিল। তখন মাধবী আর শিবানন্দর মুখে যে-বিরক্তি আমি দেখেছি, তাতে বন্ধুদের সঙ্গে শীতল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি আমি। দেখিয়েছি এমন, যেন আমি চাই না ওরা আসুক। আসেনি।

BanglaBook.org

এক নীলকে বিয়ে করে আমি সকল ছেড়েছিলাম। সকলও আমাকে ছেড়েছিল। এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণকালে, হঠাৎ-ই পেয়ে যাওয়া বুড্ডি আমার মানসিক ভরসাস্থল হয়ে ওঠে ক্রমে। সব উগড়ে দেবার জন্য একটা দেওয়াল যে কত দরকার ছিল আমার, আমি তা টের পাই। ফলে, বুড্ডি কলেজে যতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল আমার, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এবং ওরই মাধ্যমে, ক্রমে, তপোময় জেনে যায়, সঞ্জীবন জেনে যান— সংসারে আমার সুখ-শান্তি নেই। জেনে ফেলেন— আমি ক্রমাগত সেই খোলা দরজার সন্ধান করছি, যা পেলে আমি বেরিয়ে পড়ব একলা। হ্যাঁ, একলাই।

সঞ্জীবন স্নেহাতুর হয়ে ওঠেন আমার প্রতি। ভাল মাছ এলে বুড্ডিকে বলেন— ওকে ডাকো।

কোনও অনুষ্ঠান হলে বুড্ডিকে বলেন— দেবারতি কখন আসবে?

ওঁর বাড়ির ফলাহারিণী বিপত্তারিণী কালীপুজোয় আমি ঘর জুড়ে আঁকি আলপনা। উনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন— কখনও নিজেকে একা ভাববে না মা। আমরা আছি। এ বাড়িকে তোমার নিজের বাড়ি মনে করবে। যে-কোনও প্রয়োজনে নিঃসঙ্কোচে এসে থাকবে এখানে।

এই সংবেদনশীলতায়, স্নেহে, আমি আপ্লুত হয়ে যাই। আমার চোখ জলে উপচে আসে। ওঁর রক্ষণশীল মানসিকতা আমাকে আর পীড়ন করে না। আমি বিশ্বাস করি, এ শহরে, কোনও বিপদ হলে, এখানে আশ্রয় পাব আমি। নিশ্চিতই।

দিনের পর দিন, সেই হস্টেল সুবিধে মতো না পেয়ে আমার তাই বুড্ডির কথা মনে হয়। আমি প্রলুব্ধ হই বিশ্বাস দ্বারা। প্রলুব্ধ হই সঞ্জীবনের কথায়। আমি স্থির করি, আপাতত বুড্ডির কাছে গিয়ে উঠব। ওখানে থেকে আরও ভাল করে হস্টেল খুঁজতে পারি আমি। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি এক বিকেলে বুড্ডির কাছে যাই।

বুড্ডি শোনে। শুনতে শুনতে ক্ষীণ হয়। ম্লান হয়। এই ম্লানিমা ওকে প্রায় মুছে ফেলতে থাকে আমার দৃষ্টি থেকে। আমি চিৎকার করে ডাকি— বুড্ডি-ই-ই-ই!

ও, অন্য কোনও যুগ থেকে, অন্য কোনও অন্ধকার দেওয়ালের পার থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে— আসলে, দেবারতি, জানিস তো, এ বাড়িতে বাবার নির্দেশ ছাড়া কিছুই হয় না। কোন পদ রাঁধা হবে, সে-ও বাবা সকালবেলা ঠিক করে দেন। তুই বাবাকে বল।

বেশ। আমি সঞ্জীবনের কাছে যাই। আশ্রয় চাই ক'দিনের। দশ দিন। পনেরো দিন।

তিনি সরু চোখে আমার দিকে তাকান। ওঁর কম্বলে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে।

BanglaBook.org

তার উত্তাপ আমি টের পাই। তিনি বলেন— বাড়ি ছাড়বে?

—হ্যাঁ।

—থাকবে কোথায়?

—হস্টেলে।

—পেয়ে গেছ?

—খুঁজছি। বাড়ি থেকে তো রোজ বেরোতে পারি না। এখানে থাকলে...

—হস্টেল পেয়ে যাবে বলে তুমি মনে করো?

—হ্যাঁ। পেয়ে যাব।

—কোনও দিন পাবে না। আমার এক আত্মীয়ার জন্য আমি এক বছর ধরে হস্টেল খুঁজেছি, পাইনি। তা ছাড়া খাবে কী? টাকা যোগাবে কে?

—জুলাই মাসে একটা কাজে আমি যোগ দেব। তা ছাড়া টিউশ্যন, প্রুফ দেখা এসব করে চালিয়ে নেব নিজেরটা।

—চালিয়ে নেবে? অতই সোজা? শেষ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি করতে হবে, বেশ্যাবৃত্তি। কী দেখেছ তুমি দুনিয়ার? কেন ছাড়বে তুমি ওই বাড়ি, অ্যাঁ? শ্বশুরবাড়ি যেমনই হোক, তার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। সেখানেই মেয়েদের সম্মান। কী করেছে তোমাকে ওরা? গায়ে হাত তুলেছে? মেরেছে? বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে? খেতে দেয়নি তোমাকে? পরতে দেয়নি? কী? কী কারণ? তুমি শ্বশুরবাড়িতে কী করে বেরিয়ে আসছ তা আমরা জানি? শেষে আমি তোমাকে থাকতে দিই আর তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গুন্ডা নিয়ে চড়াও হোক আমার বাড়িতে। পুলিশ লেলিয়ে দিক। এখানে তোমার জায়গা হবে না, বলে দিলাম।

আমি স্তব্ধ বসে থাকি। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলসে যায়। আমি তর্ক ভুলে যাই। আমার মনে পড়ে না যে গায়ে হাত তোলার চেয়েও বড় অসম্মান ঘটে মানুষের জীবনে। বলতে পারি না আমি, পরিবারে খেতে-পরতে পাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কিছু প্রত্যাশা মানুষের আছে— তা না হলে পরিবার শব্দটার কোনও মানে নেই।

কিছুই বলি না আমি। কেবল অসীম জড়তায় অনড় হয়ে যাই। মাথার মধ্যে শূন্য লাগে। বুঝতেও পারি না কখন উনি আমার সামনে থেকে উঠে চলে গেছেন। দেওয়ালে নির্বাক দেব, দেবী, গুরু ও সন্ন্যাসীরা আমার প্রতি চেয়ে আছেন নির্বিকার!

হঠাৎ কোথাও কিছু পতনের শব্দ হয়। কেউ কারওকে ডাকে। ধীরে সক্রিয়

BanglaBook.org

হতে থাকে আমার চেতনা। আমার ভিতরে কেউ বলে— ওঠো! যাও! এখানে আর থাকতে পারো না তুমি।

আমি আমার ভিতরকার আত্মার দিকে তাকাই। তার বিবর্ণ মুখ দেখি। কাঁপা ঠোঁটে সে বলে—ওঠো! সোনা! এখানে আর থাকতে নেই তোমার!

আমি উঠি। নিঃশব্দে নেমে আসি সিঁড়ি দিয়ে। আমারই আত্মার মতো বিবর্ণ বুড্ডির মুখ। ও সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেকে বিয়ে করেছে। ও সুখী। আমি ঠোঁঠ নেড়ে বলি— আসি।

শব্দ করি না। কারণ আমার গলার কাছে বিস্ফোরণের শব্দ জমা আছে। সামান্য সুযোগ পেলেই তা অশ্রুসমেত চিৎকৃত হয়ে উঠবে। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে রুদ্ধ করেছি। বুড্ডি আমাকে কী বলছে আমি জানি না। পথে নেমে আসি। প্রাচীন বরাহনগরের অলি-গলি দিয়ে হাঁটতে থাকি। অন্ধকার এখন আমার বড়ই প্রয়োজন। শরীর নিংড়ে কান্না আসে আমার। আর আমি তা রোধ করি না। কারণ আমার শক্তি নিঃশেষিত। সন্ধ্যার নির্জন সব অচেনা অজানা গলিতে একা একা কাঁদতে কাঁদতে চলি আমি। নিজের একাকীত্ব আর অসহায়তা আছড়ে পড়ে আমার ওপর। আমাকে ভেঙে ফেলতে চায়।

কিন্তু আমি ভাঙি না। চোখ মুছে ফের নীলের বাড়িতে যাই। আমার মাথায় লম্বা চঞ্চু দ্বারা ঠুকরে দেয় বেশ্যাবৃত্তি, মারধোর, মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ইত্যাকার শব্দ। অদৃশ্য রক্তপাতের আঁশটে গন্ধে আমার বমি পায়, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বমি করি আমি। কল খুলে দিয়ে বিকট শব্দে বমি করি। কাঁদি। দু'হাতে টানি আমার চুলের গোছা। দাঁতে ঠোঁট কামড়াই। আমার সকল অকৃতকরণ, সকল ব্যর্থতা, সকল বোকা নির্বুদ্ধি আবেগ আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে মণ্ড পাকিয়ে দেয়।

তখন আমার বাথরুমের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জবাব দিই না। আবার টোকা পড়ে। হৃদের গলা আমি শুনতে পাই। ও উদ্বিগ্ন ডাকে— ছোড়দি, দরজা খোল, কী হয়েছে তোর?

দিদির কথাও শুনতে পাই আমি— শানু, কী হয়েছে?

আমি দরজা ফাঁক করি। বলি— আমার অম্বল হয়েছে খুব। তোরা যা।

ওরা চলে যায়। আমি বুঝি ওদের উদ্বেগ। ওদের আশঙ্কা। ওরা আমার সিদ্ধান্ত জানে। কিছুই করতে পারবে না, তাও জানে। ওদের অসহায়তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমার কোনও অভিযোগ নেই কোথাও। বুড্ডি, দিদি, মা, বাবা, আমার দাদারা, বউদিরা, হৃদ, মিষ্টিকাকা— দুনিয়া জুড়ে অসহায় মানুষের লম্বা

BanglaBook.org

অশেষ মিছিল। আমি কাকে বাদ দেব? কাকে দোষ দেব? না। আমার কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

স্নান সেরে হৃদের সঙ্গে আমি ছাতে যাই। শেষ এপ্রিলের আকাশে তারা-ফোটা আলোর বিন্দু। মাদুর বিছিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি শুয়ে পড়ি। হৃদ আমার পাশে নিশ্চুপ বসে থাকে। আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। খুব আরাম লাগে আমার। খুব শান্তি লাগে।

আমি জিগ্যেস করি— কখন এলি?

ও জবাব দেয় না। ওর হাত অল্প অল্প কাঁপছে আমি টের পাই। ওকে বলি— পার্টির কাজে এসেছিস, না নিজের কাজে?

স্কুল থেকে পার্টি করে হৃদ। রাজনীতি করে। মিষ্টিকাকার মতোই। ও এ বারও আমার কথার জবাব দেয় না। বরং খামচে ধরে আমার চুল। আমি বলি— হৃদ, আমি ঘুমিয়ে পড়ব এ বার। ওর হাতে হাত রাখি আমি। ও আঁকড়ে ধরে আমার হাত। আমি তাকাই ওর দিকে। ওর গালে তারার আলো চিকচিক করে। এক হাতে দু'চোখ টিপে ধরে ও। আমি ওর হাত ঝাঁকাই। বলি— হৃদ!

ও ঝলসে ওঠে— তোর কথা ভেবে আমার ঘুম হয় না। কেন তোর এরকম হবে? ছোটবেলায় তোকে আমি হাঁ করে দেখতাম। কী সুন্দর ছিলি তুই! তোর রেজাল্ট দেখে আমরা শিখেছিলাম, আমাদেরও এরকম করতে হবে। সেই তুই... সেই তুই... সেজদি... তোর কেন এরকম হবে?

একটা ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদতে থাকে ও। আমার মধ্যে স্নেহ উছলে ওঠে। ছোট্ট ভাইটা আমার। রোগা, ফরসা, লাল টুকটুকে ঠোঁট! মিষ্টিকাকা ওকে মারলে ও কান্না চাপত। ওর পুরো মুখটাই টকটক করত তখন। আমার রাগী গম্ভীর বাবার কাছে একমাত্র ওরই ছিল অবাধ যাতায়াত। আমার মায়ের ধোপার হিসেবের খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে গল্প লিখত ও— 'ভূতের পাল্লায় মেজজেঠু'।

আমার ইচ্ছে করে ওকে কাছে টেনে নিতে। বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে ওর মুখ। আমার কাছে ও এখনও সেই ছোট্ট ছেলেটা। ছোট্ট হৃদ, বড়জেঠুর বাড়িতে জামরুল পাড়তে গিয়ে যে ভিমরুলের কামড় খেয়েছিল। তবু— তবু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি না আমি। দিদি হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি না। আমার লজ্জা করে না। ভয় করে। এরা, এই বাড়ির লোক, মাধবী, এদের ভাবনায় আটকায় না কিছুই। আমি আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। ও নিজেকে সংযত করে। চোখ মুছে বলে— কোনও ভাবেই কি এই সিদ্ধান্ত বদলানো যায় না?

BanglaBook.org

মা-ও বলেছিল। একই কথা।

আমি বলি— না।

ও বলে— তা হলে উজানিনগরে ফিরে চল তুই। বাবা রিটায়ারমেন্টের পর একটা বাচ্চাদের স্কুল করবে। সেখানে পড়াবি তুই।

—বাচ্চাদের স্কুল, সেখানে আর কত পাব আমি বল? আসলে আবার আমি তোদের নির্ভর হয়ে যাব। তুই জানিস আমাদের অবস্থা। দাদারা বাবা-মাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কী আমি আর কারও ওপর নির্ভর করতে চাই না।

—আমি বলছি, আমি তোকে টিউশ্যন জোগাড় করে দেব। ওখানে আমার অনেক চেনা, তুই জানিস।

—আমি ধরে নিলাম ওখানে আমার কোনও অভাব থাকবে না। কিন্তু সারাক্ষণ আমি একটা বিষাদের কারণ হয়ে থাকব। বাবা-মা কাকা-জেঠা সবাই আমাকে দেখবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাববে, আহা, মেয়েটার বিয়ে ভেঙে গেল। বউদিরা সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে, এই বুঝি কারও ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। ভাইবোনেরা যে যার সংসার বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতে সামলাতে ভাববে আহা শানুটার একটা বাচ্চাও যদি থাকত... অতখানি করুণা সহ্য হবে না আমার হৃদ।

—তুই সামনে না থাকলে তোর কথা ভাববে না কেউ? ভাবে না?

—ভাবে। কিন্তু চোখের সামনে থাকার প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। তা ছাড়া কৌতূহলী প্রতিবেশী পরিচিতরা আছে। তারা আমাকে দেখবে। ফিসফিস করবে। কেউ বলবে, ওকে বর নেয় না।

—ওঃ সেজদি! এগুলো হবেই তুই জানলি কী করে? এখন লোক আর আগের মতো অন্যদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।

—অনেক বেশি ঘামায়। চিরকাল ঘামাবে। পরচর্চা ছাড়া মানুষের আর কী-ই বা করার আছে!

—আস্তে আস্তে সয়ে যাবে ঠিক।

—সইবে না। হৃদ, এই সাত বছরে অনেক জেনেছি আমি। আমার বুদ্ধি বেশ ভালরকম পেকে উঠেছে। ধর, ওখানে আমি কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা বললাম, ধর সে আমার বন্ধুই ছিল আগে। সে এক দিন দুদিন এল আমার কাছে। কথা বলল। আমিও গেলাম। অনিবার্য ভাবে লেগে যাবে তার গৃহবিবাদ। ওদের মায়েরা স্ত্রীরা ভাবতে থাকবে, নিজের সংসার নষ্ট হয়েছে বলে আমি অন্যদের সংসারও নষ্ট করছি। কিংবা এ-ও ভাবতে পারে যে আমি একটি পুরুষ বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। আর

BanglaBook.org

ওদিকে আমাদের বাবা-কাকারা ভাববে, শানু এ কী আদেখলেপনা শুরু করল, ওর কি একটু সংযত থাকা উচিত নয়? এক নতুন নরকদর্শন হবে আমার হৃদ। আমি সহ্য করতে পারব না।

ও অপলক তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কিছু বলে না। আমিই বলি বরং— এই ভাল। এই নিজের মতো থাকা। বাবাকে বলেছি, এক বছর চালিয়ে নিতে না পারলে ফিরে যাব। যেমন তোরা চাস।

বলেছি ঠিকই, হৃদকেও বললাম, কিন্তু আমি জানি, আমি যাব না।

হৃদ এলোমেলো তাকায়। আঙুল মটকায়। কী ভাবে ও। ওর ভ্রূ কুঁচকে যায়। ও শুয়ে পড়ে মাদুরের ওপর। বলে— দিব্যদার কাগজটায় যোগ দিচ্ছিস তুই তা হলে?

—হ্যাঁ।

—কত দেবে?

—দু' হাজার।

—এতে চলবে?

—সাপ্তাহিক চিরায়ততে একটা যোগাযোগ করে দিয়েছে দিব্যদা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান রিভিউ করতে হবে। মাসে আরও তিন-চারশো টাকা এসে যাবে। এ ছাড়া প্রুফ দেখা আছে। তাতে আরও তিনশো।

—দিব্যদাকে তুই চিনিস না? ওর ওপর অতখানি নির্ভর করা কি ঠিক হচ্ছে?

—দিব্যদা খুব কিছু সাহস পাবে না হৃদ। মিষ্টিকাকার মাধ্যমেই তো ওর সঙ্গে পরিচয়। আমি সংযত থাকলেই হল।

—ওই চাকরির ওপর নির্ভর করে তুই বেরোলি, তারপর ধর ও তোকে আর রাখল না। তখন?

—মানুষটা অত খারাপ নয়। তা ছাড়া ওই কাগজের ওপর নির্ভর করে থাকলেও আমার চলবে না। কাগজটার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ওরা প্রতি তিন মাসের স্কিম করে চালাচ্ছে। প্রথমে দৈনিক ছিল, এখন সাপ্তাহিক করেছে। যে-কোনও মাস থেকে হঠাৎ বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

—তখন?

—দিব্যদা বলেছে এই পুজো পর্যন্ত কোনও অসুবিধে নেই। মানে ধর অক্টোবর। এর মধ্যে আমাকে একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে।

—পাবি?

—জানি না, হৃদ, আমার অবস্থা প্রভাতী সংবাদের মতোই। এই মুহূর্তে আগামী তিন মাসের কথাই আমি বলতে পারি। জুলাইয়ের মাঝামাঝি এ বাড়ি ছেড়ে যাব

BanglaBook.org

আমি। জানিয়ে দিয়েছি সে কথা। নির্দিষ্ট তারিখ, থাকার জায়গা ঠিক হলেই জানিয়ে দেব।

—কোথায় থাকবি?

—খুঁজছি।

—সেজদি, আমার মনে হচ্ছে তুই পাগল হয়ে গেছিস। মেরেকেটে ছাব্বিশশো টাকায় তুই মাস চালাবি...

—এ টাকায় এ শহরে এক-একটা পরিবার চলে হৃদ।

—চলে। তারা খালপারে থাকে। বস্তিতে থাকে, তুই থাকবি? তিন মাস পরে তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, তোর এখনও থাকার জায়গা ঠিক হয়নি।

—হয়ে যাবে, হৃদ, খুঁজছি।

—যে কাগজের চাকরির ওপর নির্ভর করে বেরোচ্ছিস, সেই কাগজটাই উঠে যাবে যে-কোনও দিন। সেজদি, তোর মাথার ঠিক নেই। বাবা জানে এসব? মেজ জেঠু, মেজদা-সেজদা জানে? মেজদি-নির্মলদাকে বলেছিস?

—না। কেন বলব? কেন বাড়তি দুশ্চিন্তা চাপাব আমি? হৃদ, আমি কোনও ভাবেই আর কারও বোঝা হতে চাই না। যথেষ্ট কষ্ট এবং উদ্বেগ আমি চাপিয়েছি সবার ওপরে।

—আরও চাপাতে যাচ্ছিস। তোর মাথার ঠিক নেই।

আমি চুপ করে থাকি। ওর জন্য মায়া হয় আমার। ও স্থিতাবস্থা চায়। যেমন মা চেয়েছিল। বলেছিল— ও বাড়িতেই থেকে যা তুই। নীলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিস না। কিন্তু থেকে যা।

নীলের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াই আমি এ বাড়িতে আছি। মা বোঝে না। নিজের মতো করে ভাবে যে যুদ্ধও এক রকম সেতু সম্পর্কের, শীতলতাও। আসলে মা এবং হৃদ দু'জনেই স্থিতাবস্থা চায়। আরও বড় সর্বনাশের আশঙ্কা ওরা চেপে রাখতে পারছে না। অন্যরা আশঙ্কা করছে, কিন্তু প্রকাশ করছে না। কিংবা হয়তো ভাবছে, শেষ পর্যন্ত কোথাও যাব না আমি। থেকে যাব। এ ভাবেই দিন কাটবে আমার। একটা জীবন, কেটেই যাবে ঠিক।

হৃদ সিগারেট ধরায়। আনমনা টানে। ওর চোখ জলে ভরে ওঠে আবার। ও কড়া গোপন আদেশে তা ফেরত পাঠাতে চায়। তাই জল উপচে পড়ে না। চোখের কোলে টলটল করে। বড় বড় চোখ ওর। বড় বড় চোখ আমাদের সবার। বাবা-কাকা-জেঠাদের সন্তান-সন্ততি আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ বোন, বংশানুক্রমে চোখের বিশালতা অর্জন করেছি। আমি ওকে দেখি, আমার মাথায় ঘোরে বাসস্থানের সমস্যা,

BanglaBook.org

বরাহনগরের অলি-গলি ভিজিয়ে দেওয়া কান্না আমার। আমি প্রায় ফিসফিস করে বলি ওকে— গত বছর দিদির দেওর, মানে আমার মেজ ভাশুর সজলদার ছেলের অন্নপ্রাশনে তুই ছিলি, তোর মনে আছে?

ও তাকায়। কোনও কথা বলে না। আমি বলে চলি— বাড়ির ছোটদের দিয়ে আমি 'হিংসুটে দৈত্য' নাটক করিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ। খুব ভাল হয়েছিল।

—মনে আছে, সেদিন নাটক শেষ হওয়ার পর কী দেখেছিলাম?

—কী?

—সজলদার বড় শালা হেমন্তদার বড় মেয়ে সোনালি খুব কাঁদছে?

—হ্যাঁ! মনে আছে!

—আমি জিগ্যেস করলাম, ও বলল ওর বাবা বকেছে। তাই।

—হ্যাঁ।

—ওকে খুব আদর করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, বোকা মেয়ে, বাবা বকলে এ ভাবে কাঁদে? ওকে জড়িয়ে ধরে বেসিনে নিয়ে গেছিলাম যাতে ও মুখ-চোখ ধুয়ে নেয়।

—তুই কী বলতে চাস?

—ও সেদিন আসলে কেন কাঁদছিল জানিস?

—কেন?

—নীল ওকে মলেস্ট করেছিল।

হৃদ সিগারেট ছুড়ে ফেলে। দু'হাতে খামচে ধরে নিজের মাথার চুল।

—রেপও করতে পারত।

আমি বলি।

—তুই ভাব, আমার বর মলেস্ট করেছে বলে ও কাঁদছে আর আমি ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছি!

বলতে বলতে হাসি পায় আমার। গুলগুল করে হাসি পায়। নীল সোনালিকে মলেস্ট করেছে ভেবে হাসি পায়। লেখক সঞ্জীবন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে হাসি পায়। আমি হাসতে থাকি। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যায়। আমি পেট চেপে নিচু হয়ে যাই। আমার হাসিতে বিভ্রান্ত ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখ জলে ভরে যায়। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় দমকে। হাসি আর কান্নার সূক্ষ্মতম দেওয়াল পার হতে হতে আমি বলি— আমার একটা থাকার জায়গা সত্যি দরকার, খুব দরকার, হৃদ!

—আমি আসছি— বলে ও উঠে যায়। নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। আমি ছাদের

BanglaBook.org

আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। শিবানন্দ তোয়ালে পরে ওপরে উঠে আসে। বাথরুমে যায়। নির্মলদা আসে। ও-ও ওর বাথরুমে। একে একে ঘরে ফিরছে বাড়ির লোক। আমি দেখতে পাই হৃদ এ বাড়ির উল্টো দিকের এস টি ডি বুথে ঢুকল। আমার মাথার ভিতরে শূন্য লাগে। কোনও ভাবনাই দাঁড়ায় না। পিছলে পিছলে যায়। আমি আবার মাদুরে শুয়ে পড়ি। বিশাল আকাশ গ্রহ-নক্ষত্র সমেত নেমে আসতে থাকে আমার কাছাকাছি। ওর অন্ধকারের মধ্যে, কুচিকুচি তারার আলোকে পাশ কাটিয়ে ঘোরাফেরা করি আমি। ঘুরিই কেবল। আমার কোনও গন্তব্য নেই।

তখন হৃদ এসে আবার আমার পাশে বসে। খুব দায়িত্বশীল যুবনেতা হয়ে ওঠে ও হঠাৎ। বলে— এটা রাখ।

একটি ভাঁজ-করা কাগজ ও দেয় আমাকে। বলে— এতে একটা নাম ও নম্বর আছে। সাহানার। সাহানা আমার বান্ধবী। অনেক দিন যোগাযোগ নেই অবশ্য।

আমি কাগজটা দেখতে দেখতে বলি— নম্বর কোথায় পেলি?

—প্রথমে বাবাকে ফোন করলাম। ওর বাবার নম্বরটা যোগাড় করতে বললাম। বাবা যোগাড় করে দিল। তারপর ওর বাবাকে ফোন করলাম।

—ও।

—কালই ওকে ফোন করবি। আমিই করব প্রথমে। ও একটা হস্টেলে থাকে আমি জানি। ও তোকে সাহায্য করতে পারবে। তবে দেরি করা যাবে না। মে মাসে ও স্টেটসে চলে যাচ্ছে।

আমি খুব উৎসাহ পাই না। হস্টেল তো আমি কতই দেখেছি! তবু, হৃদের উদ্যোগে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। জিগ্যেস করি—ও কোথায় থাকে জানিস?

—সল্টলেকে।

এ বার পুরোপুরি দমে যাই আমি। সল্টলেক কলকাতা শহরের সবচেয়ে ব্যয়বহুল অঞ্চল। তবু, পরদিন হৃদ ওর বান্ধবী সাহানার সঙ্গে কথা বলে আমাকে লাইন দেয় যখন, আমি শুনতে পাই ওপারে একটি মিষ্টি স্বর— হাই দিদি!

আমার অলস লাগে। আরও একটি ব্যর্থ সন্ধানের জন্য আমি প্রস্তুত হই মনে মনে। বলি— হাই সাহানা। আমি দেবারতি। হৃদ তোমাকে বলেছে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, দেবারতিদি, তুমি হস্টেল খুঁজছ। শোনো আমাদের হস্টেলে অ্যাপ্লাই করো তুমি। পেয়ে যাবে।

—খুব খরচ-সাপেক্ষ সাহানা?

ও আমাকে বলে যেতে থাকে সব। দরপত্র। অবস্থান। কোথায় পাওয়া যাবে ভর্তির ফর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। সকল সন্ধানই ও দেয় আমাকে। সন্ধান দেয় স্বনির্ভরার।

BanglaBook.org

স্বনির্ভরা, দেবারতি ও প্রভাতী সংবাদ

—বোসো।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলল দিব্যদা। ওর ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো। সাজসজ্জা দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না এই কাগজটা যে-কোনও মাস থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাকে ঠিক কী কাজ করতে হবে, এখনও জানি না। এখানে আসতে আমাকে দু'বার বাস পাল্টাতে হয়েছে। সময় লেগেছে এক ঘণ্টা। এই বাড়িটার ঠিক পাশেই সরোজিনী নাইডু কলেজ। এই কলেজে আমার বি এসসি পার্ট-ওয়ানের সিট পড়েছিল। আমি হস্টেলের সামনে থেকে দুশো একে চেপে চিড়িয়ামোড়ে এসেছি। এখান থেকে অনেক বাস আছে এ পর্যন্ত আসার। হিসেব করে দেখলাম আমার আসার খরচ পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা। অর্থাৎ অন্য কোথাও না গেলেও শুধু প্রভাতী সংবাদের জন্যই আমার খরচ হবে প্রায় তিনশো টাকা।

অন্যান্য দিন দিব্যদা এখানে আসে বারোটায়। সন্ধে থেকে সারা রাত্রি ওর চাকরির জায়গা রাজনগর দৈনিক-এ থাকে। ভোরবেলা বাড়ি ফিরে ঘণ্টা তিনেক ঘুমোয়। বারোটায় এখানে আসে। তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে দিনের পর দিন কী করে পারে মানুষ? আমি জানি না। দিব্যদা পারে। এটা ওর বৈশিষ্ট্য।

আজ আমি আসব বলে ও দশটার আগেই এসেছে। এ ঘরে আমি এসেছি আরও চার দিন। ওর সঙ্গে কথা বলে গেছি। ওদের আর্ট ডিরেক্টর ভানুদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

ও কাজ করতে করতে আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। এটাই ওর স্বভাব। সোজাসুজি তাকায় না ও। সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে ও চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ও বলে—সব ঠিক আছে?

—আছে।

—হস্টেলে আসা হয়েছে? ফোন নম্বর আছে কোনও?

—ফোন একটা আছে সুপারের ঘরে। সেটা সবার ব্যবহারের জন্য নয়।

BanglaBook.org

—নম্বরটা কত? খবরাখবর তো নেওয়া যাবে?

—নম্বরটা নেওয়া হয়নি।

—পরদিন যেন আনা হয়।

—আনব।

—এ ঘরেই বসে কাজ করতে অসুবিধে নেই তো?

—না। অসুবিধে কেন হবে?

—পাশের ঘরে সাংবাদিক ছেলেমেয়েগুলোর হট্টগোল। ওখানে কিছু কাজ হবে না। এ ঘরে একটা আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাচ্ছে। ঘরটা এসি-ও আছে।

আমি মাথা নাড়ি। সামান্য অস্বস্তি হয় আমার। টানা পাঁচ ঘণ্টা ওর সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে! নিজেকে সাহস দিই আমি। এ পর্যন্ত ও এমন কিছু করেনি যাতে ওকে লুব্ধ মনে হয়। বরং আমাকে ও নানা ভাবে সাহায্যই করেছে। আমি যখন নীলকে ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্তের কথা ওকে জানাই, সাহায্য চাই ওর, ও একবারও সিদ্ধান্ত নেবার কারণ আমার কাছে জানতে চায়নি। অসম্মানজনক কোনও আচরণই ও করেনি আমার সঙ্গে। তা ছাড়া এই ঘরে নিরন্তর লোক যাওয়া-আসা করে।

ও বলে— চিরায়ততে কখন যাওয়া?

—সপ্তাহে তিন দিন যেতে হবে।

—হীরালাল ছিল তো?

—হ্যাঁ।

—কখন যেতে হবে?

—হীরালালদা রাত্রি আটটা পর্যন্ত থাকেন। তার মধ্যে। অনুষ্ঠানগুলো কখন কী ভাবে কভার করব, সেটা আমার ব্যাপার।

—অনুষ্ঠান থাকলে এখান থেকে আগে চলে যাওয়া যাবে। কোনও অসুবিধা নেই। না হলে পাঁচটা পর্যন্ত থাকতে হবে। আর কলেজ স্ট্রিটে প্রুফ দেখাটা চলবে কি চলবে না?

—চলবে।

—সেখানে কখন?

—সপ্তাহে এক দিন গেলেও হয়।

—বেশ। এখানে কী কাজ করা হবে জানা আছে?

—না। আপনি বলেননি তো!

BanglaBook.org

—এই সব অপগণ্ড সাংবাদিকগুলো খবর নিয়ে আসে, কিন্তু বাংলাটাও লিখতে জানে না। সব জার্নালিজম পড়ে এসেছেন! রিপোর্টের অর্ধেক বানান ভুল। কোনও বাক্যগঠন যথাযথ নয়। এগুলো সব রিরাইট করে দিতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন কাগজ থেকে দু'চারটে নিউজ আমি দাগ দিয়ে দেব। সেগুলো অবলম্বন করে বিশ্লেষণধর্মী ফিচার লিখতে হবে। প্রুফ দেখে দিতে হবে যতখানি সম্ভব। একটা সাহিত্যের পাতা আছে আমাদের। আধপাতা ছোটগল্প যায়, আধপাতা বুক রিভিউ, সাহিত্যের খবর ইত্যাদি। ওই পাতার জন্য কিছু কিছু লিখতে হবে।

আমার জন্য চেয়ার-টেবিল আসে। দিব্যদার প্রশস্ত এ ঘরে ধরেও যায়। ও সকলকে ডাকে। সব মিলিয়ে দশজন। কেউ সাংবাদিক। কেউ ডি টি পি অপারেটার। ভানুদার সঙ্গে আর্টের ব্যাপারটা দেখে একজন। শুধু ছাপাখানার কেউ-ই নেই। কারণ ছাপার জায়গাটা দূরে কোথাও। কোথায় আমি জানি না।

এ ভাবেই আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি আমার কাজে। প্রতি রবিবার কাগজ বেরোয় বলে সোমবার হালকা থাকি। একটু দেরিতে গেলেও হয়। রবিবার ছুটি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার ছুটি বলে কিছু নেই। সোম-বুধ-শুক্র প্রভাতী সংবাদ থেকে বেরিয়ে আমি চিরায়ত-য় যাই। শনিবার যাই পাবলিশারের কাছে। প্রভাতী সংবাদ থেকে ফেরার পথে একটা অটো করে স্টেশনে আসি। দমদম থেকে শেয়ালদা নামি। শেয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে যাই কলেজ স্ট্রিট। যাই মৌলালি পেরিয়ে চিরায়তর অফিস পর্যন্ত। হীরালালদা আমাকে কিছু কার্ড দেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র। গানের, নাটকের, চিত্রকলার, নৃত্যের। সর্ববিদ্যাবিশারদের মতো আমি লিখি আমার মতামত। এক-একটি অনুষ্ঠানের জন্য দেড়শো থেকে দু'শো শব্দ। কলা-কুশলীদের নাম লিখতেই পঞ্চাশটা শব্দ খসে যায়। তবু, সাপ্তাহিক চিরায়ত-য় আমার রিভিউ যখন প্রথম ছাপা হয়, আমি অপলক দেখি ওই দেড় কলম লেখা। বার বার পড়ি। কীরকম উৎসাহ জাগে আমার। সমস্ত অনুষ্ঠান দেখি, লিখি, সপ্তাহে দুটো-তিনটে করে রিভিউ জমা দিই। কলামন্দির বা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে হেঁটে চলে যাই শেয়ালদা থেকে। পথচারীদের পাশ কাটিয়ে শেয়ালদা স্টেশনের উত্তাল ভিড় বাঁচিয়ে চলতে থাকি একা। হাঁটি। পা ফেলি জোরে জোরে। কখনও বাঁ হাঁটুতে ঝলসে ওঠে যন্ত্রণা। আমি দাঁড়াই এক মুহূর্ত। আবার চলি। ঘেমে-নেয়ে যাই। কিন্তু অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেলে সব শান্তি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলের একেবারে প্রথম বা দ্বিতীয় সারিতে আসন থাকে চিরায়তর প্রতিনিধির জন্য। আমার শরীর জুড়িয়ে যায়

BanglaBook.org

আরামে। ঘুম পেতে থাকে। চোখ টান করে জেগে থাকি আমি।

সকালে উঠি, ভাত তরকারি রান্না করি, চা করি। কেয়াকে দিই, আমিও খাই। স্নান করি। খেয়ে বেরিয়ে যাই। ইদানীং পাউরুটির মধ্যে আলুসেদ্ধ পুরে স্যান্ডউইচ করে টিফিন নিই আমরা। বাইরে খাওয়ার খরচটা বাঁচে। সম্পূর্ণ বাঁচে না। বিকেলে দারুণ খিদে পায়। তখন ঝালমুড়ি খাই। কোনও দিন একটু বাড়তি খরচ করে এগরোল। কেয়া নাকি ফুচকা খায়। এত দিন কলকাতায় আছি, ফুচকা ব্যাপারটা আজও সহ্য হল না আমার।

অনুষ্ঠান থাকলে ফিরতে ফিরতে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা বাজে। স্নান সেরে দু'চারটে কথা বলি কেয়ার সঙ্গে। খাই। তারপর রিভিউ লিখি। অনুষ্ঠান না থাকলে স্নান-টান সেরে প্রুফ দেখতে বসি। শুতে শুতে রাত্রি দেড়টা দুটো বেজে যায়।

এর মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। অবসর নেই। পুরনো কথা মনে পড়ে কিন্তু তা নিয়ে বসে থাকার সময় নেই। রবিবার আমি আর কেয়া বাজার করি। বাবাকে ফোন করি। দিদিকে ফোন করি। খুব হিসেব করে দ্রুত কথা বলে ফেলতে হয়। কথা বলতে বলতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে। লাফিয়ে লাফিয়ে মিটার চড়ে। আমি, অতএব, দ্রুত জানিয়ে দিতে চাই, আমি ভাল আছি।

আমি ভাল আছি। বেশ ভাল আছি। এর চেয়ে ভাল আর কী আমি আশা করতে পারি!

বাজার থেকে ফিরে জামা-কাপড় কাচি। বিছানাতেই সব কিছু বলে চাদর ময়লা হয় তাড়াতাড়ি। সুতরাং রবিবার তাকে কেচে দিলে আবার না শুকিয়ে আসা পর্যন্ত আমার খোলা তোশক ঢেকে দিই আমার সাদা দোপাট্টা দিয়ে।

স্নান খাওয়া শেষ হলে দুপুরে বইপত্র পড়ি। শুধু রবিবারেই দুটো কাগজ কিনি আমি। একটা বাংলা একটা ইংরাজি। খেয়েদেয়ে কোনও বইপত্র পড়ার আগে কর্মখালির বিজ্ঞাপন নিয়ে বসি। লাল কালিতে দাগ দিই। রাত্রে বসে আবেদন করি। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসেপশনিস্ট, কাউন্টার সেলস গার্ল, প্রুফ রিডার, বিজ্ঞাপন সংস্থার কপি রাইটার— কিছুই বাদ রাখি না ডোর-টু-ডোর সেলসম্যানশিপ ছাড়া। প্রত্যেকটি আবেদনপত্র লেখার সময় আস্থা রাখি আমি— এ চাকরি আমারই জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় আড্ডা জমে আমাদের। এরই মধ্যে উল্টো দিকের সিগারেট-খাওয়া গাউন-পরা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় আমার। আলাপ সে-ই করে।

BanglaBook.org

দু'শো একে আসার পর সেটা প্রথম রবিবার। সকালে জানালার কাছে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, সারা ঘরে আলো ঝলমল করছে, কেয়া পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সে এল। দাঁড়াল আমাদের দরজায়। পা অবধি ঢাকা কালো স্কার্ট। সাদা গোল-গলা টি-শার্ট। হাতে সিগারেট। কাঁধ অবধি চুল। হাসল সে। আমিও হাসলাম। সে বলল— খুব ভাল লাগছে ঘরটা। হঠাৎ চোখে পড়ল সবুজ জানালা। চমকে গেলাম।

—ভেতরে আসুন!

আহ্বান করি তাকে। দেখি। ঝকঝকে মুখ। টানা বড় বড় হরিণী চোখ। ফর্সা ত্বকে গোলাপি উজ্জ্বলতা। ঠোঁট ও দাঁতে ছাপ ফেলেছে নিকোটিন। চল্লিশ পার করে দেবার হালকা পীড়ন ত্বকের ওপর। গড়ন একটু ভারীর দিকে। তবু সব মিলিয়ে তার আছে এক সৌন্দর্য। এক আকর্ষণ। সম্ভবত তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বই হবে— যাকে মুহূর্তে ভাল লেগে যায় আমার।

সে ভেতরে আসে। বসে আমার বিছানায়। বলে— আমি উজ্জ্বলা।

—আমি দেবারতি।

আমি কাগজ ভাঁজ করে রাখি। বলি— চা খাবেন?

—করো।

আমি হিটার জ্বেলে চায়ের জল চাপাই। উরু অবধি উঠে আছে কেয়ার নাইটি। টেনে নামিয়ে দিই। ওর পায়ে মশা কামড়ানোর দাগ। আমারও। ওর মশারিটা ছিঁড়ে গেছে একেবারে। তাই টাঙায় না আর। আমার মশারিই নেই। মশা তাড়ানোর কয়েল জ্বালাই। তবু মশা আসে। কামড়ায়।

উজ্জ্বলা বলে— কেন এলাম জানো? হঠাৎ চোখের সামনে দৃশ্যটাই পাল্টে গেল। কেয়া এ দিকের জানালা কখনও খুলত না। অথচ এটা খুললে যে আশ্চর্য সবুজ লাগে— ওই সব কৃষ্ণচূড়া ফুল...

আমি তাকিয়ে থাকি। সে বলে যায়— আর ওই বই। আমি পড়তে ভালবাসি। আমার দুটো প্যাশান। মিউজিক আর লিটারেচার।

খোলা জানালা ভালবাসে যে, সংগীত ও সাহিত্য যার প্রিয় তাকে আমিও প্রিয় করে নিই অচিরেই। ক্রমশ জেনে যাই আমি উজ্জ্বলা খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার দেবব্রত মাইকেল সেনের মেয়ে। প্রচলিত জনপ্রিয় ঘরানা নয় তাঁর। ফিল্ম তিনি করেছেন অল্পই। তবু তার মধ্যে বৌদ্ধিক তাৎপর্য, যারা পছন্দ করেছে, মনে রাখবে আজীবন। আমিও রাখব।

যদিও উজ্জ্বলা নিজে এ পরিচয় দেয় না। তবু লোকে জেনে যায়। যেমন জেনে

BanglaBook.org

গেলাম আমি। এবং, সবার মতো জিগ্যেসও করি তাকে— আপনি দেবব্রত সেনের মেয়ে?

—কোনও অসুবিধে আছে?

সে জিগ্যেস করে।

—না।

আমি বলি।

—কোনও সুবিধে?

—তা-ও নেই।

—দেখো, দেবব্রত সেনের মেয়ে বলে আমার সঙ্গে মেশো যদি তবে আমাদের বন্ধুত্ব হবে না। আমার পরিচয় আমি উজ্জ্বলা চ্যাটার্জি। এম পি জি রেকর্ডসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমার চাকরি এবং পদ দুটোই আমি অর্জন করেছি। বাবার ফিল্ম আমি ভালবাসি কিন্তু তার মধ্যে আমার বিন্দুমাত্র অবদান নেই। আমার পরিচয় আমার নিজস্ব।

তার কথার স্পষ্টতায় আমি ধাক্কা খাই। কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি বরং সম্মান জাগে আমার। খ্যাতিমানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে— এটুকু জানাতেই মানুষ উন্মুখ থাকে, এ-ই আমার অভিজ্ঞতা। এই মেয়েটি তার উল্টো পথে হাঁটতে চায়। খুব দূরের কেউ নয়, নিজের বাবার খ্যাতির ভাগও নিতে সে নারাজ।

আমি বলি— তা হলে আমাদের বন্ধুত্ব হোক।

সে হাসে। জড়িয়ে ধরে আমাকে। তার গায়ের সিগারেট ও পারফিউম মেশানো গন্ধ চিরকালের জন্য আমার মস্তিষ্কে মুদ্রিত হয়ে যায়।

কোনও কোনও রবিবার উজ্জ্বলা ওর উত্তরপাড়ার বাড়িতে চলে যায়। ওর মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। উত্তরপাড়ায় ওর স্বামী থাকে। এই যে জীবন ওর, বাড়িতে স্বামীকে একা রেখে হস্টেলে থাকা, কী এমন দূর উত্তরপাড়া এই শহর কলকাতা থেকে— যেখানে ওর স্বামীকে নিজের সবকিছু নিজেকেই দেখেশুনে নিতে হয়— এই পরিস্থিতি মেয়েদের বুকে বাজে। সমালোচনা করে তারা উজ্জ্বলার। মেয়েরা কেন, কখন, কীভাবে হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধাত্রী সব, পূর্ণ বয়স্ক প্রিয়জনকে ধারণ করার দায়িত্ব তাদের ওপর কীভাবে এত অনায়াস এসে পড়ে— আর স্বামীরা তাদের হয়ে ওঠে নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, এক প্রতিবন্ধী বুঝি-বা! আর এইসবই যা হলে, ব্যতিক্রমী ঘটলে সমালোচনা— এই হস্টেলেও মেয়েদের দ্বারা— এমনকী একদিন সৌমিত্রীর মুখেও আমি শুনে

BanglaBook.org

বিস্ময় বোধ করি। ও অনেক পেরিয়েও এখানে ঠেকে গেছে। কিন্তু উজ্জ্বলাদির কোনও মনোযন্ত্রণা নেই তার স্বামীকে একা থাকতে হয় বলে। আমি শুধু মাঝে-মধ্যে কথায় কথায় লক্ষ্য করি ওর দ্বিধা। আমার মতো সিঙ্গল-রুম প্রত্যাশী ও নয় কারণ ও সঙ্গ পছন্দ করে। আবার রুমমেটদের সঙ্গে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে ওর অসহিষ্ণুতা জন্মায়।

ও বলে— রাত জেগে বই পড়া আমার অভ্যাস। সুস্মিতার অসুবিধে হয় বলে আমি একটা একটা বেডসাইড ল্যাম্প করে নিয়েছি। সেটা জ্বেলে পড়লেও ওর বিরক্তি আসে। নিজের বাড়িতে কত বড় বড় ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। কেন আমি এখানে এত কষ্ট করব!

ঠিকই। কেন করবে? ও তো ত্যাগ করে আসেনি। পরিত্যক্তও হয়নি। বালিব্রিজের ভয়ংকর জ্যাম ঠেলে আসতে ওর কষ্ট হয়। সেই কষ্ট বহুকাল ও নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরীরে একটি অস্ত্রোপচার ওকে ধকল নেওয়া থেকে বিরত করেছিল। এর পরও অনেকদিন কেটে গেছে। ও ফিরে পেতে পারে ওর সেই শক্তি। ও ছেড়ে যেতে পারে হস্টেল। একটা গাড়ি কিনে ও অনায়াসে বাসে-ট্রেনে যাওয়া-আসার পরিশ্রম এড়াতে পারে। একটা গাড়ি ওর বরের জন্য আছে। পুরনো গাড়ি। ও বলে— একটা গাড়ি আমি নিজে কিনতেই পারি এখন। আমার ক্লিক্সটা সুস্মিতা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে। আমি কিছু বলি না। কিন্তু আমার যখন প্রয়োজন তখন তো ছেড়ে দেবে! দেয় না। আমাকে চাইতে হয়। বলতে হয়। যেন এটা ওর ক্লিক্স। কেনার পর থেকে আজ অবধি একবারও রিফিল করেছে? করেনি। যাকগে, আমি সে নিয়ে কিছু বলি না। কিন্তু পরের মাসেই দিয়ে দেব— এই বলে অন্তত তিনহাজার টাকা নিয়েছে। ফেরত দেয়নি। যখন টাকার দরকার হবে, রাতদিন আমার গা ঘেঁষে বসে থাকবে। কেন এসব? প্রতিটা পয়সাই আমি পরিশ্রম করে উপার্জন করি। সেটা কথা নয়। কথা হল, তুমি একটা কথা দিলে তার দাম থাকবে না? যে-কথা রাখতে পারবে না, তা দাও কেন? এসব ছোট-খাটো ব্যাপার দেবারতি, এসব নিয়েও এখানে আমাকে ভাবতে হয়। ভাল লাগে না। মনে হয় সংকীর্ণ, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। বাড়িতে ভাল ছিলাম। এসবের বাইরে ছিলাম অন্তত!

বাড়ি যায় ও। ফিরেও আসে। ও গেলে প্রতিবারই আমার মনে হয়, এ বার হয়তো ও পুরোপুরি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবে। ওর সঙ্গ ভাল লাগে বলেই এমন একটি গোপন উদ্বেগ থাকে আমার মধ্যে।

ও না থাকলে বেশ ফাঁকা লাগে আমার। কেয়া ভাল। কিন্তু কেয়ার সঙ্গে

BanglaBook.org

বেশিক্ষণ আড্ডা জমে না। সৌমিত্রী আসে। কিন্তু রবিবারগুলোয় ওরও কোথাও যাবার থাকে। আমার থাকে কোনও অনুষ্ঠান হয়তো বা। আরও সব মেয়ে আশে-পাশের। পৃথা, মধুমিতা, অঙ্গনা, শ্রীরূপা। পৃথা লাইব্রেরিয়ান। মধুমিতা ডাক্তার। অঙ্গনা এয়ারলাইনসের অফিসার। শ্রীরূপা স্কুলে পড়ায়। প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক দিক থেকে নিশ্চিত। প্রতিষ্ঠিত। ওদের জীবনে উচ্ছলতা বেশি। ওরা খুশিমতো বড় রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। খুশিমতো কেনাকাটা করে। নিত্য নতুন পোশাকে, প্রসাধনে সাজায় নিজেদের। কেয়া ওদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু আমি আড্ডা দিই ওদের সঙ্গে। অধিকাংশ সময়ই হুল্লোড় হয়। ওরা ওদের বিনোদনে আমাকে চায়। কিন্তু সন্তর্পণে এড়িয়ে যাই আমি। সময় না থাকার কারণ দেখাই। সেটা সত্যিও বটে। কিন্তু আসল কারণ অন্য। তা কেবল কেয়া বোঝে। আমিও বুঝি কেয়াকে। বেশিক্ষণ আড্ডা না জমলেও কেয়ার সঙ্গে আমার একটা নিভৃত জগৎ গড়ে ওঠে। অভাবী সংসারের সংবেদনশীল সদস্যরা যেভাবে জড়িয়ে থাকে পরস্পরকে, বুঝতে চায়, সহানুভূতিশীল থাকে পরস্পরের প্রতি, তেমনি আমি আর কেয়া— মাছ খাবার ইচ্ছে হলে আমরা কাগজ-কলম নিয়ে বসি, হিসেব করি কোন দিকে ব্যয়সঙ্কোচ করা যায়, পর পর দু'দিন দু'বেলাই আলু-বেগুন-কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়ে দিই আমরা। সর্ষের তেল, কাঁচালঙ্কা আর নুন ছাড়া আর কেউ সাক্ষী থাকে না এ সবের।

কিন্তু এর পাশাপাশি সৌমিত্রী ছাড়াও উজ্জ্বলার সঙ্গেও আমার এক নিভৃত জগৎ গড়ে ওঠে। সেই জগতে আমার দারিদ্র্য, আমার অনিশ্চয়তাকে নোংরা জুতোর মতো বাইরে খুলে রাখি আমি। সৌমিত্রী যা জানে, উজ্জ্বলা জানে না। উজ্জ্বলার সঙ্গে কথা বলার সময় কোনও মালিন্য যাতে এসে না পড়ে, সেদিকে আমি সতর্ক থাকি। আমি বলি না আমার ছেড়ে আসা জীবনের কথাও এমনকী। খুব সাবধানে থাকি অঙ্গনা, শ্রীরূপা, মধুমিতাদের আড্ডায়। সাবধানে থাকি যেন আমার অতীত প্রকাশ্য হয়ে না যায়। আমার সাত বছরের বেদনাকে আমি প্রাণপণে গোপন রাখতে চাই। উজ্জ্বলা ওর বহু নিবিড় অনুভূতির জায়গা যদিও অনায়াসে আমার কাছে অনাবৃত করে দেয়। আমি জেনে ফেলি, এক সহকর্মীকে ও উন্মাদ ভালবাসে, জেনে ফেলি, ঘাড়ে চুমু খেলে ও আবিষ্ট হয়ে যায়। এবং টের পাই, কেয়া এই ঘনিষ্ঠতাকে ঈর্ষা করে।

এতকাল ও কারও সঙ্গেই মিশতে না তেমন। আমি নিজেকে ওর মতো গুটিয়ে রাখিনি, যদিও প্রাণ-খোলা মেলামেশাও পারিনি। সে তো কেয়ার সঙ্গেও পারিনি। ওকে আমার দারিদ্র্য দেখিয়েছি, অনিশ্চয়তা দেখিয়েছি, যন্ত্রণা দেখাইনি। আমার

BanglaBook.org

আড্ডার অবসর কম। কিন্তু তারই মধ্যে মধুমিতাদের কাছে গেলে কেয়া কোনও অছিলায় চলে আসে। কোনও প্রয়োজনের কথা বলে আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায়। ওরা বুঝতে পারে কেয়াকে। ওর আড়ালে ডাকে ননদিনী বলে। বলে— দেবারতির ননদিনী। আমার মজা লাগে। ওদের সঙ্গে আমিও হাসি। এবং টের পাই, নিজের মধ্যেকার সন্ত্রস্ত আমিকে। আমি ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করি, কিন্তু কোথাও আর অবারিত হতে পারি না। সৌমিত্রী আমার পুরনো বন্ধু বলে তবু কিছুটা— কিন্তু— ওর সঙ্গেও একটা দূরত্ব আমার আছে। আমরা খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু খুব আলগা। কেয়ার কাছে যেমন আমার দারিদ্র্য খুলে দেখাই, ওর কাছে তেমন পারি না তো! প্রতি রবিবারেই ও কোথায় যায়, মন খুলে জিগ্যেস করতেও তো পারি না। এইসব সম্পর্কের প্রত্যেকটির সঙ্গেই আমার আংশিক উন্মোচন, আংশিক অধিকারবোধ।

এক রবিবার, দোপাট্টায় ঢাকা আমার বিছানা দেখে সৌমিত্রী। অবাক শুধোয়—কী ব্যাপার? দোপাট্টা দিয়ে ঢেকেছিস কেন?

—অন্য কাজে লাগে না তো।

আমি এবং সৌমিত্রী দু'জনেই বর্জন করেছি দোপাট্টা। কামিজের ওপর এক টুকরো কাপড় দিয়ে বুক ঢেকে রাখার ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের কাছেই লাগে অধিকতর অশ্লীল। এ নিয়ে আগেও আমরা আলোচনা করতাম। কামিজগুলো এমনভাবে তৈরি যে দোপাট্টা অনিবার্য ভারসাম্য হিসেবে কাজ করে। অতএব, নীলের বাড়িতে থাকতেই আমি পাঞ্জাবি পরতাম। দোপাট্টা নিচ্ছি না দেখেও ঘটেছিল শিস দেবার মতো উৎপাত। মাধবী চিৎকার করেছিল—বুকে লজ্জা নেই তোমার? বুকে লজ্জা নেই?

এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে গোটা পরিবারের আমার প্রতি বর্ষিত ছিছিক্কার দিদির অশ্রুজল হয়ে নেমে এসেছিল এবং আমি, আমার বুকের লজ্জা অর্জন করে, শান্তি স্থাপন করতে, গলায় দোপাট্টা জড়িয়েছিলাম। এখানে এসে মুক্ত হয়েছি। সৌমিত্রীও হয়েছে। ও দোপাট্টা ছাড়া কলেজে যাচ্ছে দেখে ওর এক পুরুষ কলিগ বলেছে—দোপাট্টা না নেওয়াটা অশালীন। বিশেষত কলেজে।

ও বলেছে—শোনো, আমি ব্রা পরেছি, তার ওপর স্লিপ পরেছি, তার ওপর কামিজ। তিনটে লেয়ার আছে আমার বুকের ওপর। আরও ক'টা লেয়ার থাকলে একটি মেয়ের পোশাককে তোমরা শালীন বলবে?

সৌমিত্রী দোপাট্টা ত্যাগ করেছে, কিন্তু তাই দিয়ে বিছানা ঢাকেনি, কারণ

BanglaBook.org

দোপাট্টা দিয়ে বিছানা ঢাকা যায় না। ও তাই বিস্মিত হয়। বলে— এটা কি ঢাকা হয়েছে?

—না।

—আর চাদর নেই তোর, না?

আমি হাসি। বলি—তাতে কী? কাচা চাদরটা শুকিয়ে গেলে বিকেলেই পেতে নেব।

ও কিছু বলে না। চলে যায়। রাত্রে একটি সেলোফেন ব্যাগ আমার বিছানায় রাখে। আমার হাতে তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস। আমি দেখতে পাই সেলোফেন ব্যাগে গুজরাত এম্পোরিয়ামের ছাপ। আন্দাজ করি অন্দরে আছে কী বস্তু। লজ্জা করে আমার। ভাব দেখাই যেন বুঝিনি ওটা আমার জন্য। কিছু না বলে ও তাকায় আমার দিকে। আমি বলি— শোন এই জায়গাটা, '...জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ। তার রূপেই যে সে মোহিত হয়, তা নয়। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়।...'

ও, সম্ভবত বুঝতে পারে না কী বই, কারণ আমার অধিকাংশ বইয়ে খবরের কাগজ বা ক্যালেন্ডারের মলাট। ও নীরবে শোনে, অপলক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে আমাকে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে—এটা তোর।

আমি প্রতিক্রিয়াহীন অথবা সঙ্কোচের প্রতিক্রিয়াবশতই, বুঝি না নিজেই, কারণ আমার ব্যয়ক্ষমতা নেই বলে ও এনেছে উপহার, পড়তে থাকি জোরে জোরে, পড়তে থাকি ওয়ালীউল্লাহ্‌, আমার অন্যতম প্রিয় ঔপন্যাসিক, পড়তে থাকি কারণ বারবার তাঁর রচনা পাঠ করার মধ্যে আমি পাই বিষণ্ণ আত্মার সৎ গভীর মায়াময় সৌন্দর্য— 'হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের যথার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয়, কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। ...'

ও বলে—আর কখনও দোপাট্টা দিয়ে বিছানা ঢাকিস না। কোনও কিছুই ঢাকিস না দোপাট্টায়। বরং পা মোছ ওটা দিয়ে। পায়ের তলা।

—'বালক বয়সে পর পর তিন বছর লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক ...' তোর মতো সৌমিত্রী, তোর মতো যুবক শিক্ষক 'সমস্ত রাত জেগেছিল এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্‌দা দিতে দেখবে।' ...

BanglaBook.org

ও এক ধাক্কায় বই ফেলে দেয় আমার হাত থেকে। আমি বলি—কী দরকার ছিল সৌমিত্রী? আমার তো কোনও অভাববোধ নেই।

—আমার আছে—ও বলে—তোর সঙ্গে আমার আবার যোগাযোগ হল কেন?

—কেন?

—এ এক রহস্য। যদি ছেড়ে যেতে হয় তা হলে আবার সংযোগ হয় কেন? বেশ তো ছিলাম। দেবারতি নামে কোনও বন্ধু ছিল আমার; এই পর্যন্ত। আবার দেখা হল কেন?

—কী হয়েছে?

ও একটা খাম দেয় আমার হাতে। দু'দিন আগে ও পেয়েছে, বলে। আমি খুলি সেই খাম। পড়ি। দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের নিয়োগপত্র। একবার, দু'বার, তিনবার পড়ি। চুপ করে থাকি। আমার ভেতরে কষ্ট হয়। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল না, এ তো সত্যি। ও চলে যাচ্ছে, এ-ও সত্যি। কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে এর মধ্যে? আবার দেখা হতে পারে, কথা হতে পারে, তবু দু'জনেই নতুনতর ঘনিষ্ঠতার বেদনাকে নতুনতম বিচ্ছেদ সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে চিনে নিতে থাকি। আমি যত্নে তুলে নিই ওর গুজরাত এম্পোরিয়ামের প্যাকেট। হাতে সময় নেই। সময় নেই অভিমানী হিসেব কষবার।

—কবে যাচ্ছিস?

জিগ্যেস করি ওকে।

—এক সপ্তাহ পর।

—হস্টেল পুরোপুরি ছেড়ে?

—আমি কলকাতা ছাড়তে চেয়েছিলাম।

ছেড়ে যাওয়াকে আরও বড় করে ঘোষণা করার জন্য আমরা কিছুই করলাম না। একসঙ্গে খাওয়া থেকে বিরত রইলাম। প্রতিহত করলাম পাশাপাশি রাত জেগে কথা বলার ইচ্ছা। কী বলব? পুরনো যা, বলা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। নতুন কথার জায়মান ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আদানপ্রদান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রইল না। রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা হওয়ার মতো এ আলোড়ন। প্রথম প্রথম অল্প চিঠি হয়তো-বা, তারপর সময় কোথায় চিঠি লেখার! অতএব সেই অঙ্গীকারও নেই। কেবল ও চলে যাবার আগের রাতে আমার ঘুম আসে না। আমি, আমাদের রুমের তিনটি ব্যাকেলাইটের চেয়ারের একটি যেগুলি সব সময় ভাঁজ-করা জামাকাপড়ে বোঝাই থাকে, খালি করে, ব্যালকনিতে গিয়ে বসি। আমার ইচ্ছে করে লনে

BanglaBook.org

হাঁটতে। কিন্তু রাত্রি বারোটায় মূল দরজার কোলাপসিবল ব্যবস্থায় তালা পড়ে যায়। আমার বদলে পায়চারি করে নাইট গার্ড। ঠক্ ঠক্ শব্দ করে লাঠিতে। আলো-আঁধারির মধ্যে হঠাৎ আমার চোখ যায় একতলার একটি ঘরের জানালায়। সাদাকালো কিম্ভূত মুখ। খোলা চুল। শ্বেতী আছে মেয়েটির সর্বাঙ্গে। অন্ধকার ঘরে বাইরে থেকে ঢুকে পড়া সোডিয়াম ভেপারের আলো চুঁইয়ে ও ভৌতিক হয়ে ওঠে। গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে সেই ভুতনি—দোষ কারো নয় গো মা। আমি স্বখাতসলিলে ডুবে মরি ...

আমার গা ছম্‌ছম্ করে। কান্না পায় কেমন। ভুতনি গানের সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে নাচে। একলা ঘরে থাকে। কারও সঙ্গে মেশে না। সরকারি কর্মী। আপিসে যায়। রাত্রি জাগে। ওর সন্দেহ, ওকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। ঘুমের ঘোরে খুন হতে চায় না বলে ও জেগে থাকে। নাচে। গায়।

নাইট গার্ড দাঁড়ায় ওর জানালার কাছে। বলে—দিদি, যান, ঘুমোতে যান।

ও কী বলে আমি শুনতে পাই না। শুনতে চাই-ও না সম্ভবত। গান চলতে থাকে। কী যেন মেয়েটির নাম? চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে অসহায় লাগে আমার। অসহ্য লাগে। ব্যালকনি থেকে উঠে পড়ি আমি। ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। ভাবতে ইচ্ছে করে না। পড়তে, লিখতে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আমি দরজা খুলে প্যাসেজে আসি। শুনতে পাই সেতারবাদন। এগিয়ে যাই শব্দ লক্ষ করে সেই প্রথম দিনের মতো। ওর দরজা খোলা। আলো আসছে। ও ঘুমোয়নি।

আমি যাই না ওর কাছে। ফিরে আসি। শুয়ে পড়ি চুপচাপ। খোলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। সকালে এমনকী দেখা করতেও যাই না সৌমিত্রীর সঙ্গে। রবিবার হওয়া সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ি সকাল-সকাল উদ্দেশ্যবিহীন। বাসে করে শ্যামবাজার যাই। নামি। ফের একটা বাসে উঠি। ফের আসি সল্টলেক। কোথায় যাব? হাঁটতে থাকি উদ্দেশ্যবিহীন। হাঁটতে হাঁটতে তেরো নম্বর ট্যাঙ্ক থেকে করুণাময়ী চলে যাই। করুণাময়ী থেকে চলে যাই এক অজানা রাস্তায়। সেই রাস্তা আমাকে নিয়ে ফেলে নলবন উদ্যানের সামনে। বাঁ হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছে আমার। আমার হিসি পাচ্ছে। খিদে পাচ্ছে।

পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কাটি আমি। ঢুকে পড়ি নলবনে। হিসি করি। দহিবড়া কিনি এক প্লেট। এক ধাক্কায় ত্রিশ টাকা খরচ হয়ে যায় আমার। নলবনের বিরাট বিলের ধারে, একটা খড়ো ছাউনির তলায় বসে থাকি একা। সারাদিন। ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। বৃষ্টি নামে জোর। আমি ব্যাকেলাইটের চেয়ারে পা তুলে বসি। বৃষ্টির ছাঁট আমার চুল, পিঠ, কাঁধ ভিজিয়ে দেয়। কীরকম অভিমান হয়

BanglaBook.org

আমার। কার ওপর বুঝতে পারি না। সৌমিত্রীর ওপর? নিজের ওপর? এ জগতের ওপর?

ভীষণ কান্না পায়।

সারাদিন অস্নাত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরি সন্ধ্যাবেলা। কেয়া জিগ্যেস করে—কোথায় গিয়েছিলে? প্রোগ্রাম ছিল?

মাথা নেড়ে পাশ কাটিয়ে যাই। দেখি একটা প্যাকেট। ওপরে চিরকুট—আমার মশারিটা দিয়ে গেলাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বইটা নিয়ে গেলাম।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, আমার প্রিয় বই, পঁচানব্বইয়ের বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থেকে একশো তেপ্পান্ন টাকায় কিনেছিলাম। একশো তেপ্পান্ন টাকা তখন আমার কাছে অনেক ছিল, এখনও অনেক!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাপ্তাহিক চিরায়ত ও প্রভাতী সংবাদ

দেখতে দেখতে একমাস নিরুপদ্রব পেরিয়ে যাই স্বনির্ভরায়। প্রভাতী সংবাদ আমাকে দু'হাজার টাকা দেয়। চিরায়ত দেয় ছ'শো টাকা। এক মাসে চারটে রিভিউ ছাপা হয়েছে আমার। আমি হিসেব কষে সন্তোষ লাভ করি খুব। কারণ এক মাসে আমি জমা দিয়েছি বারোটা। তার মানে আরও আটটা রিভিউ বাকি আছে। আটটা রিভিউ মানে বারোশো টাকা! মুশকিল একটাই, ওরা চেক দিয়েছে। ওদের জন্য পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় আমায়। প্রুফ দেখে তিনশো টাকা পেয়েছি। মোটামুটি তেইশশো টাকায় চালাতে হবে মাস। আমি হিসেব কষি। প্রভাতী সংবাদ থেকে ফেরার সময় অটো চাপা ছেড়ে দিই। হেঁটে আসি স্টেশন পর্যন্ত। সাপ্তাহিক ফোন করাও বন্ধ করে দিই। পোস্টকার্ড পাঠাই বাবাকে। ভাল আছি। জানাই। এবং সত্যি কথাই লিখি আমি। ভাল আছি। আমার কোনও অভাববোধ নেই। জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। আহা! গলা অবধি শান্তি আমার এখন। সাপ্তাহিক চিরায়তর কাছে আমি বারোশো টাকা পাব। আরও রিভিউ করব, আরও পাব!

এই সময় এক দিন হীরালালদা বসতে বলে আমাকে। বলে— কাজ আছে।

চিরায়ত-য় বসে কী কাজ করব আমি? জানি না। অপেক্ষা করি। ও একটা ট্রে রাখে আমার সামনে। ট্রে-তে অনেক কাগজ। সে-কাগজে আমারই হাতের লেখা। আমি কিছু বুঝতে পারি না। ভাবি, কোনও ভুল করেছি হয়তো, শোধরাতে হবে।

তখন হীরালালদা বলে— এগুলো থেকে বাছো।

—কী বাছব?

আমি জিগ্যেস করি বোকার মতো।

—দু'তিনটে বেছে নাও। এত রিভিউ তো প্রকাশ করা যাবে না, পত্রিকায় জায়গা অল্প। দেখো, যেগুলো খুব পুরনো হয়ে যাচ্ছে না, সেগুলো বাছো। বা তোমার মতে ভাল প্রোগ্রাম, এ হিসেবেও রাখতে পারো।

—বাকিগুলো?

ও একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি দেখিয়ে দেয় আঙুল দিয়ে। বলে— ফেলে দিও!

BanglaBook.org

ট্রে-র সামনে আমাকে বসিয়ে রেখে ও চলে যায়। হতবাক হয়ে যাই আমি। দারুণ নির্মম লাগে হীরালালদাকে। কিংবা এ গোটা জগৎকেই। কিছুক্ষণ কাগজগুলিকে স্পর্শ করতে পারি না আমি।

লেখা। আমার লেখা। রিভিউ হলেও, সৃষ্টিশীলতা না হলেও, যত্ন দিয়ে, মায়া দিয়ে এদের নির্মাণ করেছি আমি। শব্দ চয়নের মধ্যে, বাক্য গঠনের মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না আমার। আমার সাধ্যমতো সংক্ষিপ্ত পরিসরেও আমি তুলে ধরতে চেয়েছি ভাষার স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য! এগুলোর জন্য আমি পরিশ্রম করেছি। সময় দিয়েছি। বাস ভাড়া খরচ করেছি—তার কোনও হিসেব নেই?

অবশেষে, এক-এক করে কাগজ তুলি, পড়ি, রাখি, আবার পড়ি, বাছাবাছি করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি চোখ বন্ধ করি। তাসের মতো তুলে নিই যে-কোনও তিনটি লেখা। কী বিষয় নজরও করি না। বাকিগুলো ছিঁড়ি। দলা পাকাই। ছুড়ে দিই ঝুড়িতে। ছুড়ে দিই সাড়ে সাতশো টাকার হিসেব। গলার কাছে কষ্ট দলা পাকায়।

এবং সারা রাত্রি ওই দলা-পাকানো কাগজ তাড়া করে আমাকে। বুকের মধ্যে চাপ-চাপ লাগে। প্রভাতী সংবাদের অফিসে দিব্যদা এসে বসতেই আমার কষ্ট তীব্র হয়ে ওঠে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে বলি— দিব্যদা, একটা কথা বলব?

—বলো।

ও স্বভাব-সুলভ আড়চোখে তাকায়। আমি বলি—কিছু মনে করবেন না তো?

—শুনি আগে।

—ওখানে আমি বারোটা রিভিউ জমা দিয়েছিলাম। কাল হীরালালদা বললেন, তিনটে বেছে দিতে, বাকিগুলো যাবে না।

—তো?

—এরকমই কি হয়?

—হয়ে থাকে।

—ও।

—বাকিগুলো কোথায়?

—ছিঁড়ে ফেলে দিলাম তো।

—ছিঁড়ে ফেলে দিলে? এত বোকা কেন তুমি? বুদ্ধিহীন কোথাকার! নিয়ে আসতে পারলে না? আমরা হয়তো একটা টাকা দিতে পারতাম না কিন্তু সংস্কৃতির পাতায় ছাপাতে তো পারতাম। একটা পাতা ভরানো কী মুশকিল ...

আমি মাথা নিচু করে থাকি। এরকমও যে হতে পারে, জানি না আমি। দিব্যদা

BanglaBook.org

আমাকে ডাকে— শোনো, এদিকে এসো।

আমি ওর টেবিলের অন্য প্রান্তে দাঁড়াই। ও বসতে বলে। আমি বসি। টেবিলের ওপর হাত দুটি রাখি জড়ো করে। ও আমার হাতে হাত রাখে। চাপ দেয়। আমি কাঠ হয়ে যেতে থাকি। দ্রুত ভাবতে থাকি, কী করব, চিৎকার করব, চড় মারব, চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু ... কিন্তু হাতে হাত রাখলেই কি তা অশ্লীল হয়ে যায়?

আমার সব গুলিয়ে যায়। আমি শক্ত হতে গিয়ে শিথিল হয়ে যাই। ও আমার হাত তুলে ধরতে থাকে, নামিয়ে আনতে থাকে ওর ঠোঁট। তিলমাত্র ব্যবধানে আমি বলে উঠি— না।

ও থমকায়। তাকায় আমার দিকে। চোখ বন্ধ করে। খুলে আড়চোখে চায় ফের। কাতর ভাবে বলে— একবার! একটি বার মাত্র।

—না।

ভয় করে আমার। ও কি জোর করবে? আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে কি?

যদি ও তিন হাজার টাকা ধার না দিত আমাকে, যদি চাকরি না দিত, আমি হয়তো, একটি নিভৃত চুম্বনে রাজি হতেও পারতাম! কিন্তু এখন, যদি ওই চুম্বন বিনিময় হয়ে ওঠে, না, আমি তা হতে দিতে পারি না, চুম্বন দ্বারা পরিশোধ্য এমন কোনও সুবিধা ক্রয় করতে পারি না আমি!

ও কিন্তু জোর করে না। আমার হাত ছেড়ে দেয়। এবং টেবিলে মাথা রাখে। ওর পিঠ কাঁপে। ওর ঘন কোঁকড়ানো কাঁচা-পাকা চুলের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি আমি। যদি কেউ এসে পড়ে এই মুহূর্তে! কোনও সাংবাদিক! ভানুদা! বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংগ্রাহক! প্রত্যেকে ভয় পায় ওকে। ওর মেজাজ, ওর কাজের বিশুদ্ধতার দাবি, আনুগত্যের দাবি, ওর ক্ষমতা—এ অবস্থায় ওকে আর আমাকে দেখলে জমে উঠবে যে-নাটক, তাকে ঠেকানোর সাধ্য নেই আমার। এক অমোঘ সম্ভাবনার জন্য দপদপে হৃদপিণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করি আমি।

ও তাকায় তখন। রুমালে মুখ মোছে। চোখ দুটি টকটকে লাল। নাক টানে। বলে—আমি জানি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো।

আমি কিছুতেই বলতে পারি না, করি না। হয়ত আমার ধন্দ লাগে। করি না বিশ্বাস? নাকি করি? বিশ্বাস না করলে এই লোকটার ভরসায় আমি বেরিয়ে আসি কী করে? আমার কীরকম মায়া হয় ওর জন্য। আমি বলি— বিশ্বাস করি।

—আমার অনেক বদনাম। এক সময় ড্রাগ নিতাম আমি। মেয়েদের সঙ্গে বারবার জড়িয়ে গেছে আমার নাম। জানো?

BanglaBook.org

—জানি।

—বিশ্বাস করো?

—কী যায় আসে দিব্যদা? ওসব থাক।

—আমাকে বিশ্বাস করো?

—করি। বললাম তো।

—কেন করো?

—জানি না। কিংবা... কী বলব... দিব্যদা, কারওকেই অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করতে আমি পারি না। আর আপনি তো... আপনাকে...

—ভালবাসো ?

থমকে যাই আমি। মুখের ওপর বলা যায়? না, ভালবাসি না। আমি বলি—শ্রদ্ধা করি আপনাকে।

—আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালবাসি। কেন জানো?

আমি চুপ করে থাকি। জানতে চাই না। ও বলে—তুমি এখনও খুব সরল দেবারতি। খুব পিওর। কিন্তু আমি জানি তুমি হারিয়ে যাবে না। আমি বিশ্বাস করি। কবে থেকে জানো?

ভানুদা ঢোকে। কিছু কথা হয় ওদের। ও ভানুদাকে বসতে বলে। চা আসে আমাদের জন্য। ও বলে—ভানু, এই মেয়েটাকে আমি ওর ছোট্টবেলা থেকে চিনি। ওর একটা ডাকনাম আছে।

ভানুদা হাসে। বলে—সবারই থাকে। ভানু ছাড়াও আমার একটা ডাকনাম ছিল। পচা।

—হ্যাঁ। যেমন আমার নাম ছিল বিচ্ছু।

—তোর যোগ্য নাম। তা দেবারতির ডাকনাম কী!

আমি দিব্যদার দিকে তাকাই। আমার চোখে নিষেধ ফুটে ওঠে। আমার এই নতুন জীবনে, আমি চাই না, ওই নামে কেউ আমাকে ডাকুক। ওই নামে ওরা আমাকে ডেকেছিল। এত নিন্দিত সে-নাম, এত চটকানো, থ্যাঁতলানো, আমি তাকে রুমালে মুড়ে বন্ধ করে রাখতে চাই আমার গোপন বাক্সে। পুরনো যারা ডাকে ডাকুক, নতুনরা নয়।

দিব্যদা আমার চোখ পড়তে পারে। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি তার জন্য। ও বলে—সে আছে একটা নাম। কিন্তু ওকে সে-নামে ডাকি না আমি। কেন জানিস? একটা আস্ত উপন্যাস লিখে ফেলেছে ও।

BanglaBook.org

—উপন্যাস! বাঃ!

শুকনো গলায় বলে ভানুদা। খুবই স্বাভাবিক। কত লোকই তো দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়ে উপন্যাস লেখে। কী যায় আসে তাতে?

ভানুদা বলে—ও যদি উপন্যাস লেখে, তা হলে তো ওকে ডাকনামে ডাকা উচিতই নয়।

—সে কথাই তো বলছি। ভানু, কোনও লেখক দশ হাজার, পনেরো হাজার না নিয়ে উপন্যাস দিতে রাজি নয় পুজোসংখ্যার জন্য।

—তা হলে?

—একমাত্র সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজি। চেয়েছিলেন আট। আমি হাতে-পায়ে ধরে পাঁচে রাজি করিয়েছি।

সঞ্জীবন...সঞ্জীবন...মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় আমার। এখানেও সঞ্জীবন? নিজেকে বোঝাই। তা তো হতেই পারে। হওয়াই স্বাভাবিক।

দিব্যদা বলে—একটার বেশি উপন্যাস আমরা কিনতে পারব না। কিন্তু অন্তত দুটো উপন্যাস না হলে পুজোসংখ্যা ভারী করব কী দিয়ে?

—ঠিক কথা।

—ভাবছি ...

—কী?

—দেবারতির উপন্যাসটা ছাপব।

আমি চমকে উঠি। আমার উপন্যাস? সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি আমার উপন্যাস?

ভানুদা একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোঝা যায়। বলে—দিব্য, এটা তো লিটল ম্যাগ নয়। কমার্শিয়াল কাগজ। আনকোরা নাম ...যদি...মানে বিক্রি...

দিব্যদা বলে—আমাদের কাগজ বিক্রিতে উতরোয় না। বিজ্ঞাপনে উতরোয়। তোর আপত্তি থাকলে তুই দায়িত্ব নে। কোনও নামী লেখকের লেখা কিনে পয়সায় জোগাড় কর।

ভানুদা চুপ করে থাকে। ও জানে, এ কাগজে দিব্যদাই সব। মালিকও এমনকী কিছু বোঝে না। লেকটা মদ, লোহা ও বাসের ব্যবসায়ী। কী কারণে এই কাগজটা করছে, জানি না। দিব্যদা বলে— দেবারতি তোমার কী মত?

আমি হকচকিয়ে যাই। বলি— কীসের?

—শোনো, পুজোসংখ্যায় যদি তোমার উপন্যাসটা দাও, আমরা এক পয়সাও এক্সট্রা দিতে পারব না তোমাকে। কিন্তু তোমার উপন্যাসটা অন্তত তিনশো

BanglaBook.org

লোক পড়বে। আমি ছাড়া আর কেউ তো পড়েনি।

—না।

—রাজি আছ?

—রাজি।

ভাল লাগে আমার। ফেরার জন্য বাস ধরি সেদিন আমি। ভাবতে ভাবতে ফিরি। উজানিনগরের বাড়িতে বসে লেখাটার প্রাথমিক খসড়া করেছিলাম আমি। মাকে পড়িয়েছিলাম প্রথমটা। মা বলেছিল— 'লিখে যা।' আমি লিখে যাচ্ছিলাম। সকাল, দুপুর, বিকেল লিখে যাচ্ছিলাম। বাবা খুব বিরক্ত হয়েছিল। বলত— কী সারাদিন কলম নিয়ে ঘাড় গুঁজে আছিস? পি এস সি, এস এস সি— কত চাকরির পরীক্ষা আছে। তার জন্য পড়তে পারিস না?

মা বলত— যদি ওর লিখতে ভাল লাগে, লিখুক না।

—তোমার জন্য, তোমার প্রশ্রয়ে ওর সব নষ্ট হয়ে গেল।

মা-র চোখ সজল হয়ে আসে। মা উদাস তাকিয়ে থাকে খোলা জানালা দিয়ে। আমি লিখে যাই। উজানিনগর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তাকে আবার লিখি। এক বছর তা পড়ে থাকে পাণ্ডুলিপি হয়ে। অবশেষে মিষ্টিকাকা যখন নিজের বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিতে কলকাতায় আসে, জিগ্যেস করে— তোর মা বলছিল, তুই একটা উপন্যাস লিখেছিস নাকি।

আমি জানাই এ কথা সত্যি।

—কোথায় দিয়েছিস?

—কোথাও না।

—কোনও লিটল ম্যাগে দিতে পারিস।

আমি চুপ করে থাকি। মিষ্টিকাকা উপন্যাসটা উল্টেও দেখতে চায় না। বলে— রাজনগর দৈনিক-এ গিয়ে দিব্যর সঙ্গে দেখা কর। ও নামকরা সাংবাদিক। একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কলকাতায় সেই আমার দিব্যদার সঙ্গে যোগাযোগ। দিব্যদা নেয় আমার পাণ্ডুলিপি। পড়ে। মাত্র দু'দিন সময় নিয়েছিল ও। তৃতীয় দিন ফোন করে আমায় ডেকেছিল। পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল— পড়লাম। তোমার প্রথম লেখা?

আমি সম্মতি দিই। ও একটি বই দেয় আমাকে। একটি লিটল ম্যাগ। লিটল কিন্তু ক্ষুদ্র নয়। পত্রিকাটি ভাল লাগে আমার। উপন্যাস ছাপে ওরা। প্রচ্ছদে, বিষয় নির্বাচনে ওদের গভীরতা প্রকাশ পায়। সম্পাদকের নাম দেখি আমি। তপেশ ভৌমিক।

BanglaBook.org

দিব্যদা বলে— আমার নাম বলার দরকার নেই। কারণ তপেশ ভৌমিক আমাকে চেনে না। তুমি এমনিই যাও। লেখা দাও। পাণ্ডুলিপি দেবে না প্রথমেই। জেরক্স দেবে।

জেরক্স করতে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছিল আমার। তবু একদিন ওই পত্রিকার ঠিকানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। টেমার লেনের ছোট্ট ঘরটায় অনেক লোকের আড্ডা। তপেশ ভৌমিক, এক মধ্যবয়সি মানুষ, বেশ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে আমার উপন্যাস। পনেরো দিন পর খোঁজ নিতে বলে।

কলেজ স্ট্রিটে মিষ্টিকাকার প্রকাশকের কাছে যাই আমি, ওখানেও যাই। একবার, দু'বার, ছ'বার। তপেশ ভৌমিক খুব ভাল ব্যবহার করে; কিন্তু আমার উপন্যাস ছাড়াই প্রকাশিত হয় ওদের দ্বিমাসিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা।

একদিন ও বলে— চলো একজনের বাড়িতে যাই। তোমার উপন্যাসটা তাকে পড়তে দিয়েছিলাম। সে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায়। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন।

আমি জিগ্যেস করি— কী ঠিক করলেন আপনারা? ওটা কি প্রকাশিত হবে?

—নিশ্চয়ই।

—কোথায় যেতে হবে?

—বেশি দূর নয়। বাগবাজার। তোমার বাড়ি ফেরার পথেই পড়বে।

একটা ট্যাক্সি ডাকে ও। পথে কথা বলতে বলতে যায় একতরফা। আমার লেখার প্রশংসা করে। শ' ওয়ালেসে ওর একটা ভাল মাইনের চাকরি আছে। কিন্তু সেটা ছেড়ে ও পুরোপুরি প্রকাশনার ব্যবসায় নেমে পড়বে— এমন সব পরিকল্পনার কথা জানায়। আমি শুনতে থাকি। কোনও আগ্রহ হয় না আমার। কেবল সম্পাদকমণ্ডলীর একজনের সঙ্গে আমার প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি যেতে থাকি। হতে পারে কোনও ভুল-চুক আছে। হতে পারে আরও বিস্তার প্রয়োজন। আমি উপন্যাস বিষয়ে ভাবতে থাকি। ট্যাক্সি রাজবল্লভপাড়ায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দাঁড়ায়। তপেশ ভৌমিকের সঙ্গে সঙ্গে আমি চারতলায় পৌঁছই। ও বেল দেয়। দরজা খোলে এক প্রৌঢ়। বলে— তোমরা এসে গেছ। এসো।

ভেতরে ঢুকি আমরা। সাদা-মাঠা ড্রইংরুম। দুটো সিঙ্গল কাউচ মুখোমুখি। মাঝে ছোট কাঠের টেবিল। এক পাশে টিভি সেট। তার উল্টো দিকে একটা ডিভান। আমরা কাউচে বসি। প্রৌঢ় বলে— কিন্তু ভাই তপেশ, আমার যে একটু কাজ আছে বাইরে। তোমার কি একটু অপেক্ষা করার সময় আছে?

BanglaBook.org

তপেশ বলে— হ্যাঁ, আমার সময় আছে। কিন্তু দেবারতির ...

—কতক্ষণ?

আমি জিগ্যেস করি।

প্রৌঢ় বলে— এই আধঘণ্টা।

—ঠিক আছে। তার বেশি কিন্তু নয়।

—মা জননী, লেখা ছাপতে গেলে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে? হা হা হা! বললাম বলে কিছু মনে কোরো না যেন।

এ রসিকতা পছন্দ হয় না আমার। একমাত্র আমিই জানি উপন্যাস ছাপবার জন্য আমি কোনও তাড়াহুড়ো করিনি। ইচ্ছে করে উঠে চলে যাই। কিন্তু ভদ্রতায় বাধে। তপেশ আমার মুখ দেখে অপছন্দ আন্দাজ করে। কপট ধমকে ও বলে— সোমদা আপনার এই বাজে রসিকতাগুলো ছাড়ুন। দেবারতি আজ আপনাকে প্রথম দেখছে।

সোমদা জিভ কাটে। দু'কানে হাত দেয়। বলে— সরি ম্যাডাম। আপনার লেখাটা কিন্তু দারুণ। এসে বলছি। তপেশ, আমার জিনিস কোথায়?

তপেশ ঝোলা থেকে বেড়াল বের করার মতো হাতে আনে একটি বস্তু। খবরের কাগজে মোড়া। আকার দেখে আন্দাজ হয়, বোতল। আমি কিছু মনে করি না তার জন্য। তপেশ সোমকে মদের বোতল দিলে আমার কী! তার ওপর ও আবার শ' ওয়ালেসে চাকরি করে।

সোম পরম সন্তোষে বোতলটা ভিতরের ঘরে রেখে বেরিয়ে যায়। তপেশ উঠে দরজার ছিটকিনি আটকে ফিরে আসে। আচমকাই আমার দু'হাঁটু আঁকড়ে বসে পড়ে মেঝেয়।

আমি আঁতকে উঠি। বলি— এ কী! এ কী করছেন!

এতক্ষণে বুঝতে পারি আমি, সবটাই সাজানো। আলোচনার নামে আমাকে আনা, সোমের বেরিয়ে যাওয়া, এবং হয়তো ওই বোতল উপহার পর্যন্ত। রাগে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে ওঠে। চিৎকার করি— ছি ছি ছি! ছাড়ুন! ছাড়ুন আমাকে।

ও আরও শক্ত করে চেপে ধরে আমার উরু। বিকারগ্রস্তের মতো বলতে থাকে— আই ওয়ান্ট টু সি মাই মাদার! একবার। মাত্র একবার।

আমি গোড়ালিতে চাপ দিয়ে হঠাৎ পিছিয়ে নিই কাউচ। ক্যাঁচ শব্দে তা সরে যেতেই তপেশ মুখ থুবড়ে পড়ে। আমি ছিলা-টান উঠে দাঁড়াই। এক যুদ্ধের আভাসে চূড়ান্ত প্রস্তুত করি মস্তিষ্ক। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই নিজেকে মল ও পোকাভর্তি গর্তের ওপর ঝুলন্ত এবং আমার মুখোমুখি গোদা হিংস্র কুটিল ধেড়ে

BanglaBook.org

ইঁদুর। মুহূর্তমাত্র। ইঁদুর লাফ দেয়। আত্মরক্ষার জন্য আমি দৌড়ই। ইঁদুরও দৌড়য়। বলতে থাকে— দেবারতি, তোমাকে বিখ্যাত করে দেব। সবাই তোমাকে জানবে। দেবারতি, দাও, দাও, আমাকে দাও। আচ্ছা, আমি ধরব না। শুধু দেখব।

কাউচ ঘিরে চলতে থাকে এক আশ্চর্য গোল্লাছুট খেলা। এক রাউন্ড, দু'রাউন্ড, তিন রাউন্ড— চতুর্থ পাকে ধরে ফেলে আমায় ইঁদুর। এক ধাক্কায় ডিভানে ফেলে দেয়। পড়তে পড়তে আমি টের পাই হাঁটুতে কঠিন পুরুষাঙ্গের ঠেলা। দু'হাঁটু টেনে জোড়া পায়ে সটান লাথি মারি ওর তলপেট বরাবর। আক্ শব্দ করে পেট চেপে ধরে ও। আমি উঠে দাঁড়াই। ফিরে আক্রমণ করার সাহস হয় না ওর। নেংটি ইঁদুরের মতো লটপট করে ও। দাঁতে দাঁত ঘষি আমি। ইচ্ছে করে দুই নখে উকুনের ডিমের মতো টিপে মারি ওকে। একদলা থুতু ফেলি বেসিনে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসি সটান। সিঁড়ি টপকাই দ্রুত। পথে নেমে বিধ্বস্ত লাগে আমার। আমি ধুঁকতে ধুঁকতে চলি। কোনও বোধ কাজ করে না। আমার উপন্যাস ছাপা হবে না। তার জন্য দুঃখ হয় না আমার। আমি ধর্ষিত হতে পারতাম, হইনি। বাবা-মা আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছে। আমার গা গুলোয়। বমি পায়। বাড়ি ফিরে বহুক্ষণ ধরে সাবান ঘষে ঘষে স্নান করি আমি। একটুও কান্না পায় না আমার। আমি কেবল ঘৃণার সঙ্গে সাবান ঘষি গায়ে। আজ আমি ধর্ষিত হতে পারতাম। হইনি।

হায়! বোঝার তখনও বাকি ছিল আমার। ধর্ষণ শুধু শরীর দ্বারা শরীরের নিগ্রহই নয়। আরও সহস্র উপায়ে ধর্ষিত হতে পারে কোনও মেয়ে।

আমিও হতে থাকলাম।

এ ঘটনার কথা কারওকে বলিনি আমি। কাকে বলব? এখানে কে আছে আমার? দিদি একমাত্র। কিন্তু ওকে বললে ও ভয় পেয়ে যাবে। তা ছাড়া চাপা স্বভাব আমার। আজন্মকালের স্বভাব। আমার মনে আছে, তেরো বছর বয়স তখন আমার, ক্লাস এইটে পড়ি, আমি আর দিদি ঘুমোচ্ছি রাতে, গ্রীষ্মকাল। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে খুব কাশি উঠল আমার। দারুণ দমক। গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠছে কী একটা। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বমি পাচ্ছে। কষ্ট, কাশি, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা মিলে প্রাণান্ত হতে হতেও দিদিকে ডাকিনি। মা-বাবাকে ডাকিনি। ছটফট করতে করতে গলায় আঙুল দিয়েছি, লম্বামতো কী একটা বস্তু উগড়ে উঠল, নড়ছে ওটা, আমি দু'আঙুলে টেনে মশারি তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। আবার আঙুল দিলাম। আরও একটা। লম্বা কেঁচোর মতো জীবন্ত বস্তুগুলো যে কৃমি, বুঝতে পারলাম আমি। বিছানা থেকে নেমে ভাল করে মুখ ধুয়ে জল খেলাম।

BanglaBook.org

ঘাড়ে-মাথায় জল দিলাম। একটু সুস্থ লাগল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেও কারওকে বলিনি। বাগানে গিয়ে দেখি, জানালার নীচে পড়ে আছে দুটো সাদা লম্বা, প্রায় ছয়-সাত ইঞ্চির কৃমি। কেঁচোর মতোই। ওতে পিঁপড়ে লেগেছে।

আজও কেউ জানে না, তেরো বছর বয়সে, এক মধ্যরাতে, আমার মুখ দিয়ে দুটো প্রমাণ সাইজের কৃমি বেরিয়েছিল। অথচ সে-রাতে শ্বাসনালীতে কৃমি আটকে আমি মারাও যেতে পারতাম।

গোপনে কৃমি ওগড়ানোর মতোই আমি চেপে ছিলাম সেদিনের কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে থাকা গেল না। কারণ সে-ঘটনার দু'দিন পর থেকে ঠিক সন্ধ্যায় এক আশ্চর্য ফোন আসতে লাগল।

ফোনটা আমাকে চায়। আমি ধরি। স্পষ্টত টের পাই তপেশের গলা। ও বলে— যতখানি ভাবো, ততখানি গৌরী তো তুমি নও দেবারতি।

—কেন আপনি ফোন করেছেন?

আমি রাগত জিগ্যেস করি। ঘরের সকলে আমার দিকে তাকায়। আমি বলে চলি— কখনও আপনি আমাকে ফোন করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

ফোন রেখে দিই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজে। ধরি। ও প্রান্ত বলে— সব খানকি কাপড় তোলে। তুমি কোথাকার কে? তুলবে না?

এর পর অশ্রাব্য গালি-গালাজ করে ও। আমি রেখে দিই ফোন। সারা শরীর দিয়ে আগুন ছুটে যায় আমার। অপমানে কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমে যায়। আমি টলতে টলতে সোফায় বসে পড়ি। মাধবী জিগ্যেস করে— কে? কী বলছিল?

শিবানন্দ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি বলি— খারাপ কথা বলছিল।

—কেন? কে?

—এক পত্রিকা সম্পাদক।

—খারাপ কথা কেন বলছিল?

—অশালীন ব্যবহার করেছিল আমার সঙ্গে, আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই।

—কোথায় যাও, কার সঙ্গে মেশো, যত বদলোকের সঙ্গে তোমার ওঠা-বসা। ছি ছি।

মাধবী উত্তপ্ত হয়। আমি নীরবে হজম করি। শিবানন্দ বলে— ওই সম্পাদকের কাছে কেন গিয়েছিলে?

BanglaBook.org

—ওরা একটা ভাল পত্রিকা করে। আমি একটা উপন্যাস লিখেছি, জমা দিতে গেছিলাম।

আমি বলি।

মাধবী ভেংচে ওঠে— উপন্যাস লিখেছি! দিন-রাত নেই সুযোগ পেলেই ঘাড় গুঁজে লিখবে কীসব আর নোংরার মধ্যে জড়াবে। ছি ছি ছি! বাড়িটাকে নরক করে দিল। ও বিয়ে হয়ে আসা অবধি এ বাড়ির সব শান্তি গিয়েছে।

আমি উঠে নিজের ঘরে চলে যাই। মাধবী বেরোয় ঘরে ঘরে কাঁদুনি গাইতে। ওপরে নীচে জ্ঞাতিরা উদগ্রীব হয়ে শোনে। টেলিফোনের নিখুঁত জালচক্রে খবর চলে যায় মাসি-পিসিদের বাড়ি। অনেক দিন পর আমাকে নিয়ে উন্মত্ত আলোচনায় মাতবার সুযোগ পেয়ে যায় ওরা। রাত্রে নীল বাড়ি ফিরলে, নির্মলদা ফিরলে, মাধবী কাঁদা-কাটা করে। আমার মতো একটা জীব এ বাড়িতে আসার জন্য শাপ-শাপান্ত করে নিজেকে। নিজের ভাগ্যকে। নির্মলদা আমাকে জিগ্যেস করে কী হয়েছে! আমি ওইটুকুই বলি। ও বলে— কী অশালীন ব্যবহার?

আমি জবাব দিই না। যেন কী অশালীন ব্যবহার— তা না জানা পর্যন্ত অপরাধের মাত্রা বোঝা যাবে না। যেন প্রত্যেকেই এক-একটা আদালত যে প্রকাশ্যে ধর্ষণের বিবরণ প্রত্যাশা করে। আমার নৈঃশব্দ বাড়ির পরিবেশকে গম্ভীর করে আরও। কী? কতদূর? গলা অবধি? বুক অবধি? নাভি অবধি? কতদূর? কতদূর আমি ডুবেছিলাম? জল্পনা হয়। পরের দিন ফোনটা আবার আসে। বার-বার আসে। যে ধরে, অশ্রাব্য কথা শোনে আমার সম্পর্কে, রেখে দেয়। আবার আসে। এরকমই চলতে থাকে রোজ। আমি অসহায় বোধ করি। নীল আমাকে আশ্রয় দেয় না। কেউ আমাকে সাহস দেয় না। শুধু জটলা। নিন্দে। ফিসফিস। গুজগুজ। আমার খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়। ঘুম চলে যায়। ফোন বাজলেই বুকে হাতুড়ি পিটতে থাকে। হাত-পা ঘামে। টেলিফোনের শব্দ ত্রাস হয়ে ওঠে আমার কাছে। আমার আত্মসম্মান কুঁকড়ে যায়। আত্মবিশ্বাস মুখ থুবড়ে পড়ে। ভীষণ ভয় করে আমার। এবং ভয় করে বলে নিজের ওপর ঘেন্না হয়। এই ভেবে আমার হাঁটুর কাঁপন বন্ধ হয় না যে আমি অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করিনি। গোটা বাড়িটাই— আমি এবং আমার উপন্যাসধর্মকে অভিযুক্ত ভেবে তৃতীয় পক্ষ হয়ে ওঠে। কোনও সহানুভূতিহীন, আশ্বাসহীন, একা আমি সকল প্রহার ঠেকিয়ে যেতে থাকি কেবল। সফল হই না। ওরা বলে— কোনও দোষই কি নেই?

— এক হাতে কি তালি বাজে?

BanglaBook.org

— প্রশ্রয় কিছু দিয়েছিল নিশ্চয়ই।

— কেন যায় ওইরকম পরিবেশে!

সমস্ত মন্তব্য আমার বুকের তলায় দাগ কেটে-কেটে বসে যায়। ফোনের মতো ফোন আসে। ক্ষত বিষিয়ে ওঠে আমার। কেউ বলে পুলিশে খবর দাও। কেউ বলে গুণ্ডা দিয়ে মারো। কিন্তু হয় না কিছুই।

অবশেষে দশ দিনের দিন শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে মেজ তরফের ছোট ছেলে টুকুন এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। আমারই বয়সি বলে আমাদের সম্পর্কটা তুই-তোকারির। এখনও বেকার টুকুন গান-বাজনা নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে কেউ ওর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। কোনও আলোচনায় ও থাকে না। নিজের মতো উদাসীন জীবন-যাপনের মধ্যে ও হঠাৎ কোথা থেকে কী শুনে ক্ষেপে ওঠে। দাঁড়ায় আমার সামনে। বলে— কীরে শানু! তোকে নাকি কে রোজ গালাগালি দিচ্ছে ফোনে। কী ব্যাপার?

ওর গলায় সহানুভূতি। আমাকে বুঝতে চাওয়ার স্পষ্ট আর্তি। এটুকু ভিজিয়ে দেয় আমাকে। গলিয়ে দেয়। এই ক'দিন আমি শক্ত হয়ে ছিলাম। আধপাগলা, উদাসীন টুকুনের কাছে দাঁড়িয়ে আমার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। চোখ উপচে জল আসে। আমি রুদ্ধ গলায় বলি— বিশ্বাস কর, আমার কোনও দোষ নেই। কেউ আমাকে বুঝতে চাইছে না।

কান্নার বেগ অসমুদ্র হয়ে উঠলে আমি দু'হাতে মুখ চাপি। পাগলা টুকুন, যার সঙ্গে আমার সামান্য ঘনিষ্ঠতাও নেই জ্ঞাতি সম্পর্কের ভদ্র স্বীকৃতি ছাড়া, মাধবী-নীল-শিবানন্দ-নির্মলদা-সঞ্চিতা ইত্যাদির জমায়েত পরোয়া না করে সর্বসমক্ষে আমার মুখ ওর বুকে টেনে নেয়। আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে— শানু, কাঁদবি না, কাঁদবি না একদম। তুই তো দুর্বল না। একটা লোক বদমায়েশি করছে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। ব্যস।

ওর চওড়া হাড়-সর্বস্ব বুকের মধ্যে থেকে হৃদধ্বনি আমার শ্রবণে পৌঁছয়। ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে যায় বসার ঘরে। ও ঘরেই থাকে ফোন। বলে— চোখ মোছ। ফোন এলে তুই ধরবি। তারপর আমাকে দিবি।

এবার জমায়েতের উদ্দেশে বলে— তোমরা কেউ সামনে থেকো না। শুধু আমি আর শানু। কাঁটার জবাব কাঁটায়।

জমায়েত বসার ঘরে থাকে না কিন্তু এ কোণে ও কোণে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করে। ফোন আসে। আমি ধরি। ও প্রান্তে উচ্ছ্বসিত গলা— চাঁদবদনী! আজ তুমি! মত পাল্টেছ? কবে কাপড় তুলবে বলো! বলো!

BanglaBook.org

আমি নিঃশব্দে ফোন দিই টুকুনের হাতে। ও ফোন নিয়েই বাছা বাছা খিস্তি শুরু করে। অশ্রাব্য। অসহ্য।

কতক্ষণ— কতক্ষণ আমি জানি না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকি। টুকুন ওর সমস্ত সম্ভার খালি করে না দেওয়া পর্যন্ত থামে না। ওর গলা চড়ে। ক্রমশ চড়ে। শুনতে শুনতে আমার মনে হয় ওর বাহ্যজ্ঞান নেই। আমি মুখ থেকে হাত সরাই। তাকাই ওর দিকে। ওর এক হাত শূন্যে দুলছে। অন্য হাত কানে চেপে আসে রিসিভার। ওর মুখ থেকে থুতু ছিটকোচ্ছে।

শিবানন্দ আসে। রিসিভার নেয় টুকুনের হাত থেকে। শোনে। রেখে দেয়। কখন লাইন কেটে গেছে টুকুন জানে না।

এবং সেই ফোন আর আসে না কোনও দিন। তবু টেলিফোনের আতঙ্ক আমার থেকেই যায়। টেলিফোন বাজলেই তার কুরুক-কুরুক রিং টোন আমার মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। দীর্ঘকাল। টুকুনের ওপর দারুণ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠি আমি। এক একাকী দুপুরে, ও দেখি বারান্দায়। আমি ডাকি ওকে জানালা দিয়ে— টুকুন শোন।

ও হাসে। বলে— কী রে?

—ভেতরে আয়।

ও আসে। বলে— কী বল!

আমি ওর দুটো হাত নিজের হাতে নিই। বলি— টুকুন, তোর কাছে দারুণ কৃতজ্ঞ আমি। আজন্মকাল ঋণী হয়ে থাকলাম তোর কাছে।

ও আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরে আমাকে। অনেক লম্বা ও। ওর বুকে আমার মাথা। আশ্চর্য শান্তি লাগে আমার। আমিও ওকে জড়িয়ে ধরি নিঃসঙ্কোচে। আমার বিমর্ষ, বিষণ্ণ, অন্ধকার ঘরে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে অপূর্ব পুলক জাগে আমার। অনির্বচনীয় আনন্দ হয়। কেন হয় আমি জানি না। ও প্রায় ফিসফিস করে বলে— পাগলি, তোকে এ বাড়িতে কেউ বুঝল না। পাগলি, তোকে আমি খুব ভালবাসি রে। একেবারে সেই দিন থেকে, বড়দার বিয়েতে যখন তোকে প্রথম দেখলাম।

আমি ওকে আঁকড়ে ধরি। ও ওর বুকে আরও জোরে চেপে ধরে আমার মাথা। বলে— বলিনি কখনও। বলিনি কারণ আমি তো চাকরি করব না কখনও। বিয়েও করব না।

আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিই আমরা পরস্পরকে। ও আমার দুই গাল ধরে বলে— কোনও ঋণ, কোনও কৃতজ্ঞতা নয়। আসলে তোর জন্য আমার খুন করা উচিত ছিল।

BanglaBook.org

আমার জিগ্যেস করা হয় না, জানা হয় না, কাকে খুন করলে তৃপ্তি হত ওর! কাকে?

ও চলে যায়।

সেই উপন্যাস আমার। সেই। এ উপন্যাস আমি লিখেছিলাম। কেন লিখেছিলাম? কী দিয়ে লিখেছিলাম? কেন লেখে মানুষ? কোন তাড়নায়? কোন কোন কথা বুকে জমতে জমতে, জমতে জমতে অক্ষরের মধ্যে দিয়ে জারি করে আত্মপ্রকাশ? সে কে? সে কে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম রচনা এবং অবশিষ্ট

সে জীবন। সে জীবন। সে এক আহত, বিক্ষুব্ধ, বিস্মিত পরান— নিভৃতে টেনে আনে। সাদা কাগজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। লেখায়। কিংবা জিনের মধ্যে জড়ানো নিহিত ইচ্ছা অভিব্যক্তির! ইচ্ছা— যা ব্যথিয়ে ওঠে, টনটনিয়ে ওঠে বিস্ফোটকের মতো, অথবা ভূমিগর্ভে ঘনিয়ে ওঠা ম্যাগমা, লাল তপ্ত লাভা, বিস্ফোরণের মধ্যেই যার মুক্তি, চূড়ান্ত পরিণতি। এ বোঝা শক্ত। জানা অসম্ভব। জীবনের বিচিত্র উদ্ভাসের বহুবিধ ব্যাখ্যা দেয় মানুষ। খাড়া করে একটা কিছু। কোথাও তা সত্য, কোথাও নয়।

জীবন কী, আরও সহস্র বৎসরের সহস্র মানুষের মতো আমিও ভাবতে চেষ্টা করি মাত্র। বুঝতে চেষ্টা করি। বুঝি না। কখনও মনে হয়, জীবন আসলে নিভৃত প্রাণের নিরুচ্চার সংলাপ। অর্থনিরপেক্ষ আত্মকথন। অন্ধকার মঞ্চে, মাত্র একটি স্পটলাইটের গোল বৃত্তে ধরা, একজন মাত্র অভিনেতার উচ্চারিত নিখুঁত সলিলকি। অর্থসাপেক্ষে ওই সব একাকী সংলাপ এক সংযোগ। উন্মুখ উৎকর্ণ বিহ্বল অসহায় দর্শকের সঙ্গে অসহায় বিহ্বল উদ্বেল উন্মুখ অভিনেতার সংযোগ। আরও বড় করে ভাবলে একাকী প্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগ। শেষ পর্যন্ত এই মাত্র উদ্দেশ্য জীবনের—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ।

এ ভাবে ভাবলে জীবনের এক নিবেদন থাকে। নিজেই সে নিজেকে সাজিয়ে নেয় স্বপ্নে ও সৌন্দর্যে। নিজেই নিজেকে গড়ে তোলে স্বকীয়তায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন বাধ্যতামূলক ধারণা। জীবন আসলে আত্মার মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব, চিরায়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এর গড়ে ওঠার কোনও মানে হয় না, সেজে ওঠার কোনও মানে হয় না, ফুরিয়ে যাওয়াই এর একমাত্র পরিণতি।

এই ভাবনারই দ্বারা প্রতাড়িত আমি, প্রতাড়িত, কোনও স্বপ্ন দেখি না, খুঁজি না সরলরৈখিক পথের আরাম ও নিরাপত্তা। সেই এক ঘোর বুকে করে মায়ের সঙ্গে আমি কলকাতায় পৌঁছই। ঋতবাদের ঘোর। পথে পথে খোলামকুচির মতো ছড়াই নিজেকে।

BanglaBook.org

মা কিছুই চেনে না কলকাতার। আমিও চিনি না। হাওড়া স্টেশন থেকে নির্মলদা আমাদের ওর বাড়িতে নিয়ে আসে। কলেজে কলেজে ঘুরে ফর্ম যোগাড় করা, ভর্তির জন্য আবেদন করা ইত্যাদির জন্য দিদি আর নির্মলদা আমাদের নীলের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেয়। ইংরাজিতে অনার্স পড়ছিল ও। রাখতে পারেনি। সাধারণ গ্রাজুয়েট হয়েছে। এম বি এ করছে শুনলাম। একটা ইন্সটিটিউটের নামও বলে ও। আমি অনাগ্রহে শুনি। ভুলে যাই। ও আমাদের সাহায্য করে। ভিড় বাসে উঠতে সাহায্য করে। গাড়িভর্তি রাস্তা পেরোতে সাহায্য করে। এত ভিড়ে আমরা ধাক্কা খাই। হাঁসফাঁস করি। দিশেহারা হয়ে যাই পথ পেরোতে। ও আমাকে আর মাকে দু'হাতে নিয়ে নেয়। লাইন দিয়ে ফর্ম তোলে বি কে সি কলেজ থেকে, স্কটিশ থেকে, সিটি কলেজ থেকে, বিদ্যাসাগর থেকে। কী সুন্দর দেখতে ওকে! মা বলে জেসাস ক্রাইস্টের মতো। মা মুগ্ধ হয়ে যায়। কী ভদ্র সুন্দর ওর ব্যবহার। মা ওকে ভালবেসে ফেলে। বলে— নির্মলের ভাইরা সবাই ভাল। কিন্তু নীলুর কোনও তুলনা হয় না।

আমার মনে হয় না কিছুই। ওর সুপৌরুষ, ক্রিকেট ব্যাট ধরা চওড়া কব্জি, স্মার্টনেস, সুন্দর ব্যবহার, এম বি এ ডিগ্রির সম্ভাবনা— কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ লাগে না আমার। আমি অপেক্ষা করি, মা কবে আমাকে হস্টেলে রেখে ফিরে যাবে উজানিনগরে, আমি দীপায়নের সঙ্গে যোগাযোগ করব। দীপায়ন আমাকে নিয়ে যাবে ঋতবানের কাছে। আমি ঋতবানকে একবার জিগ্যেস করব, ও কেন আমার সঙ্গে এরকম করল।

স্কটিশ চার্চ কলেজটা মা-র খুব পছন্দ হয়ে যায়। বড় বড় মোটা গোল থামওয়ালা পুরনো ইউরোপীয় স্থাপত্য। খোলামেলা চত্বর। বিশাল অ্যাসেম্বলি হলে স্কাইলাইট দিয়ে ঢুকে পড়া মায়াবী আলো। এক পাশে একটা বড় পিয়ানো বেজে ওঠে প্রতিদিন সকালের প্রার্থনার সময়। সবুজ সুন্দর লনের এক দিকে কেমেস্ট্রি বিল্ডিং, অন্য দিকে ফিজিক্স।

মা আমাকে বলে— শানু, তুই এখানেই পড়।

আমি রাজি হয়ে যাই। আমার কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই। আমি শুধু এখানে থাকতে চাই একবার ঋতবানের মুখোমুখি হব বলে। অতএব অঙ্কে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে যাই আমি। থাকার জায়গা পাই ভি এল মিত্র ইউ জি হস্টেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব হস্টেল বলে এখানে খরচ কম। সব ব্যবস্থা করে, নির্মলদাকে লোকাল গার্জিয়ান করে মা ফিরে যায়। আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এক অনিবার্য ভবিতব্য। তার নাম শহর কলকাতা। আমি হস্টেলের

BanglaBook.org

তিনতলায় কুড়ি নম্বর রুমের জানালা দিয়ে তাকে দেখি। বাড়ির পর বাড়ি, তারপর আরও বাড়ি, ঘেঁষাঘেঁষি ইটের অট্টালিকা। যত দূর চোখ যায়, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ ধূসর হয়ে থাকে। সমস্ত বাড়ির মাথায় দুটো-তিনটে-চারটে অ্যান্টেনা। তার ওপর পায়রা এসে বসে। কাক বসে। চড়ুই, শালিক। ও পাশের বাড়িতে গোলগাল মহিলাটি দুটি বিশাল আকারের কুকুর জড়িয়ে জানালার কাছে বসে। কুকুরদের পোকা বেছে মেঝেয় টিপে টিপে মারে। মেঝে থেকে প্রায় ছাত অবধি উঁচু উঁচু সব জানালা। তাই দিয়ে দেখতে পাই ও বাড়ির পুরুষটি, সম্ভবত ওই মহিলার বর— দুটি বালককে প্রহার করে। বেল্ট দিয়ে, জুতো দিয়ে মারতে মারতে মেঝেয় ফেলে দেয়। তারা আর্তনাদ করে নিশ্চিতই। কিন্তু তা আমার শ্রুতিগোচর হয় না। আমি কেবল দেখি ওদের প্রতিরক্ষা। দুই পা তুলে দুই হাত তুলে তারা আঘাত আড়াল করতে চায়। কুকুর দুটিকে দেখতে পাই না তখন, মহিলাকেও দেখি না। কেবল শেষের জানালায়, গরাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা এক বুড়ি বার বার জোড় হাত কপালে ঠেকায়। ঈশ্বরের কাছে বালক দুটির প্রাণ ভিক্ষা করে সম্ভবত।

লোকটি ওদের মারে কেন আমি জানি না। ওরা কি খুবই দুষ্টামি করে? ভেঙে ফেলে কাঁচের বাসন? দেশলাই জ্বেলে কুকুরের লেজ পুড়িয়ে দেয়? একটা আস্ত কুকুরকেও ওরা পুড়িয়ে মারে কি আমাদের পাড়ার দীপুদার মতো?

মিলিদিদের কুকুর দীপুদার পোষা পায়রা খেয়ে ফেলল একবার। চেঁছে-পুছে খেল। ষন্ডামতো ছিল কুকুরটা। আমাকে তাড়া করেছিল এমন, আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। সেই কুকুর দীপুদার পায়রা খেল। আহা! সাদা সাদা ফুলের মতো সব পায়রা।

শেষ পায়রার মুণ্ডুটা যখন কচকচ করে খাচ্ছে ও, চার পাশে ছড়ানো রক্তমাখা পালক, হাতে-নাতে ওকে ধরে ফেলল দীপুদা। হাউহাউ করে কেঁদেছিল ও। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিল। ওর মতো বেপরোয়া, ডানপিটে আর কেউ ছিল না পাড়ায়। ওকে ওভাবে কাঁদতে দেখে গোটা পাড়া স্তম্ভিত হয়ে ছিল। মিলিদির বাবা হরেনজেঠু বলল— কাঁদিস না দীপু। আবার তোকে পায়রা কিনে দেব আমি। তোর যতরকম ছিল, সব।

দীপুদা আড়ালে আমাদের বলল— বাজের পায়রা। ওর পায়রায় আমি মুতে দিই।

দিন চলে যায়। এক সপ্তাহ। দশ দিন। হরেনজেঠু পায়রা কিনে দেবার নামও করে না। এর মধ্যে দু-দুটো হাটবার চলে গেলে আমরা মুক্তি-কামী হয়ে যাই।

BanglaBook.org

হাটবার ছাড়া হরেনজেঠু পায়রা পাবে কোথায়? দীপুদা তিক্ত হাসে। পায়রার শূন্য খাঁচা পরিষ্কার করতে করতে বলে— তোরা এখনও আশা করিস হরেনটা আমায় পায়রা দেবে?

—হরেন কী দীপুদা, হরেনজেঠু বলো।

—বালের জেঠু! শুনে রাখ, বয়সে বড় হলেই সে কাকা-জেঠু হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। শুনে রাখ তোরা, আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

দীপুদার মুখে পরিকল্পনা খেলা করে। কিছু ভাঙে না ও। আমরা টের পাই, কুকুরের প্রতি ওর যত রাগ সব হরেনজেঠুর ওপর পড়েছে। মিলিদির ওপরও। কারণ দীপুদা ও মিলিদির কথা বন্ধ এখন। আমরা জল্পনা করি, কী কী করতে পারে ও। গুলতি মেরে হরেনজেঠুর টাক ফাটিয়ে দিতে পারে। অব্যর্থ লক্ষ্য ওর। কিংবা মিলিদির গায়ে ছুড়ে দিতে পারে নির্বিষ ঘেন্টিসাপ! কিন্তু দীপুদা ওসব কিছুই করে না। এক সন্ধ্যায় একা একাই মদেশিয়া বস্তি থেকে শুয়োরের মাংস আনে ও। এই এক সময় যখন কুকুরটা পথে বেরোবেই। আমাকেও তাড়া করেছিল এ সময়। জ্বর হয়েছিল বলে দু'দিন স্কুলে যাইনি। তাই মনার কাছে পড়া জানতে যাচ্ছিলাম। কুকুরটা সেই সুযোগ নিয়েছিল। মিলিদি বলেছিল— ও তো কারওকেই কিছু করে না। হঠাৎ তোকে...

কে জানে, হয়তো আক্রমণ-আক্রমণ খেলার ইচ্ছে হয়েছিল। আমাকে ছোট মেয়ে পেয়ে, একলা পেয়ে পথে, সুযোগ নিয়েছিল। দীপুদাও সেই সুযোগটা নিল। ওর একলা ঘোরার সুযোগ, ওর মাংসের লোভ।

ওর সামনে ছড়িয়ে দিল মাংস। ও খাচ্ছে সপ্-সপ্ করে। নির্জন পাড়া। দীপুদা বোতল থেকে কেরোসিন ঢালল ওর গায়ে। ও কুঁই-কুঁই করল একটু। তবু গেল না। মাংসের লোভ। এবার দীপুদা একটা জ্বলন্ত দিয়াশলাই ছুড়ে দিল ওর গায়ে।

উ-উ-উ-উ করে আর্তনাদ তুলছে ও। ছুটছে। পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা। যত ছুটছে তত বেশি করে ধরে যাচ্ছে আগুন। পাড়ার সব লোক বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। কী হল! কী হল! সবাই দেখল। আমিও দেখলাম। হরেনজেঠুরাও দেখল। জ্বলতে জ্বলতে, ছুটতে ছুটতে ধপ করে পড়ে গেল জিমি!

কী ধরনের দুষ্টামির শাস্তি হতে পারে এমন প্রহার, না বুঝে, আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলি। মারামারি আমার সহ্য হয় না। বাবা যতই রাগ-জেদ করুক, মারেনি আমাদের। চড়-চাপড়-লাঠির বাড়ি মা-ই বরং দিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এই মারের কোনও তুলনাই হয় না। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। উজানিনগরের সবুজ বন মনে পড়ে, গাঢ় নীল আকাশ মনে পড়ে, অরণ্যরেখার ওপর জমে থাকে

BanglaBook.org

কালো মেঘ এবং দূরের সোনালি-রুপোলি পাহাড় থেকে ঝর্না নামে। মাকে মনে পড়ে আমার। মায়ের রান্না। ডালের বড়া দিয়ে শশার তরকারি, লাউ দিয়ে কাঁচা মুগের ডাল, কুমড়ো ফুলের বড়া। এখানকার খাবার খেতে পারি না আমি। ভাতে বোঁটকা গন্ধ লাগে। ডাল বিস্বাদ। মাছের ঝোল সাবান গোলা জলের মতো। আমি ডাইনিং হল থেকে ভাতের থালা ঘরে নিয়ে আসি। সামান্য খাই। বাকিটা জানালা দিয়ে কাককে দিই। সেই সব কাক, যারা অ্যান্টেনায় বসে থাকে, তারা আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। হস্টেল থেকে কলেজ দু'মিনিটের পথ। আমার অনেক সময়। আমি একলা ঘরে বসে থাকি। ওরা উড়ে এসে আমার জানালা বরাবর ঝুলে থাকা সিমেন্টের কার্নিশে বসে। জিগ্যেস করে— কী ব্যাপার? কলেজ যাওনি?

—যাব।

বলি আমি। ভাত দিই। মাছের টুকরো দিই ওদের। ওরা মুখ ভর্তি করে খায়। বলে— কী ভাবছ?

—বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

—কী কথা?

—বিশেষ কিছু না। বাড়ির উঠোন। মায়ের শাড়ি শুকোচ্ছে। সেই অন্ধকার কোণটা, যেখানে মা দই পাতে, সেই টেবিলটা, যেখানে অফিস থেকে ফিরে চশমা রাখে বাবা, কলম রাখে।

—তা বটে।

ওরা গম্ভীর মুখে ডানা ঝাপটায়। ঠোঁট মোছে কার্নিশের ধারে। স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি বলি— আর বড়দা-ছোড়দাকেও মনে পড়ে। ওদের তর্ক। রেডিওতে কান লাগিয়ে কমেন্টারি শোনা...

—অ্যান্টেনা নেই বুঝি? ওখানকার কাকেরা কী করে?

—টিভি নেই, তাই অ্যান্টেনা নেই। টিভি একটা আসবে হয়তো এ বার। পাড়ায় অনেক বাড়িতেই এসে গেছে। কাকেরা ওখানে গাছের ডালই বেশি পছন্দ করে। টিনের চালেও বসে।

—মন খারাপ?

—হুঁ!

ওরা একটু ঝিমোয়। আমি বই-খাতা গুছিয়ে নিই। একজন গলা বাড়ায়— কী ভাবছ?

—কীসের?

—ফিরে যাবে? এত মন খারাপ...

BanglaBook.org

—না। ফিরে যাব না।

—কেন?

—মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিলাম, উচ্চমাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন। ওখানে ফেরা আমার উচিত নয়।

—শুধু এই?

আমি বেরিয়ে আসি। চুপ করে বসে থাকি ক্লাসের থার্ড বেঞ্চে। আলাপ-পরিচয় হয়। এবং এক নতুন উপসর্গ দেখা দেয় আমার মধ্যে। ভয় করে। এই বুঝি কেউ আমায় জিগ্যেস করবে, কত নম্বর পেয়েছি উচ্চমাধ্যমিকে! কেউ কেউ জিগ্যেস করেও ফেলে। জবাব দিতে জিভ জড়িয়ে আসে আমার। নিজেকে খারাপ লাগে, ক্লাসের তিপ্পান্ন জনের মধ্যে নিজেকে তিপ্পান্নতম মনে হয়। আমার মতো দিব্যেন্দুও থার্ড বেঞ্চে বসে থাকে চুপচাপ। উচ্চমাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশান ও মাধ্যমিকে সত্তর শতাংশে মনমরা। খুব নিরুৎসাহে ও ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকায়। আমিও। নোট নিই। খুঁজতে থাকি কোন স্যারের কোচিং-এ পড়া যায়। ক্লাসে যে-যার মতো দল করে নেয়। আমি আর দিব্যেন্দু পড়ে থাকি কেবল। খুঁজে পেতে সত্যসাধনবাবুর কোচিং-এ ভিড়ি আমরা। ঘুপচি ঘরে একসঙ্গে কুড়িজন পড়তে বসি। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ইয়ার মিলেমিশে যায়। বেঞ্চে জায়গা হয় না। দিব্যেন্দুর গায়ের ঘাম লেগে যায় আমার গায়ে। আমার ঘাম লাগে কল্লোলের গায়ে। কনুইয়ে কনুই ঠেকে যায়। লিমিট এক্স টেনডস টু জিরো লিখে বসে থাকি চুপচাপ। এখানে পড়াও যায়, না পড়ে চুপ করে থাকাও যায়। ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের পাতা খুলে রূপ দেখি। লিবনিৎজ থিয়োরেম পড়ি এক ঘন্টা ধরে। অ্যাস্ট্রোনমির যে-কোনও একটা পাতা খুলে মার্জিন দাগাই। একটাই সুবিধা। সত্যসাধনবাবুর কাছে টাকা লাগে কম। বাবা তিনশো টাকা পাঠায়। সত্তর টাকা হস্টেলের মেস খরচ। পঁচিশ টাকা ভাড়া। সত্যসাধনবাবু নেয় একশো টাকা। বাকি একশো টাকায় আমার ব্রেকফাস্ট, টিফিন, গাড়িভাড়া, অন্যান্য হাত খরচ। মাস ফুরোতে না ফুরোতেই টাকা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমার কিছুই গায়ে লাগে না। হস্টেলে ফিরে আমি পড়ার বই খুলেও দেখি না। সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছি, বলার লজ্জা কাটিয়ে আবার চমৎকার রেজাল্ট করার প্রেরণা জাগে না ভেতরে। আমাকে নিয়ে আত্মীয়-পরিচিতের বিবিধ নিন্দা রটনার মুখে চড় কষানোর কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না আমার মধ্যে। বাবার কষ্টার্জিত অর্থ নাশ করছি ভেবেও জাগে না বিবেক দংশন। আমি এক অমোঘ পঙ্কে ডুবতে থাকি এক-পা এক-পা করে। হস্টেলের লাইব্রেরিতে প্রচুর বই, কলেজের

BanglaBook.org

লাইব্রেরিতেও। আমি অঙ্ক ও বিজ্ঞানের বই নিই না। নিই গল্পের বই, উপন্যাস। পড়ি। ক্লাসের পড়া এগিয়ে যায়। আমিও যাই সত্যসাধনবাবুর বাড়ি।

এবং দু'মাস কেটে গেলে, মা চিঠি লেখে, বাবা লেখে না, আমি মাকে লিখি এবং দীপায়নকে লিখি অবশেষে। কোথায় পড়ছি জানাই। ঠিকানা দিই। দেখা করতে বলি ওকে। ভেবেছিলাম মা উজানিনগরে ফিরে গেলেই আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। বলব ঋতবানের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। অথচ এই দু'মাস আমার কিছুই ইচ্ছে করেনি। যদিও, প্রতিদিন ঘুম ভেঙে দেখি আমি ঋতবানের মুখ। দেখি আমার মনের মধ্যে। স্বপ্নেও দেখি কোনও কোনও রাতে। একলা ঘরে খুলে নিয়ে বসি ওর চিঠিগুলি। পড়ি। দেখি ওর ছবি। দেখি অপলক। ছবির মধ্যে থেকে ও-ও দেখে। আমার বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় না ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে। আমাকে ছেড়ে। ছেড়ে গেছে। এ জীবনে মানুষ মানুষকে ছেড়ে যায়— ঋতবান জানাল প্রথম। ঋতবান।

এবং আমি চিঠি লিখি সুশান্ত জানাকে। ঠিকানা জানাই। জবাবে, সাত দিন পরের এক বিকেলে, কলেজ থেকে হস্টেলে ফিরে দেখি, সুশান্ত জানার চিঠি আমার টেবিলে। এবং গেস্টরুমে বসে আছে দীপায়ন।

আমি দীপায়নকে দেখে হাসি। ও হাসে না। বলে— কত দিন হল এসেছ?

—দু'মাস।

আমি বলি।

—এত দিন যোগাযোগ করোনি কেন?

—এমনিই। চলো।

গেস্টরুমে অনেক লোক। অন্যদের আত্মীয়-বন্ধুরা। আমরা বেরিয়ে পড়ি। আটটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। আটটায় মেট্রন লাইব্রেরি থেকে চিৎকার করে নাম ডাকবে। মিলিয়ে নেবে মেয়েরা ফিরল কি না। ন'টায় সুপার রাউন্ডে আসবে। ব্যস। নিয়মের সাংঘাতিক কড়াকড়ি নেই। রাতে বাইরে থাকতে গেলে এল জি-র সই করা চিঠি জমা দিতে হয়। নকল সইয়ের চিঠিও জমা পড়ে হামেশাই। অধিকাংশের স্থানীয় অভিভাবকেরাই উদাসীন। মাসি-পিসি-কাকা-জেঠার দল। যে-যার সংসার সামলে অস্থির। একটি মেয়ের সুরক্ষা নিয়ে কে আর ভাবছে দিনরাত। অতএব নকল সইয়ের চিঠি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

দীপায়ন চুপচাপ হাঁটে। আমাদের কলেজের কাছে হেদোর পার্কে দাঁড়াই পাশাপাশি। ও বলে— কেমন আছ?

—ভাল।

BanglaBook.org

—এত খারাপ হল কেন রেজাল্ট?

—হল।

—আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

আবার নীরবতা। ভিড় পার্কে জোড়া জোড়া অনেক মূর্তি। ওরা প্রেম করছে।

আমাদের কথা জমে না। ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপের ফাঁকে সময় গড়িয়ে যায়। আমি একসময় খুব কুণ্ঠিতভাবে বলি— তুমি বলেছিলে ঋতবানের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। ও বলে— এখনও চাও?

—হ্যাঁ।

—কেন চাও? ও তো মনে রাখতে চায় না তোমাকে।

আমি চুপ করে থাকি। ও পকেট থেকে নোটবই বার করে। একটি পাতা ছিঁড়ে আমাকে দেয়। ঋতবানের ঠিকানা লেখা। জগুবাজার বলে একটা জায়গায় ও থাকে। আমি জগুবাজার চিনি না। কিছুই চিনি না কলেজ ও সত্যসাধনবাবুর টালাপার্কের বাড়ি ছাড়া। অবশ্য দিদির বাড়ি যেতে পারি। আমাদের কলেজের সামনেই হেদোর মোড়। ওখান থেকে বাস পাওয়া যায়।

আমি ঠিকানা দেখে ওর দিকে অসহায় তাকাই। ও বলে— চলে যেয়ো একদিন, ওর মেসে।

—তুমি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারো না?

ও হাতে হাত ঘষে। অস্থির আঙুল চালায় চুলে। বলে —বেশ। পরশু আসব। কফি হাউজ চেনো?

—না।

—ওফ্! শোনো, কলকাতায় থাকতে গেলে জায়গাটা চিনতে হবে। কলেজের কোনও বন্ধুকে জিগ্যেস করবে, কফি হাউজ কোথায়। পরশু একটার সময় কফি হাউজে থাকবে। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজে।

হস্টেলে ফিরে আমি শুয়ে পড়ি। অন্য কিছুই আমার করতে ইচ্ছে করে না। কেবল মাথা জুড়ে একটাই কথা— পরশু পরশু পরশু!

আমার বুকের মধ্যে ধক্-ধক্ করে। ভয় করে। আনন্দ হয়। দুঃখ হয়। উত্তেজনাও হয়। এক বিচিত্র বোধের ঘোরে বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকি আমি। সুশান্ত জানার চিঠি খোলার কথা আমার মনে থাকে না। হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে আসে একটি চিরকুট। আমার চুলে লেগে থাকে। আমি তুলে দেখি— ঋতবানের ঠিকানা লেখা কাগজটা!

আমি ধড়ফড় করে উঠি। ঋতবানের ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম!

BanglaBook.org

ডায়রি টেনে নিই। টুকে রাখি সযত্নে। কী হবে এই ঠিকানা দিয়ে? ভাবি। আমি কি ওর মেসে যাব? ওকে চিঠি লিখব? কেন? যে আমাকে চায় না, তার কাছে যাব কেন আমি? আমার আত্মমর্যাদাবোধ নেই?

আত্মমর্যাদাবোধ! অভিমান! আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে। আমি টের পাই ভালবাসা! তীব্র তীব্র ভালবাসা! ওই নিরাকার বস্তুটি আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ওঃ! কী ভীষণ সে যন্ত্রণা! আমি ছটফট করি। ছটফট করি। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে কিন্তু চোখে জল আসে না। আমি বিশুষ্ক কাঁদি। নিঃশব্দে দেওয়াল আঁচড়াই। আমার নখে চুন ঢুকে পড়ে। আঙুলের ডগা থেকে রক্ত চুঁইয়ে নামে। ঋতবান, ঋতবান— আমি কী ভীষণ ভালবাসি তোমাকে...

ডায়রিতে লিখতে থাকি আমি। লিখতে থাকি প্রলাপ। লিখতে থাকি আমার বেদনজর্জর যত কথা। এবং দিব্যেন্দুকে নিয়ে আমি দুপুর বারোটা থেকে কফি হাউজে গিয়ে বসে থাকি। আমি অবাক দেখি কফি হাউজ। অত টেবিল, অত চেয়ার, অত মানুষ, অত গমগমে আড্ডা! এই ভরদুপুরে কারা সব আড্ডা মারতে আসে? ওদের অফিস-কাছারি নেই? স্কুল-কলেজ নেই? নাকি এই এত লোক— সবাই কোনও-না-কোনও ঋতবানের জন্য অপেক্ষা করে আছে? আমি অবাক দেখি। আর দিব্যেন্দু দেখে আমাকে। বলে— কী ব্যাপার বল তো? ক্লাস কেটে চলে এলি?

আমি বলি— এক জনের সঙ্গে দেখা করব।

—কোথায় সে?

—আসবে। একটায়।

—তা হলে এত আগে এলি কেন? আর এম-এর ক্লাসটা করে আসতে পারতাম।

—যদি দেরি হয়ে যায়!

ও আমাকে নিরিখ করে। একটা সিগারেট ধরায়। বলে— কেসটা কী জানতে চাইব?

—না।

আমি বার-বার ঘড়ি দেখি। দিব্যেন্দু গান গায়। এক কাপ কফি দিতে বলে। জলের গ্লাসে ঢেলে সেই কফি আমরা ভাগ করে খাই। ঘড়ির কাঁটা মন্থর চলতে চলতে যখন পৌনে একটা— ওরা আসে।

আমার হৃৎপিণ্ড দাপাদাপি করে। গলা শুকিয়ে যায়। এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলি আমি। দিব্যেন্দু বলে— দেবারতি, তোর মুখটা লাল হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

আমি ধাতস্থ হতে চাই। হাত তুলি। আর দীপায়ন আমাকে দেখতে পায়। ওরা এগিয়ে আসে। শান্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করি আমি। ঋতবান আমার পাশের চেয়ারে বসে। খুব স্মার্টলি বলে— কেমন আছ দেবারতি?

আমি ওর দিকে তাকাই। আমার ঠোঁট কাঁপে। গলা দিয়ে শব্দ আসে না। আমি ভুলে যাই দিব্যেন্দুর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। দিব্যেন্দু নিজেই সে-পর্ব সারে। ঋতবান বলে— হ্যাঁ। বলো। তোমার কী বলার আছে।

ঘড়ি দেখে ও। বলে— আমার বেশি সময় নেই।

আমার অবিশ্বাস হয়, অবিশ্বাস। ও আর আমার নেই এই অবিশ্বাস। আমি আতি-পাতি খুঁজি। বিশ্বাস খুঁজি। ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। মেলে না। কিছুই মেলে না। এই তো ও। বসে আছে পাশে। ওকে ছুঁতে পারি আমি চাইলেই। আমার ঘোর লাগে। কফি হাউজের আর সব অস্তিত্ব মুছে যায় আমার সামনে থেকে। কেবল ঋতবান। ওর চুল, চোখ, নাক, গাল, ঠোঁট...হৃদয়ে যে বসে আছে, তাকে দূরের কেউ ভাবা কী অসম্ভব, আমি টের পাই। মনে হতে থাকে, এই তো, বিশ্বজিৎবাবুর বাড়িতে আমরা সেদিনও বসে ছিলাম, পাশাপাশি, এই তো, কোনও কষ্ট নেই, ওর সঙ্গে রো-ও-ও-জ দেখা হবে!

ও বলে—কী তাকিয়ে আছ হাঁ করে? কী বলবে বলো?

—তুমি এখনও ছবি আঁকো তো?

—এটা বলার জন্যই তুমি ডেকেছ? ঝেড়ে কাশো তো বাবা?

আমি চমকে উঠি। ওর ভাষা, ওর স্বরের অমসৃণতা আমাকে আহত করে। দীপায়নের দিকে তাকাই ওরা আসার পর এই প্রথম। দীপায়ন এক পলক, আমার চোখে চোখ রেখে, দিব্যেন্দুর দিকে মন দেয়। আমি ঋতবানকে বলি—তুমি এরকম করলে কেন?

—জোরে বলো। বিড়বিড় করলে এত আওয়াজে শোনা যায়?

ওকে চিনতে পারি না আমি। আমার প্রতি কী অবজ্ঞা ওর।

—কেন, এরকম করলে?

—কী করলাম?

—তুমি জানো না?

—তুমি কি কৈফিয়ত চাও নাকি?

—আমি কারণ জানতে চাই।

—তা হলে শুনে রাখো, আমার ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।

—ও।

BanglaBook.org

আমার মধ্যে আর্তি জাগে। তীব্র আর্তি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হৃদয় বলিয়ে নিতে চায়—তুমি ছেড়ে যেয়ো না। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো।

না। বলি না আমি। পরিবর্তে হঠাৎ উঠে দাঁড়াই। কারওকে কিছু না বলে হনহন করে হাঁটি। কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে থাকি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যের মতো। পথ চিনি না। গন্তব্য জানি না। ভিড় পরোয়া করি না। লোকে ধাক্কা মেরে যায়। আমার চিন্তা স্তব্ধ। আমি জানি না আমি কাঁদছি। আমার মাথা ঝনঝন করে। অবহেলা, অবজ্ঞা, অপমানে ঝনঝন করে। কোনও এক ব্যস্ত ক্রসিংয়ে আমি গাড়ি পরোয়া না করে ঢুকে পড়ি, পুলিশ তেড়ে আসে, ক্যাঁচ চি-ই-ই-ক শব্দে ব্রেক করে গাড়ি আর কে আমার কাঁধ খামচে ধরে। আমি তাকাই। দীপায়ন। দিব্যেন্দু।

ওরা আমাকে প্রায় জড়িয়ে নিয়ে আসে ফুটপাথে। দু-একজন মজা দেখতে দাঁড়ায়। দিব্যেন্দু একটা ট্যাক্সি ডাকে। আমাকে মাঝে বসিয়ে ওরা সোজা আমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যায়। ঘাসের ওপর আমি স্তব্ধ বসে থাকি। আমার চোখ থেকে জল পড়ে অবিশ্রাম। দিব্যেন্দু আর দীপায়ন, দু'জনে বসে থাকে আমার দু'পাশে চুপচাপ। ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে যায়। আমার কান্না ফুরোয়। দীপায়ন বলে—হস্টেলে ফিরবে তো?

আমি মাথা নাড়ি।

—চলো আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাসে উঠি আমরা। হেদোয় নামি। এতক্ষণ কোনও কথা হয়নি আমাদের। এ বার বলি—আসি?

দিব্যেন্দু বলে—তুই হস্টেলে বলে আয়।

—কী?

—তুই আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চল।

দীপায়ন ওকে সমর্থন করে। আমি বেশি কিছু ভাবতে পারি না। কিংবা, কে জানে, হস্টেলে যেহেতু একজনও আমার অন্তরঙ্গ নয়, আমি একা থাকতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি রাজি হয়ে যাই। হস্টেলে এল জি-র চিঠি জমা দিয়ে, জামা-কাপড় নিয়ে, আমি বেরিয়ে পড়ি দিব্যেন্দুর সঙ্গে।

BanglaBook.org

দিব্যেন্দুর বাড়ি, নাটকের দল ও দেবারতি

দুই দাদা, দুই দিদি, বউদি ও বাবা-মা নিয়ে দিব্যেন্দুদের জমজমাট পরিবার। সেই পরিবারে আরও এক সদস্যের মতোই আমি ঢুকে পড়ি। আমার সামনেই ওর বড়দির বিয়ে হয় এবং এক মাস পর ওর সব চুকিয়ে ফিরে আসা ঘটে। আমার সামনেই ওর বড়দা বউদিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। অভাব অনটনে চলে ওদের। তবু আমি মাঝেমধ্যে আসি। ভাল লাগে। আমাদের ক্লাসের শিলাদিত্য আমাকে একটা টিউশ্যনি জোগাড় করে দেয়। ওদেরই বাড়ির কাছে, দুটি বোনকে পড়াতে হবে। বেথুন স্কুলের মেয়ে। সিক্স আর এইট। দেড়শো টাকা উপার্জন করি আমি। ভাল লাগে। এবং একদিন শিলাদিত্যই আমাকে নিয়ে যায় নাটকের দলে। বড়দা-ছোড়দার বয়সি সব ছেলে। আমার ও শিলাদিত্যের মতোও কয়েকজন। মেয়ে একটি মাত্র। ছেলে কুড়িটি। আমি এলাম। আর মাঝেমাঝে শান্তাদি। আমি, সৌমিত্রী নিয়মিত। শান্তাদি অনিয়মিত। আমি স্কটিশ। সৌমিত্রী প্রেসিডেন্সি। আমি অঙ্ক। ও ইংরিজি। অতএব আমাদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। নাটকের দল আমার ভাল লাগে।

ভাল লাগে না কেবল পড়াশোনা। কী এক প্রগাঢ় অনীহায় আমি নিয়মরক্ষার মতো বই নিয়ে বসি। পাতা ওল্টাই। ডায়রি লিখি। পড়তে যাই। পড়াতে যাই। নাটকের রিহার্সালে যাই। দিব্যেন্দুর বাড়ি যাই। আমার শুধু যেতে ভাল লাগে। শুধু ভেসে ভেসে যেতে ভাল লাগে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে ভাল লাগে। কী থেকে? কার থেকে? দেবারতি পালিয়ে বেড়ায় দেবারতির থেকে। দেবারতি নিষ্কৃতি চায় দেবারতির থেকে। কেন আমি বুঝি না। বুঝতেও চাই না। কোনও কিছুই গভীরভাবে ভাবার ইচ্ছা আমি পরিত্যাগ করি। কিংবা ইচ্ছা স্বয়ং আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি মা-বাবাকে ভাবি না, ভাইবোনকে ভাবি না। একদিন নীল আমার কলেজে আসে। দুটি কথা বলে চলে যায়। আবার আসে। একটি চিঠি দেয়। আমাকে ভালবাসে ও, লেখে। আমি ওর সঙ্গে, ওর স্কুটারে চেপে যাই আউট্রাম ঘাট, ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা। ও একদিন একটা গাঢ় নীল ট্রাউজার পরে আসে। তাতে রোদ পড়ে চকচক করে। আমি বলি—কী খারাপ এটা। আর পোরো না।

BanglaBook.org

ও বলে—সে কী! এটা আমার সব চাইতে দামি প্যান্ট। এটার দাম আটশো টাকা।

—আটশো! আমার দু'মাসের হস্টেল খরচ।

আমি ওর প্যান্ট দেখি। ওর স্কুটার দেখি। ওর গা থেকে সুগন্ধ বেরোলে বুক ভরে টেনে নিই শ্বাস এবং ওকে বলি—তুমি কাল থেকে আর এসো না।

—কেন? কী হল?

ওর মুখটা লাল হয়ে যায়। হেলমেট পরছিল। সেটা খুলে হাতে নেয় ফের। হস্টেলের মুখে দাঁড়িয়ে ওকে বলি—আর এসো না। আমার ভাল লাগে না।

মেয়েরা আসে যায়। ওকে হাঁ করে দেখে। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। আমি রুমে ফিরলে রুমমেটরা ঘিরে ধরে—ও কে? তুই প্রেম করিস ওর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। করছিলাম। আজ ছেড়ে দিলাম।

—কেন? অত সুন্দর দেখতে!

আমি জবাব দিই না। এক দিন সুশান্ত জানা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এত দিনে আমি জানতে পারি, ও আশুতোষে পড়ে। স্ট্যাটিসটিকস অনার্স। থার্ড ইয়ার। পার্ট টু পাশ করে ও দিল্লি চলে যাবে বলে আমার সঙ্গে দেখাটা সেরে নিতে চায়। দেখা হলে ও একদিন আসে, দু'দিন আসে, তিন দিনের দিন চিঠি দেয়। লেখে—ভালবাসি। একগুচ্ছ লাল গোলাপ ও দেয় আমাকে। আমি ওর সঙ্গে পথ হাঁটি। ও অনেক স্বপ্নের কথা বলে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠি আমি। থার্ড ইয়ারের সঞ্জয়দা আমাকে ভালবাসা জানায়। আমি ওর সঙ্গেও পথ হাঁটি। কলেজের ক্যান্টিনে বসে গল্প করি। ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। নাটকের দলে অমিতেশদার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ি। আমার রুমমেট আমাকে নিয়ে যায় আর জি কর-এ ওর প্রমিকের কাছে। ওখানেও কয়েকজন বন্ধু হয় আমার। আমি ওদের হাউজ-স্টাফদের হস্টেল ডক্টরস ক্লাবে যাওয়া শুরু করি। আড্ডা দিই। গাঁজা খাই। ওখানেও ডাক্তার আবৃত্তিকার শুভাশিস আমাকে ভালবাসা জানায়। দোলের বিকেলে আমি গাঁজা খাই, সিদ্ধির শরবত খাই। অনেকটা ওই ডক্টরস ক্লাবে এবং শুভাশিসের বিছানায় আচ্ছন্ন পড়ে থাকি সমস্ত রাত।

শুভাশিস বাইরে থেকে আমাকে তালা দিয়ে রাখে। নিজে অন্য রুমে থেকে যায়।

দিন কাটে। দিন কেটে যায়। আমি জানি আমি সুশান্তকে ভালবাসি না। সঞ্জয়দাকেও ভালবাসি না। অমিতেশদা, শুভাশিস কারওকেই নয়। আমি কেবল দেখা করি। সকালে একজনের সঙ্গে। কলেজে একজনের সঙ্গে। বিকেলে

BanglaBook.org

একজনের সঙ্গে। এবং ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। হঠাৎ এক সকালে সব কিছুই বিস্বাদ লাগে। বিবর্ণ লাগে। আমি সুশান্তকে বলি, আর এসো না। সঞ্জয়দাকে এড়িয়ে যাই। অমিতেশদাকে বলি—শোনো, শুভাশিস নামে একটি ডাক্তার ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে।

ও নাটকের দলে আসা বন্ধ করে দেয়। খবর পাই, চাকরি নিয়ে গৌহাটি চলে গেছে। গৌহাটি থেকে ও দীর্ঘ চিঠি দেয়। আমি, সে-চিঠি না পড়ে ছিঁড়ে ফেলি।

শুভাশিসকে বলি—আর আসব না।

ও চমকে ওঠে। বলে—কেন?

—ভাল লাগে না।

ও আমার হাত চেপে ধরে। বলে—এই সম্পর্ক, এ তো ছেলেখেলা নয়। আজ ভাল লাগছে, কাল লাগছে না, এসব কী!

— যা বললাম তাই।

—লক্ষ্মীটি, এরকম কোরো না। আমি তোমার কথা বাড়িতেও বলেছি। বাড়িতে সবাই রাজি। আমার হাউজস্টাফশিপ শেষ হলেই আমরা বিয়ে করব দেবারতি।

—বিয়ে করব? কে বলল?

—আমরা তো ভালবাসি। বিয়ে করব এ তো স্বাভাবিক।

—আমি ভালবাসি না।

—প্লিজ! বোলো না এরকম।

—যা সত্যি সেটাই বললাম। আমি কখনও তোমাকে ভালবাসিনি।

ও বিধ্বস্তের মতো বসে পড়ে। কোঁকড়ানো মাথা ভর্তি চুল ওর। কী সুন্দর মুখটা। এসবের কিছুই আমার মধ্যে মায়া জাগায় না। ওর ডাক্তারি জীবনের নিশ্চয়তা প্রীতি উৎপাদন করে না আমার মধ্যে। এই ঘর, ওর এই ছোট্ট ঘরের বড় বড় কাচের জানালা, তার বাইরে একটা ঝাঁকড়া সোনালি চাঁপার গাছ, সন্ধে নামলে হাসপাতালের যত কাক শালিক চড়াই ওর ডালে বসে কিচির মিচির করে, এই ঘরের সারা দিনের রং বদল আমি জেনে গেছি। এমনও হয়েছে কত দিন, ও ডিউটিতে চলে গেছে, আমি থেকে গেছি ঘরে একা, নিভৃত এই ছড়ানো ছেটানো অগোছাল বসবাস—এখানেই—পেয়েছি আমি প্রেমিকের প্রথম চুম্বন, ঠোঁটের ভিতরে ঠোঁট নেওয়া ঘোলা স্বাদ জেনেছি আমি, জিভে জড়িয়ে জিহ্বা, ওর শক্ত আশিরনখর গাঢ় আলিঙ্গনে আমার সমস্ত তলপেট জুড়ে জেগেছিল ব্যথার মোচড়, ওই প্রথম আমি চিনেছি তাকে কামবোধ বলে, ও আমার চুম্বনের স্বাদ

BanglaBook.org

ছোঁয়ানো, কামাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, ওর ঘরে সিদ্ধি খেয়ে আমি সারা রাত পড়েছিলাম—ও আমাকে হরণ করলেও কিছু বলবার ছিল না—কিন্তু তা না করে ও আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল, বাইরে থেকে তালাচাবি মেরে আগলে ছিল পরম সম্পদের মতো। সত্য, এ সকলই সত্য, সবই ওকে দেখতে দেখতে মনে পড়ে আমার, কিন্তু বিনিময়ে বোধ জাগে না কোনও, ভালবাসা টের পাই না, মায়া টের পাই না, এমনকী সামান্য কৃতজ্ঞতা—সে-ও আমি পাশ কাটিয়ে যাই।

ও আমার হাত চেপে ধরে। কাতর ভাবে বলে—কী হয়েছে তোমার দেবারতি? আমি কি অন্যায় করেছি কিছু? কী করেছি বলো? কোনও ভুল করলে নিশ্চিতই শুধরে নেব আমি।

আবৃত্তির শিল্পী ও। কণ্ঠে সকল আবেগ স্পষ্ট খেলা করে। প্রথম পরিচয়ে ওর অসামান্য আবৃত্তিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অথচ এখন, ওর যত আবেগ উথলায়, আমি তত শক্ত হতে থাকি। নির্মম নির্মমতায় আমি কেটে কেটে বলি—ক্ষমাটমা চাইতে যেয়ো না। কিছুই করোনি তুমি। আমার ভাল লাগছে না, ব্যস্!

ও কেঁদে ফেলে। বলে—এত নিষ্ঠুর হয়ো না, আমি সহ্য করতে পারছি না।

ওর চোখের গড়িয়ে পড়া জল দেখি আর ভাবি আমি, দু'বছর পরেই এই ছেলেটা অন্য একটা মেয়ের জন্য টোপর পরবে। বুঝতে চাই না আমি, এ ছাড়া উপায় কী মানুষের, বুঝতে চাই না, শোক-যন্ত্রণা পার হয়ে আসা মানে এই নয় যে তার মধ্যে সততা ছিল না, বরং ওকে বলি—আমার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে তুমি পাবে। শুধু শুধু কাঁদছ।

ও ডুকরে ওঠে। বলে—চুপ করো, চুপ করো!

আমি স্পষ্ট দেখি ওর ভেঙে ভেঙে পড়া। দেখি ওর নাক থেকে নেমে আসছে মোটা পুরু শিকনির ডেলা। আমার গা ঘিনঘিন করে। আমি উঠে পড়ি। ছেড়ে যাই। ছেড়ে যাই ওকে। নাটকের রিহার্সালে যাই। যত না রিহার্সাল ততখানি মঞ্চায়িত হয় না নাটক, কেন না অর্থাভাব। বছরের চার-পাঁচটা শো, সেই কত, সেই অনেক। নাটকের শো থাকলে আমি রাত্রে দলের কারও বাড়িতে থেকে যাই।

আমি অমিতেশদা ছেড়ে দিয়ে টিউশ্যনিতে যাই। আর রিহার্সালে যাই। দলে কেউ অমিতেশ সম্পর্কে কিছু বলে না আমাকে। অমিতেশদা গৌহাটি থেকে একটাই চিঠি দিয়েছিল। আমি না পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছি।

আমি সঞ্জয়দা ছাড়ি। সত্যসাধনবাবুর কাছে যাই। এবং রিহার্সালে যাই। ঢুকে পড়ি অন্য সব চরিত্রের মধ্যে। কখনও মৃত স্বামীর শোকাতুর স্ত্রী, কখনও মৃত

BanglaBook.org

সন্তানের সন্তপ্ত পাথর এক মা, কখনও সচেতন তার্কিক আধুনিকা—আমি দেখি সঞ্জয়দা পার্ট-টু পরীক্ষায় ড্রপ দিল, কলেজে আসে না নিয়মিত। আসে না। আমার কী! আমার মায়া জাগে না। এক সন্ধ্যায় ও আমার কাছে আসে। চেপে ধরে হাত। বলে—তোকে ছাড়া বাঁচব না আমি।

আমি বলি—কী করবে? ঝাঁপ দেবে পাহাড় থেকে?

ও সত্যিই পাহাড়ে চলে যায়। কেদার-বদ্রি ঘোরে, ফুলের উপত্যকায় গিয়ে মৃত্যুকামনা করে এবং বেঁচে ফিরে আসে ঠিক।

আমি হাসি সব দেখেশুনে। নির্মম নিষ্ঠুর হাসি। আঃ! ছেড়ে আসতে পারার কী তীব্র আরাম!

কেবল সুশান্ত জানা, প্রত্যাখ্যাত হয়েও, লেগে থাকে। অপমান করলেও লেখে চিঠি। জবাব না দিলেও লেখে। জানায় দিল্লি চলে যাবে। আমি ওর কোনও চিঠি পড়ি। কোনওটা বন্ধই রেখে দিই অবহেলা ড্রয়ারে ভরে। ও একদিন আসে। বলে—আর কিছু চাই না, শুধু কথা দাও হারিয়ে যাবে না। যেখানেই থাকো, ঠিকানা জানাবে। এইটুকু বলো।

আমি কথা দিই না। চেষ্টা করব জানাই। আমার গা গুলোয়। সুশান্ত গা গুলোয়। অমিতেশ গা গুলোয়। নীল গা গুলোয় যখন দিদির বাড়িতে যাই, দেখা হয়, ও চেয়ে থাকে—চোখে চোখ পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শুভাশিস গা গুলোয় আমার। গুলোয় না কেবল নাটকের অন্য বন্ধুরা। কারণ তারা আমাকে ভালবাসা জানায়নি। আমি রাত জেগে ওদের সঙ্গে সেট বানাই। শো থাকলে সারা রাত রিহার্সাল দিই। এবং আমার গুলোয় না দিব্যেন্দু ও দীপায়ন। কারণ ওরাও...। দিব্যেন্দু আগের মতোই। যাই ওদের বাড়ি। থাকি। খাই। চুলে ক্লিপ এঁটে ঘুমিয়ে পড়ি। দিব্যেন্দু আলতো খুলে নেয় ক্লিপ। বলে—মাথায় গেঁথে যায় যদি।

দীপায়ন আসে না খুব। আসে না—সেই ভাল।

এবং পার্ট ওয়ান পরীক্ষার এক মাস আগে আমি দেখতে পাই এক সমুদ্র সিলেবাস। অঙ্কের চারটে পেপার। কেমিস্ট্রি। ফিজিক্স। আমি রাতদিন পড়ি। রাত্রি জাগার জন্য সিগারেট উড়ে যায় প্যাকেট প্যাকেট। পড়ি পড়ি পড়ি এবং সাধারণ পাশ করি অনার্স ছাড়াই।

জাস্ট এ গ্র্যাজুয়েট। ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণস্য সাধারণ ছেলেমেয়ের মতো।

এই আমার হওয়ার ছিল। হল। দিব্যেন্দুও অনার্স পায়নি। ওদের খোলা ছাতে

BanglaBook.org

এবং চাকরি পেতে চাই। ভারতীয় মহিলা সংসদ আবাসে বসে আমার আর কী করার আছে? আমি টিউশ্যনি করতে যাই। নাটকের কাজে যাই। রাত্রি দশটা পর্যন্ত বাইরে থাকা যায় বলে দলে অনেক বেশি সময় দিই। সেই সময় টিউশ্যনিটা পেয়ে গিয়ে আমার লাভ হয়েছিল, আমি প্রতি মাসে দুটো-চারটে বই কিনতে পারছিলাম। এই হস্টেলে সেই সব বই রাখার জায়গা নেই। আমি এক ফালি বিছানার দেয়াল ঘেঁষা ধারে থাক থাক বই রাখি। গল্প-উপন্যাস-কবিতার বইয়ের সঙ্গে অঙ্ক-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি। বাবা টাকা পাঠায়, তবু আমার টাকায় টান পড়ে। কারণ এই হস্টেলে খরচ প্রায় তিন গুণ। টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে বাবা। এখন পাঁচশো পাঠায়। আমি টিউশ্যন করে পাই তিনশো। মোট আটশোর মধ্যে ছ'শো টাকা চলে যায় থাকা-খাওয়ার জন্য। দু'শো হাতে থাকে। খুব টানাটানি। বই কিনতে পারি না। জুতো ছেঁড়ে। মুচির কাছে যাই। আবার ছেঁড়ে। সালোয়ার-কামিজ দুটি মাত্র। কৃষ্ণাদি ওর একটা আঁট হয়ে যাওয়া সেটা আমাকে দেয়। বাইরে যাবার তিনটি পোশাক হয়। একদিন অঙ্ক-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির বইগুলো বাহুল্য মনে হয় আমার। ঝোলায় পুরে তাদের আমি নিয়ে যাই কলেজ স্ট্রিট। পুরনো বইয়ের দোকানে বেচে দিই। শ'পাঁচেক টাকা অনায়াসে হাতে আসে আমার। আমি ভাবতে থাকি, এ দিয়ে কী করব! কী করা যায়। দিব্যেন্দুকে বলি—তুই যে আমার জন্য চাকরির ফর্ম তুলিস, তোর খরচা হয় না?

ও বলে—হয়। ফর্মে তো খরচ নেই। খরচটা পোস্টাল অর্ডারের।

—কত পাস তুই?

—শোধ করবি?

—যদি করি?

—পাবি কোথায়?

—পেয়ে গেছি।

—সাড়ে তিনশো টাকা।

আমি দিয়ে দিই ওকে সাড়ে তিনশো টাকা। হাতে আরও দেড়শো টাকা আছে।

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আমরা অস্তগামী সূর্য দেখি। ও বলে—এ বার চাকরির পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে।

ও-ই উদ্যোগ নেয়। ফর্ম তোলে। পি এস সি, এস এস সি, রেল! আমি সই করে দিই।

বাবা বলে—এই জন্য তো কলকাতা যাওয়ার দরকার ছিল না।

দাদারা বলে—তোর সব কিছুতে বাড়াবাড়ি।

দিদি আর নির্মলদা বলে—তা হলে বিয়ের সম্বন্ধ দেখি।

শুধু মা কিছু বলে না। মা-র চোখে প্রগাঢ় বিষাদ। কোনও অভিযোগ অনুযোগ নেই, দোষারোপ কৈফিয়ত নেই। কিন্তু চোখের পল্লবে আঁকা কাজলের মতো ওই বিষাদপ্রলেপ দেখে আমার মন হায়-হায় করে। এ আমি কী করলাম! কী ভাবে নষ্ট করলাম সব! আমি পালিয়ে যেতে চাই। মা-বাবা-দাদাদের থেকে দূরে যেতে চাই। উজানিনগরে মন বসে না। ছোড়দাও চাকরি পেয়ে গেছে। বড়দা-ছোড়দা একই কোম্পানিতে। বাবা অবসর নিল এ বছর। তার জায়গায় ছোড়দা। বড়দার বিয়ের তোড়জোড়। আমি, পুনর্বার, বাবার অমতে ফিরে আসি কলকাতায়। ভি এল মিত্র ছেড়ে দিতে হয়। খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাই ভারতীয় মহিলা সংসদ আবাস। হাজরা মোড়ের কাছে। এখন কলকাতাকে আমি অনেক বেশি চিনি। ধূসর আকাশ বলে, বৃক্ষবিহীন বলে, ভিড় বলে, বিশৃঙ্খল বলে—কলকাতার প্রতি আমার ভালবাসায় টান পড়ে না। কোটি মানুষের মধ্যে একজন হয়ে যেতে পারার আবেশে কলকাতাকে আঁকড়ে ধরি আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কী করি? হস্টেলের সুপার অসীমাদি শাড়ির ব্যবসা করে। ওর কাছ থেকে মা-র জন্য একটা শাড়ি কিনি। শাড়িটার দাম পাঁচশো টাকা। বাকিটা মাসে মাসে শোধ দেব!

শাড়িটা কিনে ফেলে কীরকম ভাল লাগে আমার। যদিও এ টাকা আমার নয়। বাবার। বাবাই বই কেনার টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সে-বই বিক্রি করে বাবাকে টাকা দেবার কথা ভাবতেও পারি না আমি। বরং বাবার জন্যও আমার কিছু কিনতে ইচ্ছে করে। কী করে কিনব? এখনও বাবার টাকাতেই আমার চলছে। বাবার পেনশনে ভাগ বসাচ্ছি আমি। অথচ বাবার তো এখন এত টাকা দেবার কথা ছিল না। আমার জেদ করে কলকাতায় চলে আসার জন্যই এই বাড়তি চাপ। খুব খারাপ লাগে আমার। তবু কিছুতেই উজানিনগরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। সারাক্ষণ ভার হয়ে থাকে মন। এই মুহূর্তে আমার কোনও প্রেমিক নেই। শুধু সুশান্ত জানা আমাকে ছাড়েনি। এখনও ও চিঠি লেখে। নিয়মিত। দশটা চিঠি এলে আমি একটা লিখি। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে ও এম এসসি করছে। দীপায়নও চলে গেছে দিল্লি। ওর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই আমার। সুশান্ত জানার সঙ্গে রয়ে গেছে ওরই জন্য।

চাকরির পরীক্ষা দিই একের পর এক। হয় না কিছুই। এক-একটা পরীক্ষার ফল বেরোয় কত কত দিন পর। আমার মনেও থাকে না কবে কী পরীক্ষা দিয়েছিলাম। দিব্যেন্দু মনে রাখে। অবশেষে কাগজ খুলি আমি। চাকরির আবেদন করি যেখানে যা পাই। কৃষ্ণাদি সাবধান করে, ডোর-টু-ডোর সেলসের চাকরি একদম কোরো না।

সেলস নয়, একটি মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ পাই আমি। বিবাদী বাগে স্টিফেন হাউসে অফিস। ফার্মের মালিক নিজেই আমার ইন্টারভিউ নেয়। দু-চারটি প্রশ্ন করে। ইংরিজিতে চিঠি লেখায় এবং মাসিক ছ'শো পঞ্চাশ টাকা বেতনে বহাল হয়ে যাই আমি।

ওঃ! দারুণ আনন্দ হয় আমার। ছ'শো পঞ্চাশ টাকা! নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ মনে হয়। টিউশনি আর চাকরি মিলে মোট ন'শো পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাব আমি! চমৎকার! বাবাকে লিখি—আমাকে আর টাকা পাঠিয়ো না তুমি। চাকরি পেয়েছি।

বাবা লেখে—এই সব চাকরির কোনও মূল্য আছে? তার চেয়ে তুমি টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখে নাও।

আমি একটা টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়ে যাই। সকাল ছ'টায় যাই। এক ঘণ্টা টাইপ করি, আধঘণ্টা শর্টহ্যান্ড। ফিরে তৈরি হয়ে অফিস যাই। পাঁচটায় ছুটি হয়। আমি

BanglaBook.org

চলে যাই উল্টোডাঙা। তিন দিন পড়াই। তিন দিন নাটকের দলে কাজ করি। ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে যায়। ছোট্ট ঘরটায় কৃষ্ণাদি ওর অ্যাকাউনটেন্সির পড়া তৈরি করে। আমি অন্যান্য বই বা পত্র-পত্রিকা পড়ি। কখনও চিঠি লিখি। কখনও ডায়রি। নির্মলদা বলে—এভাবে কত দিন চলবে শানু?

আমি বলি—কেন? খারাপ কী?

—একটা ভাল চাকরি করতে, বুঝতাম। এই সব প্রাইভেট ফার্ম, কখন কী হয়!

—কী হবে?

—শানু, আমার বন্ধু প্রভাতকে মনে আছে তোমার? মেরিন ইঞ্জিনিয়ার?

—আছে।

—ও তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তুমি রাজি?

—প্রভাতদা?

—ভাল ছেলে। প্রচুর পয়সা। তুমি ভাল থাকবে।

আমি মনে মনে হিসেব করি। নির্মলদা দিদির চেয়ে বারো বছরের বড়। দিদি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তা হলে?

আমি বলি—প্রভাতদা আমার চেয়ে সতেরো বছরের বড়, না?

ও বলে—না। আসলে প্রভাত আমার বন্ধু হলেও ও আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। শোনো, আমি তোমায় বলছি, দাম্পত্যে বয়সটা কোনও বিষয় নয়। এই তো তোমার দিদি আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট। কিন্তু ও কি সুখী হয়নি?

এই বিবাহ-প্রস্তাবটা আমল দিই না আমি। বরং গল্প করি কৃষ্ণাদির সঙ্গে। ও বলে—ভাল ছেলে পেলে বিয়ে করে নাও।

আমি বলি—তুমি কেন করছ না?

ও বলে—আমার বাবা নেই জানো তো?

—জানি।

—আমার কোনও ভাইবোনও নেই। বাবা সি এ ছিল। টাকা রেখে গেছে। কিন্তু মাকে সারিয়ে তুলতে পারেনি।

—কী হয়েছে মা-র?

—পাগল। একদম উন্মাদ। মাকে অ্যাসাইলামে রেখে দিয়েছি আমি। না হলে পড়তে পারতাম না। কিন্তু ওখানেই মা থাকুক, আমি চাই না। সি এ পাশ করলেই আমি যেখানেই থাকি, মাকে নিয়ে যাব।

আমি ওর কথা ভাবি। সরু ফিতের মতো হাত কাটা ব্লাউজ পরে ও। চোখে পুরু কাজল দেয়। চড়া লিপস্টিক ঠোঁটে। ওর বড় বড় গয়না আর স্বচ্ছ সিনথেটিক

BanglaBook.org

শাড়ির উগ্রতা নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করে এ ঘরের মেয়েরা। কিন্তু ওর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে যায় আমার মন। ও বলে— পাগল মা আছে জানলে কে আমায় বিয়ে করবে?

আমি বলি— করতেও পারে কেউ।

ও পড়ায় মন দেয়। আমি প্রভাতদাকে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারি না। বিয়ের কথা ভাবলেই আমার অস্বস্তি লাগে। সংসারধর্ম পালনের মধ্যে কোনও সার্থকতা আছে— এরকম আমার মনে হয় না। বাসে চেপে অফিস যাই। নিজেকে বেশ স্বাধীন লাগে। যদিও বাবা আমাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি। তিনশো করে দেয়। বড়দা-ছোড়দা দু'জনেই চাকরি পেয়ে যাওয়ায় এখন বাড়িতে কিছু সচ্ছলতা। বাবা সেই সচ্ছলতার কিছু ভাগ হয়তো পাঠাতে চায় আমাকে। ব্যাঙ্কে একটা বই খুলেছি আমি। অল্প অল্প টাকা জমছে। সাড়ে বারোশো টাকা, আমি কীসে খরচ করব?

খোশমেজাজে অফিসে ক্যাশবুক লিখি, ট্রায়াল ব্যালেন্স মেলাই, স্যালারি শিট তৈরি করি। এ সমস্তই এখানেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছে। দুপুরে অফিস থেকে বেরিয়ে এটা-ওটা খাই এবং একদিন ফার্মের মালিক ললিতমোহন আগরওয়ালের ঘরে আমার ডাক পড়ে।

জানি না ওর বয়স কত। ষাটও হতে পারে, সত্তরও। ও আমাকে বয়ান বলে। আমি লিখে যাই। কিছুটা শর্ট হ্যান্ডে। কিছুটা ইংরিজিতে। ও বলতে বলতে থেমে যায়। জর্দা দেওয়া মশলা চিবোয়। পিকদানিতে পিক ফেলে আর দেখে আমাকে। আধ ঘণ্টার কাজের জন্য এক ঘণ্টা কাটায়। একদিন ও দেয় আমাকে অসম্ভব প্রস্তাব। আমি নাকচ করে দিই। ও দমে না। ফের প্রস্তাব দেয়। মাইনে বাড়িয়ে দেবে তিনগুণ। চমৎকার ফ্ল্যাট দেবে থাকতে। সোনায় ভরিয়ে দেবে গা। আমি না বলি। বারংবার না বলি। ও অন্য পথ ধরে। দোষ-ত্রুটি ধরে আমার কাজের। সামান্য ত্রুটির জন্য দাঁড় করিয়ে ঝাড় দেয় কঠিন ভাষায়। আমি বুঝি ওর চাপ। ও আমাকে দিয়ে নতিস্বীকার করাতে চায়। অসহায় লাগে আমার। কাকে বলি! কী করি! এখানে আমার সহকর্মীরা সবাই সারাক্ষণ জজ দেখে। ভয়ে ঘাড় অবধি তুলতে পারে না। অতএব, আমি কারওকেই কিছু বলি না। কৃষ্ণাদিকেও না। ওর পরীক্ষা চলছে। না চললেও বলতাম না। আমার চাপা স্বভাব আমাকে বার বার একলা ঠেলে দেয়। আমি রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে থাকি। আমার ঘুম আসে না। ঘুম এলে দুঃস্বপ্ন দেখি। আমি বুঝতে পারি, কেন বাবা বলেছিল এ সব চাকরির কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, কেন বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়নি। বাবার

BanglaBook.org

আপাত কঠোরতার আড়ালে সেই স্নেহকোমল স্বভাবের কথা ভেবে আমার কান্না পায়। আমি যা করছি, তার প্রতি সমর্থন না থাকলেও বাবা আমাকে নিরাপদেই রাখতে চেয়েছে বরাবর।

আমি অফিস কামাই করা শুরু করি। আজ যাই, কাল যাই না। এক গভীর বিবাদ ও ব্যর্থতাবোধ ছেয়ে ফেলে আমাকে। টাইপ স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিই। নাটকের কাজে মন লাগে না। পড়ানোয় ঢিলেমি আসে। ইচ্ছে করে, সারাদিন চুপ করে শুয়ে থাকি। ডায়রির পাতা ওল্টাই। নতুন লিখি ছাড়া-ছাড়া ভাবে। পুরনো লেখা পড়ি। আমার ডায়রি রোজনামচা নয়। মাঝে মাঝে লেখা ভাবনার অংশ শুধু। পড়তে পড়তে ক্লান্তি এসে যায়। কী ভাবে নষ্ট করেছি আমি সব! নিজের প্রতি ছিছিক্কারে মন কুঁকড়ে যায়।

তখন আমার চোখে পড়ে সেই ঠিকানা। জগুবাবুর বাজার। এই ঠিকানা আমার মনে ছিল। কিন্তু এর কোনও তাৎপর্য ছিল না। আজ হঠাৎ মনে হয়, জগুবাবুর বাজার আমি চিনি এখন। আমার এই হস্টেল থেকে বাসে পাঁচ মিনিটের পথ। এক অদম্য বাসনা অতর্কিতে আমাকে পেয়ে বসে। ঋতবানকে দেখতে ইচ্ছে করে আমার। কথা বলতে ইচ্ছে করে। ও কি এখনও ওখানেই আছে? আমি জানি না। কিন্তু জানতে ইচ্ছে হয়। একবার দেখব ওকে! একবার কথা বলব! আমি বার করি ওর ছবি, কত দিন পর, দেখি ওকে, সে-ছবি দূরের লাগে না। বিশ্বাস হয় না আমার, বিশ্বাস হয় না, ও আমার নয়। এই বিশ্বাস, এই ইচ্ছার সমূহ তীব্রতা আমাকে বিপর্যস্ত করে। আমি উঠে পড়ি। বেরিয়ে পড়ি। বাস ধরি। নামি জগুবাজারে উন্মত্তবৎ। একে-ওকে জিগ্যেস করি ঠিকানা এবং মেসের দরজার কাছে পৌঁছে আমার পা আটকে যায় সঙ্কোচে। মনে হয় ফিরে যাই। কিন্তু যেতেও পারি না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি দুয়ার জুড়ে। একটি বুড়ো লোক জিগ্যেস করে— কী চাই?

আমি প্রায় বিড়বিড় করি। আমার গলা শুকিয়ে যায়। কোনও ভাবে বলি— ঋতবান ...

—অ। বসুন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের ঘরের প্রথম বিছানা। উনি চুল কাটতে গেছেন।

মনে হয়, এখনও চলে যেতে পারি। এখনও সময় আছে। কিন্তু শেষ অবধি পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠি। পুরনো কাঠের সিঁড়ি শেষ হলে আমি বাঁ দিকে তাকাই। খোলা ঘর। ঢুকি। প্রথম বিছানা। সে-বিছানায় বসে আমার গা শিরশির করে।

BanglaBook.org

আমি হাত বুলাই বিছানায়, বালিশটা ছুঁই, ঘরে অন্য কেউ না থাকায় আমি সাহসী হয়ে উঠি। খাটের পাশে দড়িতে ঝোলানো শার্ট শুঁকে দেখি। ওর গন্ধ। চিনতে পারি আমি। বিশ্বজিৎবাবুর বাড়িতে পাশাপাশি কত দিন ...

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয়। আমি বসে পড়ি। দেখতে পাই ওকে। ও আসছে। আলো হয়ে যাচ্ছে সিঁড়িটা। ও আসছে। ও অবাক তাকায় এবং আমাকে দেখামাত্র ভ্রূ কুঁচকে যায় ওর। আর আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে চায়।

—তুমি! হঠাৎ! কী ভেবে?

আমার কান গরম হতে থাকে। টের পাই, হঠাৎ আবেগের বশে এসে ভুল করেছি আমি। ভুল করেছি, তবু আমি দেখতে থাকি ওকে। কী যে ভাল লাগে! লজ্জিত অপমানিত চিত্তও ওকে দেখে তৃপ্ত হয়ে ওঠে। আমি বলি, গলা কেঁপে যায় আমার তখন— এমনিই!

ও শার্ট খোলে। গামছায় ঝেড়ে নেয় ঘাড়-পিঠ। অন্য শার্ট পরে। আমি শুকনো গলায় জানতে চাই—আঁকো তো এখনও? ছবি আঁকো?

ও বলে—কী হবে ছবি এঁকে? পেট ভরবে?

পেটের চিন্তাই তাহলে সব এ জীবনে? আমি ভাবি। ও আয়নায় নিজের মুখটা দেখে। বলে— চলো।

আমি চমকে উঠি। বলি— কোথায়?

—তোমাকে বাসে তুলে দিই।

মাথা নিচু করে ওর পিছু-পিছু যাই আমি। পথে ও আমার পাশে হাঁটে না পর্যন্ত। বাস এলে উঠতে যাই।

ও ডাকে— শোনো।

আমি তাকাই পিছনে।

ও বলে— আর এসো না।

বাসের পাদানিতে উঠতে গিয়ে পা কাঁপে আমার। গা কাঁপে। পিছলে যেতে যেতে আমি বেঁচে যাই। কন্ডাকটর জড়িয়ে ধরে আমাকে।

BanglaBook.org

নীল

এর পর নীল বিবাহ প্রস্তাব দিলে গ্রহণ করি আমি।

কিছু দিন আগে নিউমার্কেট পুড়ে গিয়েছিল। এখন রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকান করে অস্থায়ী নিউমার্কেট। আমি আর নীল কারকো রেস্তোরাঁয় বসে আছি। ও নিজেই দিদির বাড়িতে একদিন, দেখা করতে চাইল অন্য কোথাও। আজ সেই দেখা করা। দু'বাটি স্যুপ নিয়ে বসে আছি। এই প্রথম এরকম স্যুপ খাচ্ছি আমি। ভাল লাগছে না। ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে গান গাইছে একজন। আমার সামনে গান হলে অন্য কোনও দিকে মন দিতে পারি না আর। অতএব নীল আমার উল্টো দিকে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি শিল্পীর দিকে তাকিয়ে আছি। আধো অন্ধকার ঘর। এত অল্প আলোয় সকলে খাচ্ছে কেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না। ধরা যাক চুল পড়ল খাবারে, নিজের মাথা থেকেই পড়ল। জানতেও পারবে না তো!

নীল ডাকে— শান ... এদিকে তাকাও। এখানে শিল্পীর দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যাড ম্যানার্স।

—ও।

আমি ওর দিকে তাকাই। ও বলে— তুমি আর পাল্টালে না। কাঁটা-চামচে খেতে শিখেছ?

—ওই রকমই।

—এখানে খাবার দিলে আমি তোমায় কেটে দেব। তুমি শুধু কাঁটা দিয়ে তুলে নেবে।

—ঠিক আছে।

—শান, তুমি কি জানো আমি আজও তোমায় কতখানি ভালবাসি?

—তাই?

—সত্যি। তোমাকে ভুলে যাবার অনেক চেষ্টা করেছি আমি। পারিনি।

—আজ ডাকলে কেন?

—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

BanglaBook.org

আমি নীরবে তাকাই। স্যুপ মুখে দিই। ও বলে যায়— এম বি এ করে আমি পার্ক হোটেলে আছি। ম্যানেজার র‍্যাঙ্কে চলে যাব ছ'মাস পরে। এখনও ট্রেইনি আছি। মাসে আট হাজার টাকা পাই।

আমি ভাবি। ললিতমোহন আগরওয়ালের চৌকো লোভী মুখ। আমার রেজাল্ট। বাবার পেনশন। বড়দার সংসারে বড় বউদির আগমন। আমার সাদা-মাঠা অস্তিত্বের মধ্যে অন্য কোনও অর্থ আর খুঁজে পাই না আমি। এ দেশের অধিকাংশ মেয়েই যা করে, তাই আমার ভবিতব্য। আমি মেনে নিই। কী আছে? একজন নয় একজন— বিয়ে তো করতেই হবে। আমি বলি— বেশ।

ও আমার হাত চেপে ধরে। শিল্পী গায়— হাওয়া হাওয়া ও হাওয়া খুসবু লুটা দে—

কৃষ্ণাদি আমাকে পাশের খবর দেয়, আমি ওকে বিয়ের খবর দিই। ও হস্টেল ছেড়ে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নেয়। ভাল চাকরি পাচ্ছে বলে ও আমাকে খাওয়াতে নিয়ে যায় ডিনারে। আমি নীলকে নিয়ে যাই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলে।

কৃষ্ণাদি বলে— ওর নাটক দেখেছেন?

নীল বলে— না।

—বিয়ের পর দেখবেন।

—আসলে মা নাটক পছন্দ করে না। হয়তো ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

কৃষ্ণাদি আমার দিকে তাকায়। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। আমার চোখের সামনে দৃশ্য ভেসে ওঠে। খাঁচায় পোরার আগে পুরসভার লোকেরা কুকুরদের কোণঠাসা করে কীরকম!

রাত্রে চিঠি লিখতে বসি সুশান্ত জানাকে। আমি বিয়ে করছি। লিখতে বসি ললিতমোহন আগরওয়ালের ফার্মে রেজিগনেশন লেটার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম রোমান্স

এক মাসের মধ্যে, এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে, এক অনুগত নাট্যকর্মী থেকে আমি রূপান্তরিত হয়ে যাই গৃহকর্মীতে। দিদির বিয়ের পর যে ঔজ্জ্বল্য দেখেছিলাম ওর মধ্যে, যে আত্মগত ভাব, নিজের মধ্যে তার সন্ধান আমি পাই না। এ কি আমারই দোষ? বুঝতে পারি না আমি। নীলকে দেখলে মনে হয়, আমাকে বিয়ে করে ফেলাটা একটা মিশন ছিল ওর। হয়ে গেছে, মিটে গেছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে ও। কাগজ পড়ে। আড্ডা মারতে যায়। ফেরে। স্নান করে বেরিয়ে যায়। ফেরে আটটা-সাড়ে আটটায়। কিছু খায়। আবার আড্ডা মারতে যায়। সাড়ে দশটায় ফেরে। একটু টিভি দেখে। ওর বাবা-মা-র সঙ্গে কথা বলে। খায়। শুতে আসে। শরীর ইচ্ছে করলে দু'পাশের দরজা বন্ধ করে। মিটে গেলে দরজা খুলে দেয়। কারণ মধ্যরাতে এ ঘর দিয়েই ওর বাপ-মা প্রস্রাব করতে যাবে। ফলে সারা রাত, কে কখন ঢুকে পড়ে এই সঙ্কোচে আমরা বিছানার দুই পাশে দুটি মৃত মাগুর মাছের মতো পড়ে থাকি। একটু একটু ইচ্ছে করে আমার, ওকে জড়িয়ে ধরতে, ওর বাহুতে মাথা রেখে ঘুমোতে সারারাত, এখন ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে আমার। নইলে এ ভালবাসা নিয়ে আমি কী করব? কারওকে না দিলে ভালবাসা যে অর্থহীন হয়ে যায়।

কিন্তু ভালবাসা— সে কী? সে কী রকম? আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনও কথাই জমে না। কথাই না থাকলে দুটি মানুষের ঘনিষ্ঠ কী থাকে আর?

সমস্ত দুপুর একা-একা ঘরে। বই পড়ি। ফোন করি কৃষ্ণাদিকে। নাটকের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। নাটক দেখতেও যাই না। সিনেমাও যাই না। কার সঙ্গে যাব? একা? এই ভটচাজ বাড়ির বউ, একা একা ট্যাং-ট্যাং করে সিনেমায় গেলে বাড়িসুদ্ধু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।

ওকে বলি— কেন আমাকে বিয়ে করলে তুমি?

ও বলে— কেন এ কথা বলছ?

—আমাদের কোনও সম্পর্কই তো তৈরি হল না। সারাদিন আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলো না তুমি। শুধু রাত্রে শোবার জন্য বিয়ে করার কি কোনও দরকার ছিল?

BanglaBook.org

—আমার সময় কোথায়?

—অফিস থেকে ফিরে আড্ডা মারতে না গেলেই কি নয়?

ও চুপ করে থাকে। এবং একদিন পাংশু মুখে ফিরে এসে বলে— চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

অবাক তাকাই আমি— ছেড়ে দিলে? কেন?

—আমার একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। কোথাও কখনও মাথা নোয়াইনি আমি। যা চেয়েছি, পেয়েছি। একটা চাকরির জন্য সম্মান খোয়াতে পারব না।

—কিন্তু আমি তো কিছু করি না। একটা রোজগার তো দরকার।

—পেয়ে যাব অন্য চাকরি।

আমিও নিশ্চিন্ত হই। পেয়ে যাবে। দু-চার মাসে ঠিকই পেয়ে যাবে। কিন্তু মাধবী গজগজ করে। ফিসফিস করে ওকে কী বলে বুঝি না। হয়তো আমাকে যা বলে তাই।

—দাদাকে বলে কাজটা করে দিলাম! রাখতে পারল না! আর আমি বলতে পারব?

আমি বলি— ভাবছেন কেন? এখুনি আট হাজার টাকার চাকরি হয়তো পাবে না। কিন্তু কিছু একটা পেয়েই যাবে।

শিবানন্দ ছিল পাশে। বলল— আট হাজার টাকার চাকরি? ও তোমাকে তাই বলেছে নাকি?

আমার মাথা ঝিমঝিম করে। বলি— হ্যাঁ। তাই তো বলেছিল।

—ধ্যাৎ! যত সব বাজে কথা! সাড়ে তিন হাজার টাকা পাচ্ছিল। যাই হোক তবু তো পাচ্ছিল। ওর স্কুটারের তেলের খরচটা ওঠে।

আমার বিশ্বাস হতে চায় না। নীল মিথ্যে বলেছিল আমাকে, নাকি আমিই ভুল শুনেছিলাম! কোনও ক্রমে গলায় জোর এনে বলি— যাকগে, এম বি এ করা আছে, পেয়ে যাবে চাকরি। আপনারও তো কত চেনা-জানা...

আমার কথা শেষ হয় না, শিবানন্দ হাতের খবরের কাগজ পাশে রাখে। চশমা খুলে আমার দিকে তাকায়। বলে— এম বি এ? ও কবে পাশ করল?

—করেনি?

আমি কাঁপা গলায় জিগ্যেস করি। টের পাই, হাত-পা ঘামছে আমার। কেন ও এত মিথ্যে বলল আমায়? কেন? কোন? চোখ থেকে জল পড়ে আমার। ওদের সামনে কাঁদতে চাই না আমি। তবু এড়াতেও পারি না। মাধবী বলে— এখন আর

BanglaBook.org

কেঁদে কী হবে! ফট করতেই বিয়ের জন্য নেচে উঠলে। বিয়ের আগে সব দিক যাচাই করে নিতে হয়, জানো না?

আমি উঠে যাই। নিজের বিছানায় শুয়ে থাকি ঘরের আলো নিবিয়ে। কীরকম শূন্য লাগে। কেন ও ঠকাল আমাকে? মিথ্যে বলল কেন? বিশ্বাসে আঘাত লাগে আমার। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে গেলে গুঁড়ো গুঁড়ো কাচ পড়ে থাকে পথময়, ওই রকম গুঁড়ো গুঁড়ো বিশ্বাস আমার, সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখি। হ্যাঁ, ঠিকই, সব দিক যাচাই করিনি আমি। বিশ্বাস করেছিলাম। উইন্ডস্ক্রিনেরই মতো বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই তো পৃথিবীকে দেখবে মানুষ। ও নির্মলদার ভাই, দিদির খুড়তুতো দেবর, কলেজে ভর্তির সময় ও কত সাহায্য করেছিল আমাকে, দু'মাসের প্রেমিক ও আমার, আমি যে ভাবতেও পারিনি ওকে যাচাই করতে হয়। আমার বাড়িতেও ভাবেনি কেউ।

ঝড়ে আছড়ে পড়া পাখির মতো ছটফট করি আমি। রাগ হয়। ঘেন্না হয়। তবু ওকেই আমি আঁকড়ে ধরতে চাই। না হলে আমার ভালবাসার কী হবে? আমার এক বুক ভালবাসা! যাকে দিয়েছিলাম, সে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। আহা রে— বলে তাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে তুলে এনেছি আমি। আমার অপমানিত ভালবাসা। সে-বস্তু কারওকে তো দেওয়া চাই। কাকে দেব? বিয়ে হলে বরকেই ভালবাসতে হয়, এই সামাজিক প্যাটার্ন আমি মেনে নিয়েছি যখন— আমি করুণা দেখাতে চাই ওকে। ক্ষমা করে দিতে চাই। ভাবি, হয়তো বিরাট ইচ্ছা ছিল, মেটেনি, তাই হীনম্মন্যতা, তাই মিথ্যা এত। ভাবি, আমি একটা চাকরিকে বিয়ে করিনি, মাসমাইনেকেও নয়। আমি কোনও ডিগ্রিকেও বিয়ে করিনি। আমি একটি মানুষকে বিয়ে করেছি। ডিগ্রিকেই বিয়ে করতে চাইলে, আমার উচিত ছিল সিটিং দেওয়া। নির্বাচিত হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে যাওয়া একের পর এক। আমি তা করিনি। অতএব বিয়ে যাকে করেছি তার দোষ-গুণকেও আমি নিয়েছি, এই উদারতায় আমি উঠে দাঁড়াই। রাত্রে তবু জিগ্যেস করি ওকে। ও বলে— মাত্র একটা পেপার বাকি আছে শানু। বিশ্বাস করো। আমি ক্লিয়ার করে ফেলব।

বিশ্বাস করি না আমি। বিশ্বাস হয় না। কী করব ও বলি— আর মাইনের ব্যাপারটা?

ও বলে— নাইট ডিউটি করলে ওরকমই পেতাম। মা-ই তো নাইট শিফট নিতে দেয়নি।

—ও।

আমি চুপ করে যাই। এক রাত্তিরে আমার পেট থেকে বুক অবধি ভিজে যায়।

BanglaBook.org

আমি উঠে বসি। দেখি ম্যাক্সি ভিজে শপশপ করছে। কিছুই বুঝি না আমি। বিছানা হাতড়াই। ভেজা লাগে। কী মনে হয়, ওর শর্টসে হাত রাখি। ভেজা লাগে। ওকে দু'হাতে ধাক্কাই আমি— ওঠো, ওঠো, এ কী! আমার গায়ে পেচ্ছাপ করেছ তুমি?

ও ধড়মড় করে ওঠে। আলো জ্বালে দ্রুত, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেয়। ঠোঁটে আঙুল রাখে। বিরক্তি, রাগ, ঘেন্নায় দলা পাকিয়ে যাই আমি। অন্য ম্যাক্সি নিয়ে বাথরুমে দৌড়ই। রাত্রি দুটোয় স্নান করি আপাদমস্তক। পিঠময় ভেজা চুল ছড়িয়ে দিয়ে চাদর পাল্টাই। ও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানে। আমি ভেজা তোশকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। কী করে শোব সারা রাত? ইলেকট্রিক ইস্ত্রি নিয়ে আসি। গরম করে চেপে ধরি ভেজা জায়গাটায়। কটু তীব্র গন্ধসমেত ধোঁয়া ওঠে। ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ হয়। একটু শুকোলে আমি ওখানে খবরের কাগজ পাতি। তার ওপর চাদর বিছাই। নোংরা কাপড়ে একগাদা পারফিউম স্প্রে করে রেখে দিই বিছানার তলায়। কাল কাচব। ওকে জিগ্যেস করি— কবে থেকে আছে এ রোগ? ছোটবেলা থেকে?

ও বলে— এই প্রথম হল।

আমি চুপ করে থাকি। জানি ও সত্যি বলল না। ওর জায়গায় আমি যদি হতাম আজ, হিসি করে ভিজিয়ে দিতাম বিছানা, আমার তীব্র প্রতিক্রিয়া হত। ও এত স্বাভাবিক কী করে?

ও বলে— শানু, কারওকে বলতে যেও না। মাকেও না।

আমি চুপ করে থাকি। অবিশ্বাস একটি একটি করে ইট গাঁথে আমাদের মাঝখানে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাণিজ্য প্রস্তাব

একটি ক্যুরিয়ার কোম্পানি খোলে ও। মাধবী ও শিবানন্দকে বোঝায় এখন এই ব্যবসা দারুণ লাভের। ওরা তিনজন সারাক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা করে। আমায় ডাকে না। আমিও যাই না আগ বাড়িয়ে। তবু কথা শুনতে পাই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটে একটি ছোট ঘর ভাড়া নেয় ও। দারুণ সাজায়। ঘটা করে কোম্পানি উদ্বোধন করে। আমি আর মাধবী অফিস পুজো করতে যাই। লাখ দুয়েক টাকা ব্যয় হয়েছে মোটামুটি, শুনতে পাই। ওর হিসেবে দু'বছরে লাভসুদ্ধু উঠে আসবে সব। মাধবীর চোখ মোহে চকচক করে। ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলেই একটা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে ও, নীলকে বার বার মনে করিয়ে দেয়— দেখিস, সর্বস্ব তুলে দিলাম। ডোবাস না।

নীল ডানহিল খায়। চুলে বিলক্রিম মাখে। ব্র্যান্ডেড জামা জুতো পরে অফিসে যায়। যখন তখন ট্যাক্সি চাপে। এমনই ধরন ওর। ব্র্যান্ডেড। এবং এক দুই তিন করে মাস চলে গেলেও সংসারে দেবার মতো টাকা আসে না ওর হাতে কিন্তু আমার পেটে বাচ্চা এসে যায়। অল্প অল্প গা গুলোয় আমার। চোখের নীচে হালকা কালি পড়ে। টক খাবার জন্য আনচান করে ভেতরে। এবং প্রায় দেড়মাস ঋতুকাল নিঃশব্দে পেরিয়ে গেলে ওকে বলি আমার সন্দেহের কথা। ও চমকে ওঠে। বলে— সর্বনাশ! এখন কোনও ভাবেই বাচ্চা আনা যায় না।

আমি শক্ত হই। বলি— তো কী করব? এসে গেছে। এখন কী করার আছে?

ও বলে— বুঝতে পারছ না তুমি? সবে ব্যবসাটা শুরু করেছি। এখনও লাভের মুখ দেখিনি। বাড়িতে টাকা-পয়সা দিতে পারছি না। এ সময় বাচ্চা এলে সামলাব কী করে?

—আমি বাড়ি চলে যাব। সেখানে বাচ্চা হবে।

—তারপর? বাচ্চা মানুষ করতে হবে না? তা ছাড়া এখন সংসারের পেছনে দেবার মতো সময়ই নেই আমার।

আমি জোর করি। তর্ক করি কিছুক্ষণ। এবং পরাস্ত হই। কারণ ওর কথায় যুক্তি আছে। এমনিতেই ও সংসারে কিছু দেয় না বলে মাধবী মাখনের দাম বলে,

BanglaBook.org

শ্যাম্পুর দাম বলে, মাছের দাম শোনায়। চালের খরচ বেড়ে গেছে বলতেও দ্বিধা করে না। আমি মরমে মরে থাকি সারাক্ষণ। ফলে এক রাত্রে প্রেগন্যান্সি পজিটিভ রিপোর্টের সঙ্গে ও এক সবুজ হোমিওপ্যাথিক তরল এনে দিলে আমি তা পান করি। সাত দিন, দশ দিন করে আরও এক মাস পেরিয়ে যায়— গর্ভপাত হয় না আমার। ও, এই বৃহৎ বরানগরের এক অচেনা গলিতে কোনও এক ডাক্তার দাসের নার্সিংহোমে আমাকে নিয়ে আসে। কারওকে কিছু জানাই না আমরা। ও বলে— বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন আছে, সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। বলতেই হয় ওকে কারণ ও আমাকে নিয়ে কোথাও বেরোলে যাথার্থ্য বিচার করে মাধবী। যদি মনে হয় ওর, বেরোনর তেমন কারণ ছিল না তা হলে রাগে গজগজ করে। কখনও চেঁচায়। আমার বহির্মুখী মনকে দোষারোপ করে।

অতএব বন্ধুর বাড়ি যাবার নাম করে আমরা ডাক্তার দাসের নার্সিংহোমে পৌঁছই। যুবক বয়সি সেই ডাক্তার আমাকে প্রশ্নাদি করে। প্রেগন্যান্সির রিপোর্ট দেখে। নীলকে বলে— আপনি তিন ঘণ্টা পরে আসুন।

ও বলে— তিন ঘণ্টা?

ডাক্তার বলে— এখুনি যাবেন না। সব হয়ে গেলে উনি বিশ্রাম করবেন। হলে বলব। তখন যাবেন।

একজন নার্স আমাকে অপারেশন রুমে নিয়ে যায়। শাড়ি খুলে নেয়। শুইয়ে দেয় সরু একফালি বিছানায়। শায়া তুলে পেটের কাছে জড়ো করে দেয়। এক টানে খুলে নেয় প্যান্টির আড়াল। লজ্জায় কান্না পায় আমার। এই প্রথম নীল ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের কাছে উন্মোচিত আমি। আমি জোরে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

ডাক্তার আমার পা স্পর্শ করে। বলে— নেমে আসুন। আর একটু... আর একটু...

আমি কোমর ঘষে ঘষে নামাই। প্রায় ঝুলতে থাকলে ডাক্তার আমার পা দুটি ধরে। ফাঁক করে যতখানি সম্ভব। আমার ব্যথা লাগে। সে দুটি লোহার স্ট্যান্ডে পা দুটি তুলে দিয়ে বেঁধে দেয়। ক্রমাগত বলতে থাকে— পেশিগুলো ছেড়ে দিন। লুজ করুন। শক্ত হবেন না।

নার্স আমার ডান হাতে হাত রাখে। ডাক্তার এক ঠাণ্ডা তরলে ভেজা তুলো দিয়ে যোনির গভীর অবধি পরিষ্কার করে নেয়। দেখে নেয় অবস্থান। আমার ব্যথা লাগে। আমি শক্ত হয়ে যাই। সে আবার যান্ত্রিক ভাবে বলে— লুজ করুন... শক্ত হবেন না...

BanglaBook.org

বলতে বলতে একটি ধাতব মোটা দণ্ড সে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। ভীষণ যন্ত্রণায় আমি কেঁপে উঠি। আর্তনাদ করি। নার্স আমার হাতে চাপ দেয়। বলে— এখুনি হয়ে যাবে, এখুনি।

আমি তার হাত ধরি শক্ত করে, দূর থেকে লেদ মেশিনের শব্দ এলে যেমন, সে-রকম ধাতব ঝিঁঝিঁ ডাকার মতো শব্দ করে কঠিন যন্ত্র পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকে আমার গর্ভে। অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনে আমার প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা!

দ্বিবিধ যন্ত্রণা হয় আমার। দ্বিবিধ। নাকি বহুবিধ। আমি জানি না, আমি জানি না। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। নার্স আমাকে পরিষ্কার করে। ধরে ধরে টেবিল থেকে নামায়। একটি স্যানিটারি প্যাড পরিয়ে দেয়। প্যান্টি পরিয়ে দেয় এবং এতক্ষণে চোখ খুলি আমি। ডাক্তার গ্লাভস খুলে হাত ধুচ্ছে বেসিনে। আমার মাথা ঘুরে যায়। নার্সের গায়ে এলিয়ে পড়ি আমি। ডাক্তার ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে আমাকে। কোলে তুলে শুইয়ে দেয় পাশের বিছানায়। বলে— কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? কী কষ্ট?

আমি হা-হা করে কাঁদি। আমার কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না। ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরে। কেন জানি না, তার বুকে তুলে নেয়। ডাক্তারের বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে দমকে দমকে আমি কাঁদি। সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে— কেঁদো না। মিঃ ভট্টাচার্যকে ডেকে দেব?

—না, না, না!

সেই মুহূর্তে নীলের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না আমার। আমি বলি— আমি চাইনি... এ আমি করতে চাইনি...

সে আমার গালে আলতো চুমু খায়। ভেজা চোখে আলতো ঠোঁটের স্পর্শ দেয়। সে মুহূর্তে ডাক্তার হিসেবে ওটুকু হয়তো বা গর্হিত তার পক্ষে কিন্তু আমি টের পাই বিশুদ্ধ আবেগ তার। সে কামোন্মাদ নয়। সে আমার শরীরকে কিছুমাত্র অসম্মান করে না। বরং বলে— কেঁদো না। এ ভাবে কেঁদো না। তোমার বয়স অল্প। আবার বাচ্চা হবে।

—আমি পাপ করলাম।

—কিছু পাপ নয়। মাত্র তিন মাস ছিল। এ পাপ হলে কনট্রাসেপটিভ পিল খাওয়াও পাপ।

আমার উদভ্রান্ত কান্না কমে আসে। আমি ফোঁপাতে থাকি। সে আমাকে শুইয়ে দেয়। বলে— শোনো, তুমি কনট্রাসেপটিভ পিল খেয়ো না। মিঃ ভট্টাচার্যকে বলবে কন্ডোম ব্যবহার করতে।

BanglaBook.org

আমি চুপ করে থাকি। আমার তলপেটে ব্যথা করে। সে নার্সকে ডাকে। নার্স একটা চাদরে আমার শরীর ঢেকে দেয়। শাড়ি গুছিয়ে রাখে মাথার কাছে। ডাক্তার আমার গাল থেকে জল মুছে দেয়। বলে— খুব কষ্ট দিলাম!

সে আমার জবাবের প্রত্যাশা করে না। তলপেটে আলতো হাত রাখে। বলে— আমি চেষ্টা করেছি কষ্ট না দেবার। তবু...। ঘুমোও এখন। বিশ্রাম নাও।

আমার কপালে আলতো ঠোঁট রাখে সে। আমি চোখ বুজি। একটি ছোট্ট শিশু অভিমানী মুখ নিয়ে আমার দৃষ্টিতে বসবাস করে। চোখ উপচে ওঠে জলে এবং জল ফেলতে ফেলতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি কখন।

বিকেল পাঁচটায় নার্স আমাকে ডেকে তোলে। গরম দুধ আর মিষ্টি খেতে দেয়। শাড়ি পরতে সাহায্য করে। ডাক্তার আসে আমার কাছে। বলে—কী মিসেস ভট্টাচার্য? সব ঠিক আছে তো? কোনও অসুবিধে নেই?

লোকটা এখন সম্পূর্ণ পেশাদার। দুপুরে কি ও সত্যি আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল? নাকি সে-ও এক পেশাদারি প্যাকেজ!

নীল আমাকে দেখে হাসে। নিশ্চিন্ত দেখায় ওকে। বলে— সব ঠিক আছে তো?

আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ও আর কিছু জানতে চায় না। আমিও বলি না কিছু। ও জানতেই পারে না গোটা পদ্ধতিটাই কতখানি যন্ত্রণার!

স্কুটারে বসি। আগে ওর কোমর ধরতাম। আজ স্টিলের হাতল ধরে নিই। যেতে যেতে ও ঘাড় ফিরিয়ে বলে—এক বেলায় দু'হাজার টাকা বেরিয়ে গেল।

আমি বলে ফেলি— ভাবছ কেন? এ তো তোমার দুটো ট্রাউজারের দাম!

স্কুটার বাড়িতে এসে থামে। সব কিছুই লাগে যেন অস্বাভাবিক। ভিড়ে ভিড় আমাদের ঘর। আমার বুকের মধ্যে ভয় শিরশির করে। সবাই কি জেনে গেছে আমি গর্ভপাত করতে গেছিলাম? সবাই গর্জে উঠবে? বলবে— এ পাপ চলবে না। এ বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়...

সবাই তাকায় আমার দিকে। আমি বোকার মতো ঘরে আসি। এসে চমকে যাই। আমার স্টিলের আলমারি হাট করে খোলা। লকার হাট করে খোলা। ভেতরটা হা-হা করছে। আমার সব গয়না চুরি গেছে। দিনের বেলায়।

BanglaBook.org

গোটা বৃহত্তর ভট্টাচার্য পরিবার চুরির রহস্যভেদে নেমে যায়। নেতৃত্ব দেয় নীলের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার পিসেমশাই। সকলেই আমার শোকাকুল রোদন প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাস্তবিক আমার কান্না-টান্না পায় না। আমার মায়ের অলঙ্কারলোভ নেই। আমার বাবার সম্পদলোলুপতা নেই। হ্যাঁ, গয়না একটা সম্পদ তো ঠিকই। আমি গয়না পরতে ভালবাসি না, তবু জানি, বিপদে গয়না বেচে উদ্ধার পাওয়া যায়। সেদিক থেকে আমার খুব ক্ষতি হল। কিন্তু তার জন্য সবার সামনে হাঁউমাউ কাঁদার কথা আমি ভাবতেও পারি না। বরং আমার তলপেটে অন্য শোক টনটন করে। গয়নার চেয়েও অনেক বড় এক অনন্য সম্পদ আমি খুইয়ে এসেছি আজ। তার শোকের কথা আমি কাকে বলব?

কিন্তু এ জগতে নানাবিধ চোখ আছে। নানা দৃষ্টি। এদের কাছে গয়না ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের মতো সম্পদ নয়। গয়না এক অধিকার, গয়না আত্মার মতো, হৃদয়ের মতো, হতে পারে তা সন্তান বা জীবনের চেয়ে বড়।

অতএব, আমি পা ছড়িয়ে কেন কাঁদি না, এই ভেবে, সকলের বিস্ময় উৎপাদিত হয়! সে বিস্ময় প্রথমে প্রকাশ্য থাকে— ওঃ! কী শক্ত মন! একটু কাঁদল না।

এর পর গুনগুন আলোচনা শুরু হয়। পুলিশ আসে-যায়। কিছুই হয় না। আমার ওয়ার্ডরোবের ওপর একটি ঘামে-ভেজা গেঞ্জি পাওয়া গেছে। সে গেঞ্জি কার? সমাধান হয় না। মাধবী দোষারোপ করে আমাকে— কেন চাবির গোছা সঙ্গে নিয়ে যাওনি?

অন্যরা বলে— লকার নাওনি কেন ব্যাঙ্কে?

হ্যাঁ। ঠিকই। আমি চুপ করে শুনি। সংসারী মানুষ হিসেবে আমার উচিত ছিল চাবির গোছা নিয়ে গিয়ে ঘোরা। যেমন মাধবী ঘোরে। আমার উচিত ছিল লকার নেওয়া। কিন্তু আমি যে শিখিনি এসব। এরকম নাদান হলে চলে না সংসারে। এরকম আনপড় অনভিজ্ঞ হলে পস্তাতেই হয়। নিজের জিনিসপত্র, নিজের পাওনা খাবলে-খুবলে সামলে-সুমলে টাকে গুঁজতে না পারলে সংসার করতে আসার দরকার কী!

BanglaBook.org

ক'দিন পুলিশ আসে। কথা বলে। চা খায়। চারপাশ দেখে। তারপর আর আসে না। কিন্তু বাড়িময় এক ফিসফাস শুরু হয়। ভূতপূর্ব পুলিশ সুপার পিসেমশাই সব দিক বিচার করে, নিজের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে এক অসামান্য তত্ত্ব খাড়া করে।

—সেদিন কী হয়েছিল?

—সেদিন? শিবানন্দ অফিস গেছিল। মাধবী স্কুলে গেছিল। নীলু আর শানু বন্ধুর বাড়ি গেছিল।

—নীলু কি সারাক্ষণ বন্ধুর বাড়িতে ছিল? শানুর সঙ্গে?

—না। বন্ধুর বাড়িতে শানুকে রেখে নীলু অফিস গেছিল।

—সেদিন কী হয়েছিল?

—মাধবী স্কুল থেকে ফিরে দরজা খোলে। ভিতরে যায়। তখন সব ঠিকঠাক ছিল।

—তারপর?

—মাধবী জামা-কাপড় নিয়ে ছাতে গা ধুতে যায়। দরজা আবজানো থাকে।

—রোজই যায় গা ধুতে?

—রোজ।

—অন্য দিন এ সময় কে থাকে ঘরে?

—শানু থাকে।

—এ দিন কে ছিল না?

—শানু ছিল না।

—এ থেকে কী প্রমাণিত হয়?

এ-ই প্রমাণিত হয় যে আমি, কোনও ছলনায়, বন্ধুর বাড়ি থেকে এসে, ওই নির্দিষ্ট সময়ে ঢুকে গয়না সরাই। ভান করি, যেন চুরি। সেই গয়না কোনও ভাবে পাচার করি বাপের বাড়িতে। গয়না চুরি গেলে আরও আরও গয়না গড়িয়ে দেবে সবাই— এই লোভ। এই উদ্দেশ্য। আর ও দিকে, যারা বলাবলে ওয়ার্ডরোব দেয়, সেই দরিদ্র বাবা-মা কিছু গয়না পেয়ে গেল।

বাপের বাড়ি সার্চ করলেই ধরা পড়বে বুমাল। কিন্তু ভদ্রতাবশত তা করা যায় না। আমাকে পুলিশি কায়দায় চেপে ধরলেও সব বেরোতে পারে। কিন্তু ভদ্রতাবশত...

এক রাতে মাধবী গটগট করে আমার সামনে দাঁড়ায়। বলে— শোনো শানু, আমরা খুব ভাল করে ইনভেস্টিগেট করাব। তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসতে পারে। এখনও বলছি। সময় আছে। যদি কিছু জানো তো বলো।

নীল টিভি দেখছিল। ও এসে দাঁড়ায়। আমি প্রথমে বুঝতেই পারি না মাধবী কী বলতে চাইছে। আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে গেলে যেমন সকাল ফুটে ওঠে, তেমনি আমি বুঝি ওর কথা। আমি হাতের বই ছুড়ে ফেলি। আমার মাথার মধ্যে চিড়বিড় করে। জ্বালা করে দারুণ। দুলতে থাকি আমি। চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। গলার শিরা ছিঁড়ে আর্তনাদ করি আমি— আ আ আ, আ আ আ আ...

আমার পিঠ বেঁকে যায় ধনুকের মতো। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ওঠে। মাধবী আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। আমি ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই। এ ঘর ও ঘর থেকে লোক ছুটে আসে। নির্মলদা আসে। দিদি আসে। আমি নীলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। দু'হাতে কাঁধ খামচে মাথা ঠুকি বুকে। আছড়ে কাঁদি আর চিৎকার করে বলি—এ সব কী বলছে ওরা? বলো। তুমি বলো। সেদিন আমি কোথায় ছিলাম? বলো, বলো, বলো!

আমার দম আটকে আসে। আমি হাঁপাই। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদে।

ক'দিন পর, মার্কেটে যাবার নাম করে আমি আর দিদি বরানগর থানায় যাই। দেখা করি বড়বাবুর সঙ্গে। মকবুল খান নামে সেই ও সি আমাদের যত্ন করে বসায়। আমরা বলি—চোর ধরে দিন। এখানে আমাদের কেউ নেই। আমরা কার কাছে যাব?

সে বলে— আপনারা আমার বোনের মতো। আপনাদের জায়গায় আমার নিজের বোন থাকলে যা বলতাম, তাই বলছি। ইনভেস্টিগেট করে আমরা বুঝেছি, এ আপনাদের বাড়ির কারও কাজ। আমরা তাই হাত গুটিয়ে নিয়েছি।

—যদি তাই হয়, তাকে ধরছেন না কেন?

—ধরলে তোমাদের ক্ষতি হবে, তুমিই বলছি, বোনের মতো তোমরা, পারিবারিক কেলেঙ্কারি লোক-জানাজানি হবে। সে কি ভাল? ভুলে যাও। মন দিয়ে সংসার করো। গয়না গেছে। আবার হবে। এখন সাবধান হতে শেখো।

আমরা জিগ্যেস করি না— ঘরের লোকই যদি চুরি করে তবে সাবধানতা কীসের! আমরা বলি না, আমাকেই চোর ভেবে বসে আছে ওরা। বলতে পারি না। উঠে পড়ি। সামনে গঙ্গা বয়ে যায়। আমরা জেটিতে গিয়ে দাঁড়াই। চুপ করে জল বয়ে যেতে দেখি। আমার মনে পড়ে একটি শ্লোক—

BanglaBook.org

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুণাতু সততং শুভকারি বারি ॥

—পাপনাশক, দুষ্কর্মপ্রতিষেধক, তরঙ্গায়িত, পর্বতবিহারী, হিমালয়ের গুহাবিদারী, ঝঙ্কারকারী, হরিপদধূলিতে প্রবহমাণ এবং মঙ্গলময় গঙ্গাবারি সর্বদা পবিত্র করুক।

দূরে দূরে নৌকা যায়। লঞ্চ এসে জেটিতে লাগে। লোক নামে। লঞ্চ ভেসে যায়। জলে রোদ্দুর পড়ে। আলো ঠিকরোয়। আমরা দুটি বোন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। একসময় ও বলে—বাড়ি যেতে খুব ইচ্ছে করছে।

আমি বলি— গয়নার জন্য শোক নয়, মা শেষ সম্বলটুকু আমায় দিয়েছিল। আর চিহ্ন রইল না।

গয়নাই কি মা-র চিহ্ন? মা-র কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে আমারও। আমি স্পষ্ট শুনি মা-র স্বর— শানু, তোরা চারজন, তোরাই তো আমার চিহ্ন। তোরা বেঁচে থাক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম ত্যাগ

এরই নিকটবর্তী এক সন্ধ্যায়, আমি রুটি ভাজছি, মাধবী বেলে দিচ্ছে, কারণ আমি গোল করে বেলতে পারি না এখনও, বড় জেঠি, দিদির শাশুড়ি, সন্ধ্যারতির বাতাসা প্রসাদ দিয়ে গেছে, সারা বাড়ি ধুনো দিয়ে গেছে মেজ জেঠি, এক শান্ত সন্ধ্যা, কোনও শোক-তাপ যেন নেই কিছু দুনিয়ায়, মাধবী রেকাবে বাতাসা এনে ধরে আমার কাছে। আমি বাতাসা নিই। মুখে পুরি। কুড়মুড়িয়ে চিবোই। ও বলে— প্রণাম করলে না?

আমি ডান হাতের তর্জনী কপালে ঠেকাই। ও বলে—একেবারে পুজো-টুজো করো না, এ কি ভাল শানু?

আমি চুপ করে থাকি। চুপ করেই থাকি সারা দিন।

—সকলের মঙ্গলের জন্য, সংসারের মঙ্গলের জন্য বাড়ির বউয়ের পুজো-আচ্চা করা দরকার।

আমি রুটি ওল্টাই। ও দাঁড়িয়েই থাকে। আমি তাকাই না ওর দিকে। ও বলে— খুব নরম করে বলে— শানু...

এ বার আমি তাকাই। বিস্মিতও হই এই স্নেহাসিক্ততায়। ও বলে— শানু... সেদিন... মানে যেদিন চুরি গেল, বাড়িতে তো আমিই ছিলাম। তুমি আমাকেই সন্দেহ করো না তো?

আমি তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। তাকিয়ে থাকি অপলক। আস্তে, খুব আস্তে বলি— আপনাকে, বাবাকে, নীলকে, এ বাড়ির কোনও লোককেই আমি সন্দেহ করি না।

থামি। হাসি অল্প। ওকে দম নিতে দিই। এবং বলি— আমার মন অত ছোট নয়।

ও মাথা নিচু করে চলে যায়। আর আমার ভিতরে কী সংঘটিত হতে থাকে, জানি না, আমার সারাক্ষণ অস্থির-অস্থির লাগে, পাগল-পাগল লাগে, ঘুমোলে জেগে উঠি, জাগলে মনে হয় এক ঘোর তন্দ্রা— বহু দূর পথ আমাকে ডাকে, অজানিত পথ— পূর্বাপর ভাবি না আমি, পরিণতি ভাবি না, এক দুপুরে ব্যাগে নিই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক স্তরের কাগজপত্র, ডায়রি নিই, মোটা ডায়রি আমার, গত পাঁচ বছরের নানা কথা লেখা, আর তিরিশ টাকা সম্বল করে বেরিয়ে পড়ি পথে।

BanglaBook.org

কারওকে কিছু বলি না। জানি না কোথায় যাব। একটা বাসে উঠে পড়ি। এসপ্ল্যানেডে নামি। শূন্য মনে হেঁটে যাই। ভাবি না কিছুই। পার্ক স্ট্রিট, জীবনদীপ, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল পেরিয়ে একাডেমি অব ফাইন আর্টসের কাছে থমকে দাঁড়াই। কেন আমি এখানে এলাম? জানি না। পায়ে পায়ে ঢুকি। এখানে, এই অডিটোরিয়ামে অভিনয় করেছি কত বার, আজ এরা সব মুখ ফিরিয়ে থাকে। আমি ক্যান্টিনের দিকে যাই। সিঁড়িতে বসি। বসেই থাকি। কিছুই ভাবি না। না অতীত, না বর্তমান, না ভবিষ্যৎ। কালরহিত হয়ে বসে থাকি আমি আর বিকেল হয়। সন্ধ্যা নামে। মশা কামড়ায়। লোকের আসা-যাওয়া বাড়ে। রাত বাড়ে। এক সময় লোক কমে যেতে থাকে। আমি ঘড়ি দেখি। এই ঘড়ি মিষ্টিকাকা উপহার দিয়েছিল মাধ্যমিক পাশ করার পর। সে ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজে। মাঝখানে উঠেছি দু-চার বার। টয়লেটে গেছি।

এ বার চিন্তা আসে, রাতে যাব কোথায়? দিব্যেন্দুর বাড়ি? কৃষ্ণাদির বাড়ি? সৌমিত্রীর বাড়ি? নাটকের দলের অন্য কোনও বন্ধু?

কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তবু বাস আসে। উঠি। বাস আমাকে পৌঁছে দেয় দিব্যেন্দুর পাড়ায়। প্রায় সাড়ে দশটায় দিব্যেন্দুর বাড়িতে বেল দিই। ওর বাবা খোলে দরজা। চমকে ওঠে আমাকে দেখে। আমাকে দেখায় বুঝি-বা কিছু অন্যতর। ওরা সবাই ঘিরে ধরে।

—এত রাতে? কী ব্যাপার? তুই ভাল আছিস তো?

আমি শূন্য তাকাই। বলি— চলে এসেছি, ওদের ছেড়ে। ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। ওর বাবা, যাকে জেঠু ডাকি আমি, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়, বলে— তা, তুমি বলে এসেছ তো?

—না।

আবার নীরবতা। ওর দিদিরা আমাকে ঘরে নিয়ে যায়। আমি বলি— জল খাব।

ছোড়দি জল আনতে যায়। বড়দি ফিসফিস করে বলে— তোর গয়না আর দামি শাড়িগুলো আনলি না কেন?

দিব্যেন্দু আসে। বসে আমার পাশে। বলে— একটা ভাল খবর আছে।

—চাকরি পেয়েছিস?

আমি জিগ্যেস করি।

ও বলে— কী করে জানলি? দিদিরা বলেছে?

—না। আন্দাজ করলাম। এখন তোর ভাল খবর এটাই হতে পারে। কীসে পেলি?

—রেলে।

BanglaBook.org

আমি চুপ করে থাকি। ওকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে যাই। তখন দরজায় অস্থির বেল বেজে ওঠে। দরজা খোলার শব্দ পাই আমি। দিব্যেন্দু ছাড়া সবাই দরজার কাছে যায়। এত রাতে কে বা কারা আসতে পারে আমরা আন্দাজ করি কিংবা আশঙ্কা করি প্রত্যেকেই। এবং এ ঘর পর্যন্ত ভেসে আসে প্রত্যাশিত স্বর। আমি দিব্যেন্দুর হাত চেপে ধরি। ও কিছু বলে না। আমি ডায়রি আর কাগজপত্র ওর হাতে তুলে দিয়ে বলি— এগুলো দিয়ে গেলাম। সাবধানে রাখিস।

ও বলে— কেন?

ও আমার ডায়রি চেনে। কত রাতে ওর পাশে বসেও তো লিখেছি আমি। এ বাড়িতে।

বলি— কখন কোথায় থাকি, যদি মরে যাই, পুড়িয়ে ফেলিস...

জেঠু ডাকে। আমি পাশের ঘরে যাই। দিদি। নির্মলদা। নীল। সারি সারি থমথমে মুখ।

জেঠু বলে— ওরা তোমাকে নিতে এসেছে।

আমি বলি— আমি যাব না।

দিদি বলে— কী বলছিস আবোল-তাবোল। কারওকে না বলে চলে এসেছিস। কত জায়গায় খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান! চল বাড়ি চল।

—আমি যাব না। ওর সঙ্গে থাকব না আমি।

নীল বলে— তুমি আজ যা করেছ, তোমার সঙ্গেও আমি আর থাকতে চাই না। কিন্তু সে ফয়সালা এখানে হবে না। আমাদের পরিবারের একটা সম্মান আছে।

নির্মলদা বলে— তুমি চলো। কাল তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাব। তারপর যা হয়, হবে। আজ চলো।

আমি দিব্যেন্দুদের দিকে তাকাই। সবাই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যাশা করি, কেউ বলবে, না ও যাবে না। বলে না কেউ। আমি চটি পরি। কতক্ষণ খাইনি। খুব খিদে পায়। নির্মলদার গাড়িতে উঠি। নীল সামনে বসে। পেছনে আমি আর দিদি। কেউ কোনও কথা বলে না। এসপ্ল্যানেডের কাছে এসে টায়ার পাংকচার হয়ে যায়। ওরা স্টেপনি বার করে। আমি আচমকা দরজা খুলে পালাই। ছুটে পালাতে থাকি ফাঁকা ধর্মতলা দিয়ে। কোন দিকে যাচ্ছি আমি জানি না। দিদি চিৎকার করে —ধরো! ধরো ওকে! গাড়ি চাপা পড়বে!

আমি প্রাণপণে ছুটি। থাকব না। এ বাড়িতে থাকব না কিছুতেই।

পিছনে পায়ের শব্দ পাই আমি। আমার দম আটকে আসে। জিভ বেরিয়ে যায়। ছ'ফুট লম্বা, খেলোয়াড় নীল আমাকে ধরে ফেলে সহজেই। আমি পাগলের মতো

BanglaBook.org

আছাড়ি-পিছাড়ি দিই। ছাড়াতে চাই নিজেকে। ও গর্জে ওঠে—রাস্তায় নাটক কোরো না!

নাটক?

একটা মাত্র শব্দ—আমাকে শান্ত করে দেয়। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই। হাত ছাড়ে না ও আমার। এ বার দিদি সামনে বসে। নীল পেছনের সিটে বসে থাকে আমার কব্জি ধরে। ছাড়ে একেবারে বাড়ি গিয়ে, যেখানে সমস্ত লোক অপেক্ষা করে আছে।

সমস্ত লোক। তারা তর্জনী তোলে। তারা প্রশ্ন তোলে। তারা শাসায়। মাধবী বলে— বন্ধুর বাড়ি? বন্ধু? ছাইয়ের বন্ধু। ছেলেতে-মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়? পুরনো প্রেমিক, ওর পুরনো প্রেমিক...

দিদির শাশুড়ি বলে— ওই যে, ওই সব, নাটক করত, চরিত্র থাকে নাকি নাটক-টাটক করলে...

—কেন গিয়েছিলে?

—কেন গিয়েছিলে?

—কোন সাহসে?

—এত বড় বুকের পাটা...

— কী সর্বনেশে মেয়ে!

— বাড়ির সম্মানের কথা একবার ভাবল না!

— ছি ছি ছি!

— ছিঃ ছিঃ...

শিবানন্দ আমাকে আগলে দাঁড়ায়। বলে— ছাড়ো তোমরা ওকে। শানু, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ও আমাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। নিয়ে যায় নিজের ঘরে। আমি আচ্ছন্নের মতো হাঁটি। যাই ওর সঙ্গে। ও আমার মাথায় হাত রাখে। বলে— শানু, তুমি খুব ভাল মেয়ে। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আমাকে বলো, কী হয়েছে তোমার?

আমি ফুঁপিয়ে উঠি। বলি— মা-র কাছে যাব।

—যাবে। যাবে তো। কাল তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

ও আমার মাথা বুকে টেনে নেয়। মাধবী ডাকে। শিবানন্দর বুক থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নেয়। আমার চিবুক নেড়ে বলে— কেন পাগলামো করো?

আমি ওর হাত সরিয়ে দিই।

BanglaBook.org

সারাক্ষণ ভয় করে আমার। সারাক্ষণ উদ্বেগ। মা-বাবা কথা বললেই, দাদারা কথা বললেই আমার সন্দেহ হয়। ওরা আমাকে ফেরত পাঠাবার চক্রান্ত করছে। আমি খিটখিট করি। ঝগড়া করি দাদাদের সঙ্গে। ঝগড়া— যা আমার স্বভাবে ছিল না। এখন প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, বিয়ে করেও আমার কোনও খুশির ভাব নেই কারণ দিব্যেন্দু আমার প্রেমিক। আমি মাকেও সন্দেহ করি এখন। আমার শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। এক সকালে, সকলেই সংসারের কাজে ব্যস্ত যখন, মা-র ব্যাগ থেকে তিনশো টাকা চুরি করি আমি। বেরিয়ে যাই। শিলিগুড়ির বাসে চেপে বসি। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে টিকিট কাটি। কোনও ট্রেনে রিজার্ভেশন নেই। অবশেষে তিনটের সময় কামরূপ এক্সপ্রেস এলে উঠে পড়ি লেডিজ কামরায়। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি। মাথা দপদপ করে। যে-কোনও লোক দেখলেই ধক করে ওঠে বুক। মনে হয় ওই তো বড়দা! কিংবা ছোড়দা!

অবশেষে ট্রেন ছাড়লে বুক ভরে শ্বাস নিই আমি। খবরের কাগজ কিনি। রাতে সবাই সমস্ত বার্থে শুয়ে পড়লে দুটি সিটের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় কাগজ বিছাই আমি। আমার দু'জন সঙ্গী জুটে যায়। দুই বোন তারা। রিজার্ভেশন ছাড়াই চলেছে। তারা আমার কথা জিগ্যেস করে। আমি বানিয়ে বানিয়ে কত কী বলি। তারা তাদের খাবারের ভাগ দেয় আমাকে। খেয়ে আমরা শুয়ে পড়ি গা ঘেঁষে। মেঝেতেই। চলেছিস-চলেছিস-চলেছিস-চলেছিস বলতে বলতে ছুটে যায় ট্রেন।

ভোরবেলা আমি কৃষ্ণাদির ফ্ল্যাটে এসে দাঁড়াই। ও ঘুম চোখে আমাকে দেখে চমকে ওঠে। আমি সংক্ষেপে বলি সব। ও গম্ভীর হয়ে যায়। বলে— ওরা তোমাকে এখানে খুঁজতে আসবে। আর এক দিন তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, তখন এসেছিল।

আমি বলি— আমাকে ধরিয়ে দিয়ো না কৃষ্ণাদি।

—না। দেব না। তুমি স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নাও। খুব নোংরা দেখাচ্ছে তোমায়। ওরা চলে আসবে।

এবং ওরা আসে। কৃষ্ণাদি আমাকে পাশের ঘরে চালান করে বাইরে থেকে

BanglaBook.org

উজানিনগরে

সারাক্ষণ ভয় করে আমার। সারাক্ষণ উদ্বেগ। মা-বাবা কথা বললেই, দাদারা কথা বললেই আমার সন্দেহ হয়। ওরা আমাকে ফেরত পাঠাবার চক্রান্ত করছে। আমি খিটখিট করি। ঝগড়া করি দাদাদের সঙ্গে। ঝগড়া— যা আমার স্বভাবে ছিল না। এখন প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, বিয়ে করেও আমার কোনও খুশির ভাব নেই কারণ দিব্যেন্দু আমার প্রেমিক। আমি মাকেও সন্দেহ করি এখন। আমার শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। এক সকালে, সকলেই সংসারের কাজে ব্যস্ত যখন, মা-র ব্যাগ থেকে তিনশো টাকা চুরি করি আমি। বেরিয়ে যাই। শিলিগুড়ির বাসে চেপে বসি। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে টিকিট কাটি। কোনও ট্রেনে রিজার্ভেশন নেই। অবশেষে তিনটের সময় কামরূপ এক্সপ্রেস এলে উঠে পড়ি লেডিজ কামরায়। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি। মাথা দপদপ করে। যে-কোনও লোক দেখলেই ধক করে ওঠে বুক। মনে হয় ওই তো বড়দা! কিংবা ছোড়দা!

অবশেষে ট্রেন ছাড়লে বুক ভরে শ্বাস নিই আমি। খবরের কাগজ কিনি। রাতে সবাই সমস্ত বার্থে শুয়ে পড়লে দুটি সিটের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় কাগজ বিছাই আমি। আমার দু'জন সঙ্গী জুটে যায়। দুই বোন তারা। রিজার্ভেশন ছাড়াই চলেছে। তারা আমার কথা জিগ্যেস করে। আমি বানিয়ে বানিয়ে কত কী বলি। তারা তাদের খাবারের ভাগ দেয় আমাকে। খেয়ে আমরা শুয়ে পড়ি গা ঘেঁষে। মেঝেতেই। চলেছিস-চলেছিস-চলেছিস-চলেছিস বলতে বলতে ছুটে যায় ট্রেন।

ভোরবেলা আমি কৃষ্ণাদির ফ্ল্যাটে এসে দাঁড়াই। ও ঘুম চোখে আমাকে দেখে চমকে ওঠে। আমি সংক্ষেপে বলি সব। ও গম্ভীর হয়ে যায়। বলে— ওরা তোমাকে এখানে খুঁজতে আসবে। আর এক দিন তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, তখন এসেছিল।

আমি বলি— আমাকে ধরিয়ে দিয়ো না কৃষ্ণাদি।

—না। দেব না। তুমি স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নাও। খুব নোংরা দেখাচ্ছে তোমায়। ওরা চলে আসবে।

এবং ওরা আসে। কৃষ্ণাদি আমাকে পাশের ঘরে চালান করে বাইরে থেকে

BanglaBook.org

দরজা টেনে দেয়। কৃষ্ণাদির পাগল মায়ের সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নামে আমার। বুকের বাঁ দিকে শিরশির করে। গলা শুকিয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি দরজা খুলে গেল! আমি একবারও ভাবি না, এই ভাবে চলে এসে কতখানি বিপদগ্রস্ত করেছি ওদের। বরং চারপাশে তাকাই। দরজা খুলে ওরা ঢুকলেই আমি লাফ দেব জানালা দিয়ে। কিন্তু জানালার গ্রিল নিঃশব্দে হাসে। কৃষ্ণাদির মা-ও হাসে, নিঃশব্দে, দোলে, হাতছানি দেয়। ওর দন্তহীন লাল মাড়ি বীভৎস লাগে। গায়ে কাঁটা দেয়।

ওরা চলে গেলে কৃষ্ণাদি দরজা খোলে। আমি ঢক-ঢক করে জল খাই। কৃষ্ণাদি বলে—তোমার মা, বড়দা আর মিষ্টিকাকু আসছেন।

কৃষ্ণাদি অফিস যায়। আমি বার বার আইহোলে চোখ রাখি। সন্ধ্যায় ও আমার জন্য বাজার করে ফেরে। সালোয়ার কামিজ, ম্যাক্সি, টুথ ব্রাশ, তোয়ালে, সাবান। আমার মনে হয়, আমি এখানেই থেকে যাব। ওই পাগল বুড়ির সঙ্গে সারাদিন থাকি। একটু একটু করে আমার ভয় কেটে যায়। মাঝে মাঝে সন্ধের পর ওরা আসে। আমি লুকিয়ে পড়ি পাগলির ঘরে। রান্না করি, বই পড়ি, টিভি দেখি। আমার মন ভাল হয়ে যায়। কারও জন্য আমার ভাবনা হয় না। মনে হয়, ওরা কেন আসে? ওরা কেন ভাবে না আমি মরে গেছি?

সাত দিন কেটে যায়। কৃষ্ণাদিকে বলি—তুমি তো অনেক টাকা মাইনে পাও কৃষ্ণাদি?

ও বলে—কেন?

—আমাকে তোমার কাজের লোক রেখে নাও না। মাইনে দেবে। আমি সব করে দেব।

—বাজে বোকো না। তোমার মাথার ঠিক নেই।

ও ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলে—আমি খুব শিগগির দিল্লি চলে যাব। ভাল অফার আছে।

—আমিও যাব। ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।

ও কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমাকে দেখে। তারপর বলে—দেবারতি, তুমি বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করো। ওঁরা খুব চিন্তায় আছেন। তোমার মা খুবই কান্নাকাটি করছেন।

আমি চুপ করে থাকি। ও বলে যায়—ওঁরা আন্দাজ করছেন তুমি আমার কাছেই আছ। কিংবা আমি জানি তুমি কোথায়।

—কী করে?

BanglaBook.org

আমি কাঁপা গলায় জিগ্যেস করি। ও বলে—কারণ একমাত্র আমারই তোমার জন্য কোনও উদ্বেগ নেই। যেটা খুব অদ্ভুত। এ বার ওরা মিসিং ডায়রি করবে। টিভিতে প্রচার করবে তোমার মুখ। তুমি লুকিয়ে থাকতে পারবে না দেবারতি। আমিও মুশকিলে পড়ব।

অবশেষে আমি দেখা করি মা, মিষ্টিকাকা ও বড়দার সঙ্গে। নন্দনে। নন্দনের পুকুরপাড়ে বসে মা হাউ-হাউ করে কাঁদে। বলে—শানু, আমার সব কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয়। আমিই তোকে কলকাতায় এনেছিলাম। না আনলে তোর এই পরিণতি হত না।

মিষ্টিকাকা বলে—তুই না চাইলে কেউ তোকে জোর করে ফেরত পাঠাবে না। আমি তোকে কথা দিচ্ছি।

ফিরে যাই উজানিগরে। নীল আসে স্টেশনে। সবাই খুব হেসে হেসে কথা বলে ওর সঙ্গে। আমি মুখ ফিরিয়ে থাকি। বাড়ি পৌঁছে কী যেন হয় আমার। হাত-মুখ ধোয়া নেই, খাওয়া নেই, পরিষ্কার নেই—আমার মাথার মধ্যে কী একটা ছটফট করে! কী একটা বেরিয়ে আসতে চায়! অসংখ্য অগুনতি শব্দ আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘোরে। উদ্ভ্রান্ত লাগে আমার। দিশেহারা লাগে। আমি, বাবার টেবিল থেকে টেনে নিই কাগজ, টেনে নিই কলম, লিখতে থাকি। শব্দ লিখতে থাকি। কথাদের লিখতে থাকি। লিখতে থাকি ঝড়ের মতো। আমার প্রথম কবিতা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এবং এক স্থায়ী উপসর্গের মতো সে আসতেই থাকে বারংবার। আমাকে সে নিয়ে যায় এক অসামান্যের জগতে। এক অসাধারণেরও। সেই আত্মগত উপলব্ধির সঙ্গে পৃথিবীর আর কিছু তুলনীয় নয়। তাকে সম্পূর্ণ আনন্দ বলতে পারি না আমি, সম্পূর্ণ যন্ত্রণাও নয়। প্রকৃত পক্ষে কোনও নামই আমি দিতে পারি না এই অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিকে। শুধু বুঝতে থাকি ক্রমাগত, এ ছাড়া আমার উপায় নেই।

শুধু লিখি আর পড়ি। বড়দার শিশুটি জড়াই। সেই স্পর্শের কোমল অনুভূতির দ্বারা আমি স্নিগ্ধ হই। মিষ্টিকাকা এক দিন জ্যোতিষ সঙ্গে নিয়ে আসে। সে আমার জন্মছক, আমার হস্তরেখা বিচার করে গম্ভীর নিদান দেয়। আমার আঙুলে ওঠে বৈদুর্যমণি, নীলকান্তমণি, মুক্তো। মা, মাসে মাসে শোধ দেবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে ওগুলি খরিদ করে। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চায়। আমি কবিতা লিখি। বাবা বলে—চাকরির চেষ্টা কর। কবিতা লিখে কী হবে?

মিষ্টিকাকা বলে—কবিতার খাতা নে। চল, রবার্টের মাঠে যাই।

রবার্টের মাঠ উজানিগরের সবার প্রিয়। এ প্রান্ত থেকে দেখা যায় না অন্য প্রান্ত। গাছগাছালি ঘেরা এই মাঠে এক সময় গল্ফ খেলত ইউরোপীয়রা। আমারও প্রিয় এ মাঠ। খুব ছোটবেলায় বাবা এইখানে আমাদের নিয়ে আসত। দাদারা ছুটত, দিদি লাফাত। আর আমি বাবার কোলে বসে থাকতাম। গালে গাল দিয়ে। বাবার বাসি দাড়ি ফুটত আমার গালে। নাকে লাগত সিগারেটের গন্ধ। সেই সময় বাবা ততখানি শাসক ছিল না।

এই মাঠে এলে বিশালতার কাছে দাঁড়াবার অনুভূতি হয়। সমুদ্রের কাছে যাবার মতো। নিজেকে ক্ষুদ্র, সামান্য মনে হয়। ছোট-খাটো স্বার্থের তুচ্ছতা ধরা পড়ে অর্থহীনতার গর্ভে।

মিষ্টিকাকা আর আমি বসি মুখোমুখি। ও আমার খাতা দেখে। পড়ে। উৎসাহ দেয়। এবং ঝোলা থেকে ডায়রি বার করে। সেই ডায়রি, যা আমি দিব্যেন্দুর কাছে রেখে এসেছিলাম। আমি অবাক তাকাই। ও, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে, ওটা

BanglaBook.org

ফেরত দিয়ে বলে— তোকে পাচ্ছিলাম না, আমরা দিব্যেন্দুর বাড়িতে গেলাম। বললাম, কিছু জানা থাকলে বলো। না হলে এ বার আমরা পুলিশে যাব। পুলিশ কিন্তু এখানেও আসবে। ও তখন তোর যা যা ছিল বার করে দিল। এমনি ছেলে ভাল। তবে ভিতু আর কী!

ও অল্প হাসে। আমি কাঠ হয়ে শুনি। দিব্যেন্দু... ও বলে—আমি জানতাম তুই একদিন লিখবি। কারণ এই ডায়রিটা আমি পড়েছি।

আমি ঘাস ছিঁড়ি দ্রুত। নখ দিয়ে মাটি তুলি। চুরি করে কারও ডায়রি পড়া গর্হিত কাজ। খুনের চেয়েও বড় অপরাধ আমি বলি তাকে। ওর মধ্যে ছিল আমার সমস্ত গোপনীয়তা! আমি কাঁপতে থাকি উত্তেজনায়। ওর দিকে তাকাই। ও কিন্তু তাকায় না আমার দিকে। দূরের দিকে তাকিয়ে বলে—হয়তো তুই রেগে যাচ্ছিস। কিন্তু আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। ভয় ছিল তুই হয়তো কোনও কুচক্রে পড়েছিস। তোকে ফিরে পাবার জন্য ন্যায়-অন্যায় সবই করতে পারতাম।

আমি চুপ করে থাকি। ও বলে চলে—ভুল আমাদের সবার জীবনে থাকে। তাকে শোধরানো যায়। সবাই বলে তোর সম্ভাবনা ছিল। আমি মনে করি, তা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এই ডায়রি আসলে একটা উপন্যাস।

আমি জিগ্যেস করি না আর কেউ এ ডায়রি পড়েছে কিনা। জেনে কী হবে?

নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি আমি ক্রমশ। উদাসীন। কিংবা হয়তো ঔদাসীন্য নয়। এক গোপন প্রতিক্রিয়া ও নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকে হয়তো ভেতরে, আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

আমি দেখি বউদিরা গুম হয়ে থাকে। প্রতিদিন ঝগড়া হয় দাদাদের সঙ্গে। দেখি, মা হাঁপায় যখন এক বউদি না খেয়ে দোর বন্ধ করে, অন্য বউদি বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেয়। ব্যথিত নিষ্প্রভ চোখ মেলে মা তাকিয়ে থাকে দূর আকাশের দিকে। বাবার মুখে বলিরেখা প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়। এ সংসার, এই বাড়ি, এখানে আমার জন্ম হয়েছিল, এখানে আমি বেড়ে উঠেছিলাম, এখন এ সংসারের সুখ-শান্তির প্রতিবন্ধক আমি। আমি বিদ্ধ হই। গোপনে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে আমার বুকের থেকে। এই অসহায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আমি ফিরে যাই কবিতার কাছে। এবং ছ'মাস পেরিয়ে মিষ্টিকাকা আবার আমাকে রবার্টের মাঠে নিয়ে যায়। ওর মুখে আছে দৃঢ়তা। আছে আত্মবিশ্বাস। খুব শান্ত ভাবে ও অমোঘ উচ্চারণ করতে পারে।

ও আমার মুখোমুখি বসে কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়ে বলে—তোকে একটা কথা বলি। লিখতে যদি চাস তাহলে কলকাতায় থাকা জরুরি। তুই ভাল লিখছিস।

BanglaBook.org

এই আমাকে দ্যাখ, শুধুমাত্র কলকাতায় থাকি না বলে আমি এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রইলাম। আমাকে দেখে শিক্ষা নে। বরানগরের বাড়িটা, অন্য কিছু নয়, শুধু কলকাতায় থাকার জায়গা হিসেবে নে।

ওর কূট প্রস্তাব বুঝতে পারি আমি। চুপ করে থাকি। ও জানে আমি অনন্যোপায়। সকলেই জানে। কোথায় যাব আমি? আমার যাবার কোনও জায়গা নেই।

নীল আসে আমাকে নিতে। বলে—ও বাড়িতে সবাই তোমার পথ চেয়ে আছে।

আমি নীলের সঙ্গে যাই। আমাদের সঙ্গে যায় একটি চিঠি, নীলের বাবাকে লেখা আমার বাবার চিঠি।

রকেট বাসের এলানো সিটে শুয়ে আমার হাতে হাত রাখে নীল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—আমরা আবার নতুন করে শুরু করব শান।

সেই নতুন করে শুরু করার তাগিদে, কলকাতায় ফেরার তিন মাস পরে আমি গর্ভবতী হই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মাতৃত্ব

এই তিন মাসে বাড়ির হাওয়া অনুধাবন করি আমি। নীল ব্যবসা চালাতে পারছে না। লাভের কণামাত্র নেই, এদিকে প্রতি মাসে টাকা নিয়ে ঢালছে। ইদানীং মায়ের সঙ্গে ছেলের ঝগড়া হয় প্রায়ই। ছেলে টাকা চায়। মা দেয় না। চিৎকার চেঁচামেচি হয়। অবশেষে মাধবী ব্যাঙ্কে যায়। তাতেও রক্ষা হয় না। এ বার ও ধার নিতে শুরু করে। প্রভাতদার কাছে থেকে এক লক্ষ টাকা নেয়। সেই প্রভাতদা, যে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কোনও এক জয়শোয়ালের কাছ থেকে নেয়। এক অমিত বোসের কাছ থেকে নেয়। তারা ফোন করে বাড়িতে। বিশ্রী কথাবার্তা বলে। বেশির ভাগ দুপুরের দিকে আসে সেই ফোন। কেন, আমি জানি না। আমি ফোন ধরি। শুনি। হজম করি। এগুলো আমার কথা নয়, তাই গোপনও করি না। মাধবী ও শিবানন্দকে নিয়মমাফিক জানাই। হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো অশান্তির দুর্গন্ধ ধোঁয়া ঘরে জমে থাকে। নীল প্রায় রাত্রেই পেচ্ছাপ করে আমার গা ভিজিয়ে দেয়।

কটুভাষ্য শুনে, ব্যঙ্গোক্তি শুনে, ঝগড়া-বিবাদ শুনে, হা-হুতাশ দেখে, সর্বাঙ্গে পেচ্ছাপ মেখে বড় হতে থাকে আমার সন্তান। তার আগমন সম্ভাবনায় কারও হৃদয়ে আনন্দের অভিব্যঞ্জনা জাগে না। জাগে না এমনকী আমারও। মাধবী আমায় নিয়ে গিয়ে মাতৃসদনে নাম লিখিয়ে আসে।

গর্ভসঞ্চারের জন্য কোনও কাজে অব্যাহতি পাই না আমি। মাছের ঝোলের গন্ধে বমি আসে, তবু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাঁধি মাছের ঝোল। আমার জামাকাপড়, চাদর, মশারি ঝি-কে কাচতে দিলে রাগ করে মাধবী। বলে—এত কিছু দিলে তো ও ছেড়ে চলে যাবে।

আমি তাই কাচতে বসি কুয়োপারে। তিনতলায় ছাতে কাপড় মেলতে যাই। কষ্ট হয়। হাঁপ ধরে। তবু যাই। খিদে পায়। খিদের কথা বললে বিরক্ত হয় মাধবী। তাই দিদির কাছে যাই। ও যা পারে খেতে দেয়। মা ষষ্ঠীর বেড়ালের মতো ওর ঘরে চুপিচুপি খেয়ে আমি নেমে আসি। এক দুপুরে আমার খুব মাখন খেতে ইচ্ছে করে। আমি একটা চামচ নিয়ে দরজায় ছিটকিনি দিই। ফ্রিজ থেকে বের করে

BanglaBook.org

আনি মাখনের ডেলা। কেটে তুলি একখণ্ড। মুখে দিয়ে আমার কান্না পেয়ে যায়। মা-র কথা মনে পড়ে! মা! আমি তো কখনও খাবার চুরি করে খাইনি!

খেতে পারি না। থু-থু করে ফেলে দিই মুখ থেকে। উজানিনগরে যেতে পারি না আমি। মা-র শরীর খারাপ। কে দায়িত্ব নেবে?

তবু এক দিন ঘটা করে আমার সাধ দেয় মাধবী। আমাকে সোনার গয়না গড়িয়ে দেয়। শাঁখা-বাঁধানো। গলার হার। কানপাশা। আমার ওজন বেড়ে যায় খুব। এবং এক দিন, সমস্ত জন্মঘটনার মতো জল ভাঙলে আমি মাতৃসদনে নীত হই। আরও তিরিশটি মহিলার সঙ্গে শুয়ে, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম দিই আমি।

পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু ক্ষীণ। সে বুঝি-বা অত কটুভাষ্য শোনার অভিমানে, প্রস্রাবে স্নাত হওয়ার অভিমানে, হলুদ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার আগমন সম্ভাবনাকে সমাদর করেনি কেউ, এই কষ্টে সে মৃতপ্রায়। সুগার ও জন্ডিস তার। মাথায় জল জমে আছে। তথাপি, তাকে আমার বুকের কাছে ধরলে সে মাতৃস্তন্য পান করতে চায়। পারে না। ঢলে পড়ে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে আমাকে ছেড়ে যায়। আমার নিরানন্দ মাতৃত্বকে অব্যাহতি দিয়ে ছেড়ে যায়। এ-ও ছেড়ে যাওয়া জীবনের। আমি তাকে একবার কোলে নিতে চাই। শেষবার। ঠাণ্ডা শক্ত দেহটি খুঁজে খুঁজে দেখি। কী আমি জানি না। এক সময় ওরা তাকে নিয়ে যায়। শূন্য কোল। তবু আমি তাকে অনুভব করি। মনে পড়ে, আমার মনে পড়ে, এ রকমই একটি চরিত্রে আমি অভিনয় করেছিলাম। ওরা, দুধ শুকোবার ইঞ্জেকশন দেয় আমাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাবা আর ছোড়দা আসে এ বার আমায় নিয়ে যেতে। খুব যত্ন করে বউদিরা। আমি কী খেতে ভালবাসি মা-র কাছ থেকে জেনে নিয়ে বাজার করে দাদারা। মা আমাকে মাঠে নিয়ে যায়। মা-র হাত ধরে হাঁটি। এক দিন, আমাদের পোস্ট অফিসের পুরনো পিওন বিনোদ মিশ্রজিকে মাঠে বসে চাটাই বুনতে দেখি। ও অবসর নিয়েছে। ওর সাতটি সন্তানের মধ্যে দু'জন আমার সহপাঠী ছিল। আমাকে দেখে ও হাসে। মুখের সমস্ত চামড়ায় ভাঁজ পড়ে ওর। আমাকে ও জিগ্যেস করে—ভাল আছ তো শানু বিটিয়া?

আমি দেখি ওকে। দেখতেই থাকি। আমার মাথার ভিতর ঝড়ের মতো কাহিনি আসতে থাকে। পর্বের পর পর্ব। ভূতগ্রস্তের মতো ফিরি আমি। কাগজ কলম নিয়ে বসি। বিহারের মানুষ বিনোদ পিওন, এক সাধারণ গৃহস্থ, সাত সন্তানের বাপ, আমার চোখে আশ্চর্য মানুষ হয়ে ধরা দেয়। আমি লিখতে থাকি, কী করে আমি জানি না, কে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় জানি না, লিখতে থাকি আমার প্রথম উপন্যাসের প্রথম লাইন—আদিগন্ত তুলাপিঞ্জির খেত। হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান আবাদ। পরের মাসেই পাক ধরবে। বুক ভরে সুবাস নেবে সবাই...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নীল নীল

ক্যুরিয়ারের সঙ্গে একটি ভ্রমণ সংস্থা করেছে নীল। মাধবী আরও টাকা দিয়েছে ওকে। এখনও ও লাভ দেখাতে পারেনি। শোধ দিতে পারেনি কারওকে একটি পয়সাও। গলা অবধি ঋণ নিয়ে ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় উত্তমর্ণের কাছ থেকে। অজস্র মিথ্যে কথা বলে। ওর মাকে দিয়ে বলায়। বাড়িতে থাকলেও বলে বাড়ি নেই। কলকাতায় থাকলে বলে শহরের বাইরে আছে। জীবনের চাকচিক্য তাতে এতটুকু কমেনি। এখনও ব্র্যান্ডেড। মাধবী এখনও পুজোয় নিজের জন্য কেনে আঠারোটা শাড়ি। তার মধ্যে অন্তত দু'টি গাদোয়াল কিংবা বালুচরী। আমার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে। সাদা-মাটা শাড়ি দু'-চারটে দেখায়। একই ঘরে বসবাস করে কতদিন লুকনো সম্ভব! আমি জেনে যাই। দেখে ফেলি। বড় অপমানে লাগে। কেন ও লুকোয় আমার থেকে? ও কি ভাবে, আমি ভাগ চাইব? বলব, আমাকেও দিন এমন দামি গাদোয়াল, বালুচরী, কাঞ্জিভরম? ও কেন বোঝে না আমার প্রবৃত্তি এমন নয়?

নীল ব্র্যান্ডেড কিন্তু আমি নই। কারণ নীল আমার জন্য কোনও খরচ করে না। ও তো লাভ করছে না। কী করে খরচ করবে? আমারও নেই জোর করার, চাইবার স্বভাব! আমার বিপন্ন লাগে, মাধবী-শিবানন্দ আমাকে খেতে-পরতে দেয়। তবু একেবারে ব্যক্তিগত জিনিসের জন্য আমি কার কাছে হাত পাতব? মাধবীকে বলি—টিউশ্যন করব। আমাকে ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় করে দিন।

ও বলে—বাড়ির বউ তুমি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াবে নাকি?

—না। বাড়িতে বসেই পড়াব।

ওর কী মনে হয়, এনে দেয় আমাকে দুটি ছাত্র-ছাত্রী। একটা সিক্স, একটা সেভেন। চারশো টাকা রোজগার হয় আমার। নীলকে বলি—তুমি ব্যবসা পারছ না। চাকরির চেষ্টা করো। দেখো, আমার তো তেমন চাহিদা নেই। তোমার একটা ছোট-খাটো চাকরি হলে, টিউশ্যন করে আমি ঠিক চালিয়ে দেব।

ও শোনে। জবাব দেয় না। ওর চোখে অর্থের লোভ। সফল ব্যবসায়ী হওয়ার মোহ। ও বিভিন্ন দল নিয়ে ভ্রমণে যায়। ফেরে। মহিলা কণ্ঠরা ফোন করে ওকে।

BanglaBook.org

মাধবী পছন্দ করে না। ওকে জিগ্যেস করে। ও চুপ করে থাকে। এক দিন একজন উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে চায়। মাধবী বলে—কে বলছেন?

কণ্ঠ বলে—আমি ওর বান্ধবী।

—ও তো নেই। ওর বউকে দেব?

—বউ? ইজ হি ম্যারেড?

—শুধু ম্যারেড নয়। ওর বউ রীতিমতো সুন্দরী!

আমার সামনেই ঘটে ঘটনাটা। কণ্ঠের কথাগুলো আমি মাধবীর জবাব থেকে অনুমান করে নিই। মনে পড়ে আমার। আমার ঠোঁট দেখলে মাধবীর গা গুলোয়, হাসি দেখলে, হাঁটা দেখলে, খাওয়া দেখলে।

আমি নীলকে কিছু বলি না। কিছু খবর পৌঁছয়। মেয়েরা তো ওকে পছন্দ করবেই। ও অত সুন্দর। মা বলে, জেসাস ক্রাইস্ট! আমি আমার পরিত্যক্ত প্রেমিকদের কথা ভাবি। সঞ্জয়দা, অমিতেশদা, শুভাশিস, সুশান্ত জানা—আমি ওদের অকারণ কষ্ট দিয়েছিলাম। এখন সেই কষ্ট আমায় ফিরে লাগে। ওরা কোথায় আছে, কেমন আছে, জানি না। জানি না দীপায়ন, ঋতবান—কারও কোনও কথা। দিব্যেন্দু, কৃষ্ণাদি কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার। যোগাযোগ রাখে একমাত্র সুশান্ত জানা। বছরে অন্তত দুটো চিঠি লেখে। একটা ওর জন্মদিনে। একটা আমার। মাঝে-সাঝে আসে বলে কেউ ওর চিঠি নজর করে না। না হলে এ নিয়ে অশান্তি হতে পারত। আমি জেনেছি ওর এম এসসি-র খবর। পিএইচডি-র খবর। আমি ভাবি ওদের কথা। যখন একা থাকি। ওরা সবাই আমাকে ভালবেসেছিল। আর নীল? নীল আমাকে ভালবাসে না। তাহলে বিয়ে করেছিল কেন? ও যা চায়, তাই পায়। আমাকে ও চেয়েছিল, পেয়েছে। এখন ও টাকা চায়। কিন্তু ভ্রমণ সংস্থাও দেয় না ওকে প্রত্যাশিত লাভ। ও মাধবী ও শিবানন্দকে বোঝায়—ছোট ব্যবসা করে হবে না। বড় বিনিয়োগ করে বড় লাভ তুলতে হবে। তাহলে সব ধার শোধ করেও অর্থের অভাব হবে না।

কী সেই ব্যবসা?

বাৎসরিক চার লক্ষ টাকা লিজে দার্জিলিঙে হোটেল নেয় ও। চার লক্ষ টাকা দিয়ে দেয় শিবানন্দ। আমি বারণ করি—দেবেন না। ও নষ্ট করবে।

মাধবী খেঁকিয়ে ওঠে—কী যা-তা বলো। ছেলেটার জন্য চেষ্টা করতে হবে না? কেউ কেউ দেরিতে দাঁড়ায়।

ও প্রায়ই চলে যায় দার্জিলিং। এখন ও তিনটে সংস্থার মালিক। ক্যারিয়ার, ভ্রমণ সংস্থা, হোটেল। ওর ঝকমকে কার্ডে তারই ফলাও বিবরণ। আমরাও একবার

BanglaBook.org

দার্জিলিং যাই। ওর হোটেল দেখতে। চমৎকার হোটেল দেখে ফিরি। সেই সঙ্গে জানকারি কিছু। হোটেলের সুন্দরী নেপালি রিসেপশনিস্টের সঙ্গে ওর তুমুল প্রেম! মাধবী বিষণ্ণতার সঙ্গে বলে—বরকে আগলে রাখতে জানতে হয়। পুরুষ মানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

একবারের জন্যও নীলের কাছে কৈফিয়ত চাই না আমি। চিৎকার করি না এই বলে যে আর কত? কতজনকে লাগে তোমার একসঙ্গে? কতজনকে তুমি প্রতারণা করো? তুমি এমনকী বাইরে বলো না তুমি বিবাহিত...!

স্খলিত স্বরে ফিলমি কায়দায় বলি না—আমার কী নেই নীল? যা ওদের আছে?

আমি স্বপ্ন বুনি। কিংবা এক স্বপ্ন ভেঙে অন্য স্বপ্নে যাই। থাকব না। থাকব না এখানে। চলে যাব। কোথায় যাব, কবে যাব, জানি না। কিন্তু যাব। জীবনের শেষ পাঁচ বছরের জন্য হলেও মুক্তির তপস্যা আমি থামাব না।

আমাদের মধ্যে অবিশ্বাসের ইট গাঁথা পূর্ণ হতে থাকে। এবং বিছানা চিরকালের মতো শীতল হয়ে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শেষ মার

এক বছর পূর্ণ হলে হিসেব-নিকেশের পালা আসে, হোটেলের লিজ ফুরোয়। ওকে মাঝখানে রেখে মাধবী ও শিবানন্দ বসে। এ বার নীলরতনও যোগ দেয়। নীলরতন ওর মামা।

ও দেখায়, লাভ হয়নি, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। এবং লাভ যা হয়েছে তা হল, হোটেল ব্যবসায় প্রভূত অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে। এ বারের ক্ষতি অনভিজ্ঞতাজনিত। আর একবার লিজ নিলেই ও ডবল লাভ করে দেখিয়ে দেবে।

মাধবী লাফিয়ে ওঠে এ বার—আর একবার? কিছুতেই না।

শিবানন্দ বলে—তুই কি আমাদের সর্বস্বান্ত করবি?

—সর্বস্বান্ত হতে বাকি কী!

মাধবী ওকে সাবধানে তিরস্কার করে যাতে আমি শুনতে না পাই। নীলরতন সাবধানে ধমক দেয়। কিন্তু আমি শুনতে পাই সব। নীল ওদের বোঝাতে চায়—এ বারে আমি সাড়ে তিন লাখে লিজ পাব। এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

—সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, টাকা আসবে কোত্থেকে?

—তোমরা কিছু দাও, মামা কিছু দিক, বাকিটা আমি যোগাড় করছি।

—তুই কোত্থেকে যোগাড় করবি? তোর যোগাড় মানে তো ধার। গলা অব্দি ধারে ডুবে আছিস। বেআক্কেলে ছেলে কোথাকার। তোর জন্য আমাদের গলায় দড়ি দিতে হবে।

আমার মনে পড়ে, কিছু দিন আগে কাগজে এরকম একটা খবর দেখেছিলাম। ছেলের বিপুল ঋণের বোঝা টানতে না পেরে মা-বাবা বিষ খেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নীল প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ও হাল ছাড়ে না। মরিয়া হয়ে টাকার জন্য ঘোরে। এক দিন আমাকে বলে—তোমার মিষ্টিকাকার কাছ থেকে লাখখানেক টাকা এনে দাও আমায়।

আমি বলি—পারব না।

ও অনুনয়-বিনয় করে, দার্জিলিঙে আমরা নতুন করে আলাদা সংসার পাতব—

BanglaBook.org

বলে। আমি বিশ্বাস করি না। তবু বলি—আমাকে নিয়ে গেলে উর্মিলার কী হবে? তোমার রিসেপশনিস্ট?

—ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, বিশ্বাস করো।

আমি বিশ্বাস করি না। টাকাও চাইতে পারব না বলি। ও চুপ করে থাকে। মধ্যরাতে খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার। দেখি ভাঁড়ার ঘরে মাধবীর স্টিলের আলমারির সামনে টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে। চমকে উঠি। চোর ঢুকল? একটু পরেই আলো নিবে যায়। আলমারি বন্ধ করার মৃদু শব্দ পাই আমি। ও ঘরে আসে। আমি মড়ার মতো পড়ে থাকি। নাইট ল্যাম্প জ্বেলে টাকা গোনে ও। আমার ভেতরে ছিছিক্কার হতে থাকে। তখনও জানি না সকালবেলা আরও কত বাকি!

অস্থির অস্থির লাগে আমার। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। আমি দেখেছি, মাধবী আলমারি খুলেছে, এমন সময় আমি এসে পড়লেই ও তাড়াতাড়ি পাল্লা বন্ধ করে দেয়। টাকা কম দেখলে ও কী ভাববে? মনে করবে না, আমিই নিয়েছি? আমি ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। গাদা কাপড় নিয়ে কাচতে যাই। নীলের প্যান্টের পকেটে শক্ত শক্ত কী ঠেকে। বের করে দেখি মেরুন গার্নেটের হার। প্রথমে চমকে উঠি। কার হার ওর পকেটে? সাবান-মাখা হাতে বসে থাকি চুপ করে। এ বার এই মেরুন গার্নেট আমার চেনা-চেনা লাগে। মেরুন গার্নেটের ওপর ছ'টা সোনার পাত বসানো একটা হার দিদি আমাকে উপহার দিয়েছিল। সেটা ছিল আমার আলমারির লকারে। আর ছিল মাধবীর দেওয়া শাঁখা-বাঁধানো। বাকিগুলো আমি মাধবীকেই রাখতে দিয়েছিলাম। এ কি সেই হার, না অন্য? দিদির দেওয়া সেই হার?

আমি হাত ধুই। কাপড় কুয়োতলায় ফেলে রেখে ঘরে যাই। আলমারি খুলি। আলমারিতে শাঁখা-জোড়া আছে। সোনা নেই। হার নেই। আমি নীলকে ফোন করি। ইতিমধ্যে ও একটা মোবাইলও নিয়েছে। বলি—তুমি আমার গার্নেটের হার থেকে সোনার পাতগুলো খুলে নিয়েছ?

ও একটু নীরব থেকে বলে—বিশ্বাস করো, নতুন হার গড়িয়ে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। ওটা আমার পছন্দ ছিল না।

আমি বিশ্বাস করি না, বলি—আর শাঁখার সোনাটাও খুলে নিয়েছ। কেন নীল? এটাও কি আমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য?

ও কথা বলে না। আমিই বলি—ওই সামান্য সোনা বেচে তুমি তো হোটেল লিজ নিতে পারবে না। তাহলে কেন এ কাজ করলে?

BanglaBook.org

ও লাইন কেটে দেয়। ক'দিন আগেই সম্পাদক তপেশ ভৌমিকের ব্যাপারটা ঘটেছে। মাধবী ও শিবানন্দকে জানাই আমি। কে জানে, কখন কী দোষ চাপে ঘাড়ে! যদিও মাঝরাতে আলমারি খুলে টাকা নেবার কথা চেপে যাই। নীল নিজের বাবা-মায়ের টাকা চুরি করেছে, মুখ ফুটে বলতে পারি না কিছুতেই। কিন্তু গয়না ইত্যাদির কথা শুনে শিবানন্দ গুম হয়ে যায়। মাধবী চোখে আঁচল-চাপা দেয়। ও ফিরলে ওকে তিরস্কার করে—এত নীচে নেমে গেছিস তুই?

নীল ক'দিন খুব নরম ব্যবহার করে আমার সঙ্গে, রাতে তাড়াতাড়ি ফেরে। ঘরে থাকে। কিশোরকুমারের ক্যাসেট আনে আমার জন্য। আমি ভালবাসি কিশোরকুমার। এক দিন দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে। বলি—কী ব্যাপার?

ও বলে—তুমি কিন্তু আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছ।

ওর এই কথাটা তোষণ বুঝতে পেরেও আমি বিশ্বাস করে ফেলি। নিজের সৌন্দর্যের প্রতি অসীম দুর্বলতা মানুষের। আমিও দুর্বল হই। ভাবি, একটা অপরাধ করে ফেলেছে। তাই হয়তো বিবেক-যন্ত্রণা হচ্ছে। ভাবছে কী করে আমাকে খুশি করা যায়! যদিও খুব উছলে উঠি না, তবু সেদিন আয়নার কাছে দাঁড়াই। দিন দুয়েক পর ও বলে—আমার এক ক্লায়েন্ট ডিনারের নেমন্তন্ন করেছেন। সন্ধ্যায় তৈরি থেকো।

আমি জানাই—আমি যাব না।

ও জোর করে—চলো প্লিজ! এরকম কোরো না। এগুলো খুব ফর্মাল ব্যাপার। তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

মাধবী বলে— যাও না, এত করে বলছে।

কেন বলছে, সেটাই তো আমার প্রশ্ন। কখনও বলে না।

—যাও। অত জেদ করতে নেই। একসঙ্গে থাকতে গেলে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়।

বুঝতে পারি ও কী ভুলে যাবার কথা বলছে। অথচ নতুন বিয়ের পর নীলের সঙ্গে বেরোতে চাইলে মাধবীর মুখ ভার হয়ে যেত। কত কৈফিয়ৎ দিতে হত কোথাও যেতে হলে। এখন ও নিজেই আমাকে ঠেলে পাঠাতে চায়। আড়ালে বলে, স্বামীকে হাতে রাখতে জানতে হয়। ও জানে না, এতে আমার যায় আসে না কিছুই। আমি তো এক দিনও কোনও মেয়েকে নিয়ে নীলের সঙ্গে ঝগড়া করিনি। আমি স্রেফ সরে গেছি। নির্বিরোধ শীতলতার মধ্যে দিয়ে আমার আত্মাভিমান নিয়ে সরে গেছি।

BanglaBook.org

অবশেষে রাজি হই আমি। ও বলে— ভাল করে সাজো একটু।

আমি বলি— কী সাজব? কী সাজাতে চাও? জানো তো, গয়নাও পরি না, মেক-আপও করি না। এর বেশি তো আর সম্ভব নয়।

তবু, একটা তুঁতে রঙের সিল্ক পরি আমি। পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে কালো ব্লাউজ পরি। টিপ পরি কালো। আলতো হাত-খোঁপা ঝুলিয়ে দিই ঘাড়ের কাছে। অনেক দিন পর আমি প্রসাধিতা হয়ে উঠি। নীল একটা ট্যাক্সি নেয়। আমি বলি— ট্যাক্সি নিলে? অনেক বাড়তি খরচ হবে তো। তার চেয়ে মিনিবাসে...

ও বলে— এত সুন্দর লাগছে তোমায়, বাসে কি নিয়ে যাওয়া যায়?

— এতকাল তো বাসেই এলাম গেলাম।

— আর বাসে উঠতে হবে না।

ওর কথা শুনে আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। আমি খুশি হয়ে উঠি না এই ভেবে যে দামি গাড়িতে দামি শাড়ি পরে ঘুরতে চলেছি অচিরেই। হঠাৎ কী করে পালটে যাবে আমার জীবন! আমি হঠাৎ বিত্তশালী হয়ে ওঠার জন্য লালায়িতও নই। আর কথা বাড়াই না যদিও। পথে ওকে অস্থির লাগে। হাত থেকে লাইটার পড়ে যায়। ফিল্টারের দিকে সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। লক্ষ করি, দু'দিন ও বিলক্রিম মাখেনি। গায়েও কোনও বডি-স্প্রে-র গন্ধ নেই। আমি বলি— নিজের টাকা যোগাড় করতে পেরেছ?

ও একটু চমকে ওঠে। বলে— দেখি। কথা হয়েছে একজনের সঙ্গে।

আমার কী মনে হয়, বলে ফেলি— যার কাছে আজ যাচ্ছি, তার সঙ্গেই?

—ওই আর কী!

ও এড়িয়ে যায়। একটা বিশাল স্টার হোটেলের কাছে থামে। আর্দালি দরজা খুলে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়। এরকম হোটেলে আমি আগে কখনও আসিনি। ও দ্রুত পায়ে ঢোকে। আমিও ঢুকি। এত বিশাল লাউঞ্জ, এত দিকে এত রকম সব বসার জায়গা, আমার দিক গুলিয়ে যায়। আমি ওকেই অনুসরণ করি। ও মোবাইলে কথা বলে এবং আমাদের সামনে একটি দরজা খুলে যায়। একটি সুদৃশ্য সুসজ্জিত রুমে আমরা ঢুকি। লম্বা, চওড়া, সামান্য ভুঁড়িদার এবং ধবধবে ফর্সা একজন আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে। নীল পরিচয় দেয়— ইনি মিস্টার সাহা।

আমার কোনও পরিচয় দেয় না ও। আমি ভাবি, দেওয়ার দরকার কী! মিস্টার ও মিসেস ভট্টাচার্যেরই যখন আসার কথা!

আমি চারপাশ তাকিয়ে দেখি। দেওয়াল জোড়া আয়না। ধূসর সোফা। পুরু ধবধবে সাদা বিছানা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা আছে। পায়ের তলায় নরম

BanglaBook.org

কার্পেট। এক পাশের দেওয়ালে কয়েকটি অ্যান্টিক পিস।

দু-একটি কথা হতে না হতে নীল ব্যস্ততা দেখায়। মিস্টার সাহা, আপনারা কথা বলুন, আমি একটু কাজ সেরে আসি। আমাকে কিছুই না বলে ও বেরিয়ে যায় দ্রুত। আমার অবাক লাগে। ও তো একবারও বলেনি ও কিছু সময়ের জন্য বেরিয়ে যাবে! আমি চুপ করে বসে থাকি। দেখি মিস্টার সাহাকে। কত বয়স হবে? পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বড় জোর। তার কমও হতে পারে। বড় বড় চোখ লোকটার, কিন্তু চোখের পল্লব কম। সুতরাং তীক্ষ্ণ নাক ও চওড়া গোঁফে ওকে দেখায় কিছুটা রাগী।

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমিও হাসি। ও উঠে ছোট্ট সেলার থেকে বোতল বার করে। দুটো গ্লাস নেয়। এসে বসে আমার পাশে। দুটো গ্লাসে ঢালে কিছুটা। জিগ্যেস করে— কী দেব সঙ্গে?

উঠে যায় আবার। ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে আসে। বলে— এটা স্কচ। আইস ছাড়া আর কিছু দেব?

আমি বলি— আমি খাব না। আপনি নিন ইচ্ছেমতো।

—আর ইউ শিওর?

সে বলে। গ্লাসে চুমুক দেয়। খুলে দেয় শার্টের দুটো বোতাম। আমার দিকে ঝুঁকে আসে খানিক। বলে— ওয়েল, কী নাম তোমার?

—দেবারতি।

বলি আমি। সরে যাই একটু। সে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে বিশাল পাঞ্জা রাখে আমার কোলে। আমি ছিটকে দাঁড়াই। বলি— এ কী ব্যবহার আপনার! ইনভাইট করে এরকম অপমান করছেন কেন?

ও আবার চুমুক দেয় গ্লাসে। ধীরে। হাসে। বলে— কেন নখরা করছ? তোমার কাজ তুমি করো। আমার কাজ আমি। এসো। আমার দেরি সহ্য হয় না।

সে উঠে দাঁড়ায়। এগোয়। আমি পেছাতে থাকি। মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে ওঠে আমার। তপেশ ভৌমিকের ভূমিকায় এখন সাহা। কী সাহা? জানি না। নীল কি তা হলে জেনেশুনেই চলে গেল? নীল? হে ভগবান! ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল না। এখন অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের পথ আমি অতিক্রম করি দারুণ যন্ত্রণায়! ঈশ্বরকে ডাকি আমি! এই বিশাল লোকটা আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

সাহা এগোতে এগোতে বলে— মানতেই হবে, ভটচাজের চোখ আছে! এসো! এরকম করছ যেন এই প্রথম।

সে আমার কাঁধের নাগাল পায়। আমার কোনও উপায় নেই। আমি বলতে

BanglaBook.org

থাকি— দেখুন, এ ঘরে আমি আর আপনি শুধু। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ক'দিন আগে একজনকে আমি লাথি মেরেছিলাম।

ও আমার আঁচল ফেলে দেয়। লাল টকটকে হয়ে ওঠে ওর মুখ। আমি স্নায়ু শক্ত করি। আঁচল তুলে নিই এক ঝটকায়। শান্ত গলায় বলি— আপনাকে মারতে পারব না। কারণ গায়ের জোরে পারব না আপনার সঙ্গে।

ও ঘনিয়ে আসে। থাবায় ধরে আমার কাঁধ। আমি বলি— সুতরাং, বিনা বাধায় আপনি আমাকে রেপ করতে পারবেন।

কী একটা হয় লোকটার। আমাকে এক ধাক্কা মারে ও। আমি দেওয়ালে ধাক্কা খাই। মাথার পেছনটা ঠুকে যায় জোরে। ও দ্রুত গিয়ে সোফায় বসে। ঢক-ঢক খেয়ে নেয় হাফ গ্লাস। রুমালে মুখ মোছে। গুলি গুলি চোখ করে এ ধার থেকে ও ধারে তাকায়। আমার ভয় করে। ও বলতে থাকে— হাউ ডেয়ার ইউ টু কল মি এ রেপিস্ট? হাউ ডেয়ার ইউ?

আমি কাঁপতে থাকি। ভাবি, আমি কি বেঁচে গেলাম? ও গজগজ করে— হ্যাঁ, আমি সেক্স এনজয় করি, আই বাই হোরস্ লাইক ইউ। বাট হাউ ডেয়ার ইউ?

আমার মাথায় আগুন জ্বলে। আমি চিৎকার করি— কী বলছেন আপনি আমাকে। কী যা তা বলছেন? আমি মি. নীলার্ণব ভট্টাচার্যের স্ত্রী দেবারতি ভট্টাচার্য। আপনি আমাদের ইনভাইট করেছেন...

কান্নায় গলা বুজে আসে আমার। আমি মেঝেয় বসে পড়ি। অপমানে নুয়ে পড়ে আমার ঘাড়। লোকটা আবার আমার সামনে দাঁড়ায়। ওর ফর্সা লম্বা পা দুটো দেখতে পাই আমি। লোমওলা চামড়ায় মোড়া চটি ওর পায়ে। ও নিচু হয়ে আমার পিঠে হাত রাখে। বলে— আই অ্যাম সরি। দেবারতি, আপনি উঠে আসুন। আমি বুঝতে পারিনি মি. ভট্টাচার্য এরকম রগ টাইপ। এরকম স্কাউন্ড্রেল।

আমি দাঁড়াই। ও বলে— যান, মুখে জল দিয়ে আসুন।

আমি ওর বাথরুমে যাই। জল দিই মুখে। পরিপাটি ভাঁজ করা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছি। আমার মাথাটা ঠুকে গেছে। ব্যথা করছে জায়গাটা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওর মুখোমুখি হতে আমার ইচ্ছে করে না। আয়নায় নিজেকে দেখি আমি। সারা দুনিয়া সম্পর্কে আমার ত্রাস জন্মায়। এবার কী করব? কোথায় যাব?

আমি বেরিয়ে আসি। দেখি ও জামার বোতাম এঁটে ভদ্র হয়েছে। হাতে গ্লাস নিয়ে বসে আছে উদাসীন ভাবে। আমাকে দেখে বলে— আসুন। বসুন।

আমি বসি ওর কোনাকুনি। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে ও বলে— কী খাবেন?

—কিছু না।

BanglaBook.org

—আইসক্রিম?

—কিছু না। প্লিজ।

—ঠিক আছে। আসুন আড্ডা মারা যাক। কী করেন আপনি?

—এই, বাড়ির কাজকর্ম। টিউশন।

–মি. ভটচাজের ব্যবসা দেখেন না?

—আমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই ব্যবসার।

—এরকম আপনাকে আগেও নিয়ে গেছেন মি. ভটচাজ?

—না। কখনও না।

—তা হলে যে বলছিলেন কাকে আপনি লাথি মেরেছেন? বাপরে, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম!

ও মজা করতে চায়। হাসে। আমি হাসি না। কারণ আমার ভাবনার জগতে চলছে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার পালা। শেষ সিদ্ধান্ত। নীল আসলে আজ আমার দারুণ উপকার করেছে।

আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলে— অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে, বলবেন না! আসলে আপনার সম্পর্কে আমার কৌতূহল হচ্ছে।

আমি বলতে পারি না, আপনার কৌতূহল মেটানোর কোনও দায় আমার নেই। পারি না কারণ লোকটার মধ্যে আমি মানবিকতা দেখতে পাই। বলি— হ্যাঁ। সে একজন পত্রিকার সম্পাদক। আমিই তার কাছে গিয়েছিলাম।

—কেন? কেন গিয়েছিলেন?

—একটা উপন্যাস লিখেছি। সেটা দিতে গেছিলাম।

—তাহলে আপনি লেখেন?

—অল্প-স্বল্প।

—কোথায় বেরিয়েছে আপনার লেখা?

—কোথাও নয় সেরকম নামকরা। দু-একটি লিটল ম্যাগে।

—লিটল ম্যাগ?

—ছোট পত্রিকা। ব্যবসা না করে অর্থাৎ নন-কমার্শিয়ালি করা। কয়েকজন হয়তো নিজের খরচে বা সামান্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পত্রিকা চালায়।

—নন্-কমার্শিয়ালি কোনও কিছু করা যায়?

—বেশিদিন যায় না। আমি এ বার যাব মি. সাহা।

—ঠিক আছে। মি. ভটচাজ আসবেন না?

—জানি না। আমি অপেক্ষা করতে চাই না।

BanglaBook.org

--ওয়েল। আমি যদি আপনাকে পৌঁছে দিই?

—বেশ তো। তা ছাড়া আমার কাছে টাকাও নেই। একা ফিরলেও আমি আপনার কাছে বাস ভাড়া চাইতাম।

—জাস্ট গিভ মি এ মিনিট।

—ঠিক আছে। একটা কথা জানতে চাই।

—বলুন।

—আপনি আমাকে অন্য রকম ভেবেছিলেন। কেন? কী কথা হয়েছিল আপনাদের?

—সত্যি কথাই বলি। আপনি সাহিত্যিক। আপনাকে বলা যায়।

এই প্রথম কেউ আমাকে সাহিত্যিক বলল। আর সে এমন একজন, যার হাতে আমি নাশ হতে পারতাম। যে আমাকে হোর বলেছিল। এ সমাজের চোখে, প্রতিটি মেয়েই, শেষ পর্যন্ত বেশ্যা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের লড়াই, সারাক্ষণ, কেবল এই প্রতিপন্ন করা যে আসলে আমরা সম্মানীয় মানুষ। বিক্রয়যোগ্য নই।

ও বলতে থাকে— আমাকে বলতে পারেন সেক্স অবসেস্‌ড। এটা আমার অনেক বেশি লাগে। আমাকে খেতে না দিলেও হবে। আমাকে কোনও কিছু না দিলেও হবে। কিন্তু আমার সেক্স চাই। ব্যবসার কাজে আমি যেখানেই যাই, আই এনজয় ইট। মি. ভটচাজকে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। বাঙালির ছেলে, ব্যবসা করছে। তো আমি ওঁকে বলেছিলাম, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, টু ব্রিং সামওয়ান ফ্রেশ। কিন্তু ভাবিনি স্কাউন্ড্রেলটা নিজের বউকে...! এ লাইনে বউকে ব্যবহার করা চলে। বাট আই ডোন্ট লাইক। স্ত্রীর একটা মর্যাদা আছে। ঘরের সম্মান রাখতে না জানলে পুরুষমানুষ কী!

আমি ওর গাড়িতে বসি। ও কাচ তুলে এসি চালায়। নিজেই স্টিয়ারিংয়ে বসে। নীরবে পথ চলতে থাকি। মনে হয় আমার জীবন একটি স্পাইরালের মতো। একটিই কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে কেবল আবর্তিত হয়, প্রতি মুহূর্তে বাঁক নেয়, একটির পর একটি চক্র তৈরি করে। কেন কবে? আমিই কি দায়ী তার জন্য? নাকি আড়াল থেকে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে কেউ? কে সে?

ও একটা কার্ড দেয় আমাকে। বলে— রাখুন। যদি কোনও দিন দরকার পড়ে। চাকরি কিংবা থাকার জায়গা। আপনি এলে আমি যত্ন করব।

বাড়ির সামনে নামি। ধন্যবাদ দিই ওকে। ডাকি না ভেতরে যাবার জন্য। ও চলে গেলে কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলি আমি। আমাকে একলা ফিরতে দেখে মাধবী আর শিবানন্দ অবাক হয়ে যায়। এ বার আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করি। মুক্তির ক্ষেত্র। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তৈরি হয় আমার ছেড়ে যাবার পালা।

BanglaBook.org

সেলাম দু'শো এক

সেপ্টেম্বরের শুরুতে এইডস ফাউন্ডেশনের ইন্টারভিউ কলটা আমি পেলাম। এইডস ফাউন্ডেশন একটা এন জি ও। বস্তি, পতিতালয়, স্টেশন, হাট ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো ওদের কাজ। এছাড়া রেডলাইট অঞ্চলে ওদের স্কুল আছে। পিতৃপরিচয়হীন হয়ে ওখানে যারা জন্মায় তাদের শিক্ষার আলোয় এনে মূল জীবনস্রোতে ওরা ফিরিয়ে দিতে চায়।

তিনবার ইন্টারভিউ নেয় ওরা আমার। এবং চাকরিটা আমি পেয়ে যাই। অক্টোবরের পুজো পার করে নভেম্বরে আমি কাজে যোগ দেব, ঠিক হয়। চব্বিশশো টাকা পাব। বছরে একবার বোনাস। ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড আছে সংস্থাটির। প্রতি মাসে সেখানে আমার নামে কিছু টাকা জমা পড়বে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি। শনি ও রবিবার। তোফা চাকরি। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী হতে পারে! কিন্তু এর জন্যও আমি ঋণী রয়ে যাই দিব্যদার কাছে। ইন্টারভিউ কল পেয়ে ওকে জানিয়েছিলাম। ও তখন ওর এক বন্ধুকে ফোন করে। সে আরেক জনকে করে। এভাবেই এইডস ফাউন্ডেশন অর্থাৎ এ এফ পর্যন্ত একটি চ্যানেল তৈরি হয়। আমি টের পাই, চব্বিশশো টাকার চাকরিও এমনকী পাওয়া যায় না পরিচিত মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া।

দিব্যদা বলে—বেশ। এ বার তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ। কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়ছি না। সাহিত্যের পাতার জন্য তুমি একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করো।

—ধারাবাহিক?

আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। ও বলে—অত ভাবনার কী আছে? শুরু করে দাও। সপ্তাহে পনেরোশো শব্দ। অক্টোবরের ফার্স্ট ইস্যু থেকেই চাই আমি।

আমার বেশ উৎসাহিত লাগে। ভাবতে থাকি কী লেখা যায়! এই সময় ও আসে। আমাদের নতুন রুমমেট। রেখা আগরওয়াল নামে এয়ারহোস্টেস মেয়েটির সঙ্গে আমার অসুবিধে হতে শুরু করে। এক দিন ও প্যান নোংরা রাখে, এক দিন রক্ত মাখা ন্যাপকিন ভুলে ফেলে যায় বাথরুমে, আমি বললে বিরক্ত হয়।

BanglaBook.org

আমি রাত জেগে কাজ করলে ওর অসুবিধে হয়। ও ভোর তিনটে থেকে আলো জ্বেলে সাজতে শুরু করলে আমার ঘুম আসে না। এ অশান্তি সহ্য হয় না আমার। আমি বেশির ভাগ সময় উজ্জ্বলাদির সঙ্গে থাকি। কেয়ার সঙ্গে রেখার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই ঘনিষ্ঠতা অদ্ভুত লাগে আমার। রেখা এলে কেয়া ওর জন্য গরম জল করে দেয় স্নানের। রান্না করে ওর জন্য, রেখার টাকায় কিনে আনে দামি মাছ। মাটন। এক রাত্রে সেই মাছ খাই আমি এবং দাম ভাগ করে নিতে চাই। রেখা স্মিত হাসে। বলে— না। দাম দিতে হবে না।

এ বদান্যতা ভাল লাগে না আমার। আমি কেয়াকে বলি— এত খরচ করে বাজার করছ, আমি কিন্তু বরাদ্দ বাড়াতে পারব না।

কেয়া বলে— খরচ তো রেখা করছে। তোমার কী!

আমি বলি— রেখার খরচে আমি চলব কেন?

— কারণ ও রান্না করতে পারবে না। ও মাছ খেতে শিখেছে কিন্তু রাঁধতে জানে না। তা ছাড়া ওর সময় নেই। ওর রান্নাটা আমরা করে দেব।

— ও ক্যান্টিনে খেতে পারে। দেখো, হয় আমরা তিনজনই সমান টাকা দেব, নয়তো অন্য ব্যবস্থা ভাবতে হবে। ওকে আমরা ফ্রি সার্ভিস দিতে পারি। মাছের বিনিময়ে নয়।

কেয়া গম্ভীর হয়ে যায়। বুঝি, আমার কথা ওর ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে রেখার সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলে। আমি এলে থেমে যায়। কীরকম বদলে যায় কেয়া। রেখার মতো করে বাংলা-হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলে। রেখার প্রসাধনের দিকে ওকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখি। একদিন ও সারা মুখ ওয়্যাক্সিং করে ফেরে। আমার, ওকে দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। এক রাত্রে রেখা আমাকে পাগলের মতো ধাক্কায়—ওঠো, ওঠো!

আমি ধড়মড়িয়ে উঠি। কী ব্যাপার? ও বলে—নামো, নামো! আমি নামি তাড়াতাড়ি। ও আমার বালিশ হাঁটকায়। তোশক তুলে দেখে। ভুরু কোঁচকায়।

—কী ব্যাপার তোমার?

আমি জিগ্যেস করি। ও বলে—আমার হার কোথায়? আমার হার?

—তোমার হার আমি কী জানি?

—সন্ধ্যায় আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম। আমার ব্রা-এর মধ্যে হারটা ছিল। আমার পরেই তো তুমি গিয়েছিলে।

—এতক্ষণ মনে পড়েনি তোমার?

—না এখন মনে পড়ল। ওঃ আমার হার! মা কত বলল, নিয়ে যাস না! ওঃ

BanglaBook.org

আমার সোনার হার! প্লিজ, পেলে আমায় ফিরিয়ে দাও।

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। এই সমস্তই কি শুধু আমার সঙ্গে ঘটতে হয়?

আমি ঘরের সমস্ত আলো জ্বালি। কেয়াকে তুলি। উল্টো দিকের ঘর থেকে উজ্জ্বলাদি ও ওর দুই রুমমেটকে ডেকে আনি। ঘুম চোখে ওরা সব দাঁড়ায়। আমি ব্যাপারটা ওদের বলি। তারপর চাবি দিই রেখার হাতে। বলি—সার্চ করো সব। আমার স্যুটকেস। আমার ব্যাগ। আমাকেও সার্চ করো। সবার সামনে। যদি তোমার হার পাও তাহলে পাঁচটা থাপ্পড় মেরো আমাকে। যদি না পাও আমি তোমাকে মারব মাত্র একটা।

আমার সারা শরীর কাঁপে। রেখা স্যুটকেস খোলার সাহস পায় না। অন্যরা রীতিমতো বকাবকি করে ওকে। ও কাঁদে বসে বসে। সারা রাত আমি আর উজ্জ্বলাদি জেগে কাটিয়ে দিই। সকালে সুপারের কাছে যাই। সিঙ্গল রুমের জন্য বলি। কপাল ভাল আমার, একতলার একটি ঘর আমি পেয়ে যাই। একশো আট নম্বরের ঘরে আমি চলে যাই সেই রাত্তিরেই। ছোট্ট একটি জগৎ তৈরি হয়। আমার একার জগৎ। আমি হিসেব করি, এক হাজার টাকা ভাড়া এ ঘরের। টানাটানি হবে খুব এই দু'মাস। কী করে চালাব? তখন, আশীর্বাদের মতো একটি ড্রাফট আসে আমার কাছে। আটশো টাকা পাঠিয়েছে বাবা। পুজোয় কিছু কেনাকাটা করার জন্য।

সেপ্টেম্বরের শেষে মিষ্টিকাকা এল কলকাতায়। আমার হস্টেল দেখল। নতুন কাজের খবর শুনল। ওরই মধ্যস্থতায় এবং উদ্যোগে বারাসত কোর্টে গিয়ে আমি আর নীল মিউচুয়াল ডিভোর্সের অ্যাপিল করলাম। মিষ্টিকাকা তার খরচটা বহন করল। এপ্রিলের শুরুতে একটা ডেট পেলাম আমরা।

এক দিন দিদি এল একটা চিঠি নিয়ে। ও বাড়ির ঠিকানায় এসেছিল। দেখলাম সুশান্ত জানার চিঠি। ডিসেম্বরে কানাডা যাচ্ছে ও। আপাতত দু'বছরের জন্য। পরে ভাল লাগলে থেকে যাবে।

আমি ওকে আমার নতুন ঠিকানা লিখলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দেবারতি, সুশান্ত জানা এবং অক্টোবর মাস

এই হস্টেলের গাছগাছালির মধ্যে বেশ কয়েকটি শিউলি গাছ। সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে থাকে তার তল। গন্ধে ম-ম করে আমার ছোট ঘরখানা। কেন না আমার ঘরের পেছনের বাগানে পাশাপাশি তিনটি শিউলি গাছ। সকালবেলায় আমি শিউলি কুড়োতে যাই। এ দিককার পাঁচিলের ও পারে হাউজিং। আমার ঘরের ঠিক উল্টো দিকের দোতলায় এক অল্পবয়সি দম্পতির বাসা। তাদের জীবনযাপন আমার চোখে পড়ে। তারাও খুব কৌতূহলে দেখে আমার ঘর।

এ ঘরের দেওয়ালে র‍্যাক করে দেওয়া আছে। সেখানে আমার বইগুলো গুছিয়েছি। উজ্জ্বলাদির একটা হিটার ছিল, নিয়ে এসেছি। ওর লাগে না। ওর ক্লিক্স আছে। প্রায়ই হিটারের কয়েল কেটে যায়। এই ক'মাসে আমি নিজেই তা সারিয়ে নিতে শিখেছি। একটি ছোট্ট কড়াই কিনেছি। ছোট্ট হাঁড়ি। একটি হাতা ও খুন্তি। ব্যস। আর কী লাগে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য!

আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ দেখে আমার কখনও বিষণ্ণ লাগে, কখনও আনন্দে পরিপ্লুত থাকে মন। সোনালি রোদ্দুর পাঁচিল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামে। ইতিমধ্যে কত যে অনুষ্ঠান রিভিউ করলাম! শুধু আগের মতো দ্রুত লয়ে প্রুফ দেখতে পারছি না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে উপন্যাসটা লেখার চেষ্টা করি। ভাববার সময় পাইনি খুব বেশি। এ লেখার কোনও ঝলক আসেনি আমার মস্তিষ্কে যেমন হয়েছিল মিশ্রজি পিওনের বেলায়। অতএব ভাবতে হচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে, একটি উপন্যাসকে কী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তার অনুশীলন করছি আমি। আসলে এরকম সব কাজ, সবই তো অনুশীলন। অনুশীলন শেষ করে সত্যিকারের পরিণত লেখা কোনও দিনই হয়ে ওঠে না।

দিবাকরবাবু, আমার প্রুফদাতা, প্রায়ই তাড়া দিচ্ছে। বইমেলা এগিয়ে এসেছে, এখন ওদের খুব চাপ। আমি তো বলতে পারি না, ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি, প্রভাতী সংবাদের প্রথম অক্টোবর সংখ্যায় বেরিয়েছে তার প্রথম পর্ব।

এবং প্রভাতী সংবাদের দপ্তরেও এখন দারুণ চাপ। তৃতীয় সপ্তাহে পুজো। তখন পুরো সাত দিন ছুটি থাকবে। বন্ধ থাকবে তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশ। কিন্তু তার

BanglaBook.org

আগেই বাজারে ছাড়তে হবে পুজোসংখ্যা। দিব্যদার এখন খুব মাথা গরম। কারণে অকারণে সবাইকে বকাবকি করছে। শুধু আমাকে কখনও বকে না। এবং আর কখনও আমাকে ও চুমু খেতেও চায়নি। ওকে যারা নারীলোলুপ বলে, আমি এখন তাদের দলে পড়ি না।

পুজোসংখ্যা প্রভাতী সংবাদে থাকবে আমার উপন্যাস। সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পাশাপাশি। ভাবতে ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। যদিও এ নিয়ে আমার কোনও উচ্ছ্বাস নেই। কারওকেই বলিনি এ কথা। ক'জনই বা পড়ে এই পত্রিকা! তার মধ্যে ক'জনই বা পড়বে আমার উপন্যাস। তবু, এত দিন বন্দি থাকা লেখাটা প্রকাশ পেল, এই সার্থকতা!

এই এক রবিবার, তবু আজ অফিসে যেতে হবে, এত চাপ! সন্ধ্যায় একটা অনুষ্ঠান রিভিউ করতে যাব। বাবার দেওয়া সেই ছোট্ট রাইটিং ডেস্কের কাছে বসি আমি। কালকের লেখা পাতাগুলোয় চোখ বোলাই। আমি কবিতা নিয়ে, উপন্যাস নিয়ে সময় কাটাচ্ছি দেখে বাবা কখনও খুশি হয়নি। অথচ প্রথম উপন্যাসের খসড়া নিয়ে আমি যখন উজানিনগর থেকে ফিরে আসছি, এই ডেস্কটা বাবা বানিয়ে দিয়েছিল। বয়স যত বাড়ছে, বাবাকে তত নতুন করে চিনেছি। মা-র কোনও আবরণ নেই। মা যেমন, তেমনই। মাকে তাই পূর্ণ করে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা উল্টো। বাবা এমন আবরণে ঘিরে রাখে নিজেকে সারাক্ষণ যে তার অন্তঃস্থিত নরম জায়গাটি রয়ে যায় অনাবিষ্কৃত।

লেখায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে আমি হিটারে ভাত চাপাই। স্নান করি। কুমড়ো সেদ্ধ বা বেগুন সেদ্ধ বা আলুসেদ্ধ আর ভাত। এর বাইরে কিছু খাবার কথা এখন আমি ভাবতেও পারছি না। পয়সার খুবই টানাটানি। কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে আমার ইচ্ছে করে না। এই তো, ডিসেম্বর থেকে মাসে আমার তেত্রিশশো টাকা আয় হবে। ওঃ! সে অনেক টাকা!

আমি কুমড়ো সেদ্ধ দিয়ে ভাত মাখি, খাই, তখন দরজায় টোকা পড়ে। খুলে দেখি গেটকিপার। কোনও ভিজিটর এসেছে আমার। ভিজিটর। হস্টেলে এই শব্দটা খুব প্রচলিত।

খাওয়া শেষ করে বাইরে যাই আমি। আর তখন থেকে ওকে দেখতে পাই। সুশান্ত জানা।

কপালের ওপর থেকে চুল উঠে গেছে। দেখাচ্ছে কিছু বা রোগাই। পোশাকে চাকচিক্য এসেছে। আমার দিকে অপলক তাকায় ও। দু'চোখে বিস্ময়। যেন কতই ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে আমার, এমন ভাবে বলে—অত সুন্দর চুলগুলো কেটে

BanglaBook.org

ফেললে? আমি তোমাকে চিনতে পারিনি প্রথমে।

আমি বলি—এমন সময় এলে, আমার অফিস যাবার তাড়া। হস্টেলেও এখন বসা যাবে না।

—অফিসে একটু দেরি করে গেলে হয় না? তা ছাড়া, আজ রবিবার তোমার কীসের অফিস?

—আছে কাজ।

—আমি তোমায় ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেব। এখন বলো তো, এখানে কোথায় বসা যায়? এতদিন পরে দেখা হল, একটু সময় দাও আমায়। কোথায় বসা যায়?

কোথায়? আমি ভাবতে থাকি। নলবন ছাড়া কিছুই মনে পড়ে না। ওখানেই নিয়ে যাই ওকে। দেখি দু-একটি চুলে পাক ধরেছে ওর। হয়তো আমারও ধরেছে। আর এখন তো চুল পাকার কোনও বয়সই নেই।

দুটি কফি নিই আমরা। জলের ধারে চেয়ার পেতে বসি মুখোমুখি। ভিজে হাওয়া মন ভরিয়ে দেয়। ও বলে—প্রায় দশ বছর পর তোমাকে দেখলাম।

—হুঁ!

—প্রায় একই আছ তুমি। একটু ভারী হয়েছ। এছাড়া আর বিশেষ পরিবর্তন নেই।

—তাই?

—কী করছ?

আমি বলি।

ও বলে—ভাল মাইনে দেয়? মানে তোমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত তো?

আমি বলি—ওই আর কী! চলে যায়!

—তোমাদের হস্টেলটা ভাল।

—হ্যাঁ।

—তিরিশ পেরিয়ে গেছ তুমি না?

—হ্যাঁ। একত্রিশ চলছে।

—তাই তো। আমার তেত্রিশ। দেবারতি, তুমি তো জানতে চাইছ না আমি কেমন আছি?

—ভাল আছ। কানাডা যাচ্ছ। পিএইচ ডি শেষ করে ফেলেছ। ভাল চাকরি করছ।

—একটা জীবনে এই কি সবই আর কিছু না?

—আর কী? সুস্থ আছ।

BanglaBook.org

—তুমি জানতে চাইবে না, এখনও আমি বিয়ে করিনি কেন?

—কী আর এমন বয়স তোমার? বিয়ে তো করতেই পারো। তা ছাড়া বিয়েটাই যে জীবনে সব নয় তা তো আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ।

—ডিভোর্স ফাইল করেছ?

—হ্যাঁ। মিউচুয়াল।

—কী ভাবে তোমার সব নষ্ট হয়ে গেল দেবারতি!

—নষ্ট আবার কী! একটা অভিজ্ঞতা। গড় আয়ু ষাট ধরলে আমার সামনে এখনও প্রায় তিরিশ বছর।

—আর বিয়ে করবে না?

—করব।

ও চমকে যায়। হয়তো ভেবেছিল আমি না বলব। কফির শূন্য কাপ নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে আসে। প্রশ্ন করে— কাকে?

—কী?

—কাকে বিয়ে করবে?

—জানি না। সে গোকুলে বাড়ছে।

—দেবারতি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

—সুশান্ত, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি বিয়ে করতে চাই না। বিয়ের কথা ভাবতেও পারি না আমি এখন। এপ্রিলে আমাদের ডিভোর্স হবে। জীবন কোন দিকে যায় দেখি। তারপর ভাবব।

—আমি অপেক্ষা করব দেবারতি।

—কোরো না প্লিজ।

—বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে আমাকে। কানাডা যাবার আগে বিয়ে করতে হবে।

—বাড়ির কথা শোনো।

—তুমি বললে আমি সামলে নেব বাড়ি।

—সুশান্ত, তুমি খুব ভাল বন্ধু আমার। তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না।

—এ কথা কেন বলছ?

—আমি শিখেছি, দাম্পত্যে দুটি জিনিস খুব জরুরি। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—ভালবাসো না?

আমি চুপ করে থাকি। মেঘ দেখি। জল দেখি। জলের ওপর ভাসতে থাকা নকল শিকারা দেখি। আমি কী করে অন্য কথা বলব? এই তো আমার সত্য বলার

BanglaBook.org

সময়। সব ছেড়ে আসা নির্মোহ এ জীবনে আর আমি কারওকে ঠকাতে চাই না। নিজেকেও নয় সচেতন ভাবে। কারণ আমি জেনে গেছি, ভালবাসা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। আমি চাইলেই তা জোর করে আরোপ করতে পারি না।

ওর চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। নাকের ডগা লাল হয়ে যায়। রুমালে মুখ মুছে ও বলে— আর দেখো, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কারওকে ভালই বাসতে পারলাম না। সেই যে তুমি চিঠি লিখতে, সেই অদেখা তোমাকেই আমি ভালবেসেছিলাম।

ও আমাকে অফিস পৌঁছে দেয়। সারা পথ আমার হাত আঁকড়ে থাকে। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিতে আমার ইচ্ছে হয় না। সুশান্ত জানা— সত্যিই কতকালের বন্ধু আমার। হাত ধরা বিষয়ে আমার কোনও সংস্কার নেই। ওর সংযম আমার ভাল লাগে। কারণ হাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করানোর কোনও উদ্যোগ নেয় না ও।

বিদায় নেবার আগে বলে— চিঠি দেব।

—দিয়ো।

—তুমিও দিয়ো।

—দেব।

—হারিয়ে যেয়ো না।

—না।

—একটা সাইবার কাফেতে গিয়ে ই-মেল আই ডি করে নিয়ো। আমি কানাডায় থাকলে যোগাযোগে সুবিধে হবে।

—ঠিক আছে।

ওর জন্য আমার কষ্ট হতে থাকে। কিন্তু আমি নিরুপায়। ধূল্যবলুণ্ঠিত ছিল ভালবাসা আমার। ঋতবানের দ্বারা। নীলের দ্বারা তা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আমি কী করব?

আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রুমে ফিরি। হস্টেল প্রায় ফাঁকা। বাড়ি গেছে সব। উজ্জ্বলাদিও গেছে। এখন আমার সাত দিন ছুটি। এই লম্বা ছুটি আমি কী করব? উল্টে পাল্টে দেখি প্রভাতী সংবাদের পুজো সংখ্যা। আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নিয়ে আমার কোনও মোহ নেই। ক'জন পড়বে এ লেখা? যদি একজনও পড়ে সেই আমার প্রাপ্তি। লেখাটা প্রকাশ পেল। নাটকের দলে শিখেছিলাম, যদি দর্শকের আসনে একজনও থাকে, তা হলেও কাজে ফাঁকি দিও না। তোমার সম্পূর্ণ দিয়ে অভিনয় করো। এই শিক্ষা আমাকে অনেকাংশে নির্লিপ্ত করেছে।

BanglaBook.org

স্তব্ধ রাত্তিরে আমি ব্যালকনিতে দাঁড়াই। উল্টো দিকের দোতলায় জানালার শার্সি ফুঁড়ে আমি দেখতে পাই ঘরের আলো জ্বেলে পরস্পরকে আদর করছে দম্পতি। ওরা মৈথুন করছে। সঙ্গম করছে।

দেখতে দেখতে আমার শরীর জুড়ে চিতাকাঠ জ্বলে ওঠে। বার বার মরণের সুখ পেতে ইচ্ছে করে আমার। এই একত্রিশ বছর বয়স— এখনও কী হাহাকার রয়ে গেল!

আধপাগল চন্দ্রিমাও এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। গলা ছেড়ে গায়— আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা...

অন্ধকারে ওর শ্বেতীওয়ালা হাত নড়ে-চড়ে। আহা! হয়তো ওর বয়স একচল্লিশ বছর!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চিঠি চিঠি

সকালে বেরোই। একেক দিন একেক বস্তিতে আমার কাজ পড়ে। শিয়ালদা, রাজাবাজার, ফুলবাগান। দুটো অবধি এইডস বোঝাই আমি, পুরুষদের, মহিলাদের। কারণ বলি, সুরক্ষার পথ বলে দিই এবং সপ্তাহে এক দিন বিনে পয়সায় কন্ডোম বিলোই। সেদিন সহকর্মী দেবাশিস থাকে আমার সঙ্গে। আমাদের ঘিরে সেদিন সবচেয়ে বেশি ভিড়।

প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করত আমার। নভেম্বর মাসের পুরোটাই আমি অণিমাদির সঙ্গে ঘুরেছি। ও কত অনায়াস। কিন্তু আমার জিভ জড়িয়ে আসত। বস্তির পুরুষেরা খুব সম্মান দেয় আমাদের। কিন্তু তারই মধ্যে কারও কারও দৃষ্টি বড় নোংরা। তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমন প্রশ্ন করে যাতে আমাদের বিশদ হতে হয়।

এখন এই এক মাসে আমি অনেক সহজ। দুটোর পর রামবাগানে যাই। যৌনকর্মীর বাচ্চাদের ক্লাস নিই। পড়াতে আমার ভাল লাগে। ওদের মধ্যে দাঁড়ালে, আমি কোথায় আছি, ওরা কারা, আর মনে থাকে না। মনে রাখার দরকারও নেই।

দুটো পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে যে প্রচারের কাজ, তা-ও আমার ভাল লাগে। কত লোকের সঙ্গে কথা বলি। জীবন দেখি কত রকম! দারিদ্র এবং অশিক্ষায় ভরা এক অন্য ভারতবর্ষ পরতে পরতে আমার চোখের সামনে খুলে যায়। মুশকিল একটাই। আমার হাঁটুর ব্যথাটা খুব বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। মধুমিতার কাছে গেলাম এক দিন। ও ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। বলল সারাদিন বেঁধে রাখতে। তাতে আমার খুব লাভ হয়নি। ভাবি একবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে যাব। হয়ে ওঠে না। ডিসেম্বর শেষ হতে চলল। এখন প্রুফ দেখার খুব চাপ। ধারাবাহিকের কিস্তি দেবার জন্য রাত জাগতে হয়। প্রভাতী সংবাদেও যেতে পারি না। আমহার্স্ট স্ট্রিটে রাজনগর দৈনিকের আপিসে দিয়ে আসি দিব্যদার নাম লেখা খামে পুরে। মাঝে মাঝে ওকে ফোন করি।

—কত দিন চলবে দিব্যদা?

BanglaBook.org

ও বলে— অবস্থা ভাল না। তুমি কিন্তু লিখে যাও।

এক দিন আমার নামে একটি চিঠি আসে। প্রেরক এস এন মিত্র পাবলিশার্স। আমি চমকে উঠি। আমার উপন্যাস নিয়ে ওরা কথা বলতে চায়। কী কথা? আমার বুক কাঁপে। বাংলা সাহিত্যের জগতে ওরা অন্যতম সেরা প্রকাশন সংস্থা। আমি কারওকে বলি না এই চিঠির কথা। সভয়ে, সংগোপনে চেপে রাখি নিজের ভেতর। বিবিধ প্রশ্ন জাগে মনে। ওরা কি তবে প্রভাতী সংবাদ পড়েছে? ওই সামান্য কাগজের সামান্য উপন্যাস পড়েছে ওরা? বিস্ময় জাগে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, এ জগতে কিছুই সামান্য নয়। এক দিন দেখা করতে যাই। দারুণ উত্তেজনা হয় ভেতরে। কোনও দিকে চোখ পড়ে না। দারোয়ান যাঁর কাছে নিয়ে যায়, সেই হাসিখুশি গোলগাল মানুষটি আমাকে বসতে বলেন। ধবধবে রঙের ওপর ধবধবে সাদা চুল। সে কেবল মাথা জোড়া টাক ঘিরে শেষ চিহ্নবৎ। বিপুল দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবিতে ঢাকা। যেন এক শ্বেতশুভ্র ঢিবির কাছে চুপটি করি বসি আমি। তিনি বলেন— 'পিওন মিশ্রজির সংসার' উপন্যাসটি আমাদের ভাল লেগেছে। আমরা এটি প্রকাশ করতে পারি। মতামত জানালে ভাল হয়। লেখাটি বেশ। হে-হে। লেখার তুলনায় লেখিকার বয়সের ওজন কম, হে-হে-হে।

দশ লাখ টাকার লটারি পেলেও আমি এত চমৎকৃত হতাম না। এস এন মিত্র পাবলিশার্স? বই করবে? আমার? আমার হাসিও পায়, কান্নাও পায়। আমি স্বপ্ন দেখছি না বোঝার জন্য বাঁ পাটা ছড়িয়ে দিই। খচ্ করে লাগে। এখানকার দোতলায় উঠতে ব্যথায় আমার ঘাম বেরিয়ে গেছে। আমি কোনও ক্রমে বলি— আমার কোনও আপত্তি নেই।

তিনি, সুধাকর সেন, বলেন— বইমেলার পরে একবার দেখা করলে ভাল হয়। হে-হে। তখন ভাল করে কথা হবে। হে-হে-হে।

—কবে?

—এই পনেরোই ফেব্রুয়ারি। হে-হে-হে।

—আচ্ছা।

—আর কিছু লেখা হচ্ছে? হে-হে। বলতে আপত্তি নেই তো?

—এই, একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি।

—কোথায়?

—প্রভাতী সংবাদে।

উঠে পড়ি। কারওকে বলি না কিছু। কে জানে! যদি না হয় শেষ পর্যন্ত! যদি না হয়! প্রকাশকের সদাহাস্যময় মুখ আমাকে নিশ্চিত ভরসা দেয় না। এবং

BanglaBook.org

আমার নিজস্ব সৌভাগ্যের প্রতি আস্থা চঞ্চল। অতখানি হাস্য ওঁর? নাকি মুদ্রাদোষ? হাসি কারও মুদ্রাদোষ হতে পারে?

বইমেলা এসে গেলে আমি একা একা ঘুরে বেড়াই। বেশ কয়েক বছর পর আমি বইমেলায় এলাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র বইটির জন্য আমার কষ্ট হতে থাকে। আমি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে যাই। প্রত্যেকটি স্টল ঘুরি। কিন্তু সেই বই আর খুঁজে পাই না। খুব মন খারাপ হয়ে যায় আমার। মনখারাপ সঙ্গী করে হাঁটি ভিড়ের মধ্যে। হঠাৎ সৌমিত্রীকে দেখতে পাই আমি। সৌমিত্রী! ডাকতে গিয়েও আমি থমকে যাই। এক যুবকের হাত ধরে মগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছে ও। কথা বলছে ডুবে যাওয়া ঘনিষ্ঠতায়। বুঝতে পারি, ও-ই অরুণাংশু। ভাল লাগে আমার, সৌমিত্রী ওর সঙ্গী পেয়েছে। এবং বিষণ্ণ লাগে। একাকীত্ব দ্বিগুণ হয়ে চেপে বসে আমার ওপর। হস্টেলে ফিরে দেখি একটা প্যাকেট এসেছে আমার নামে। খুলি। ভিতরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র বই। আর একটি ছোট্ট চিঠি।

দেবারতি,

আমি আর অরুণাংশু বিয়ে করলাম।

সৌমিত্রী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মার্চ-এপ্রিল

মার্চ মাসের প্রথম রবিবার দিব্যদা আসে আমার হস্টেলে। আমরা হস্টেলের উল্টো দিকের নতুন রেস্তোরাঁয় বসি। ওর মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, উস্কো-খুস্কো চুল। ও বলে— দেবারতি, আর পারলাম না।

—আর বেরোবে না?

—না।

আমি ওর হাতে চাপ দিই। ও আমার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরে। আমি তো জানি, কাগজটাকে ও কত ভালবাসত। ও বলে— উপন্যাসটি তুমি শেষ কোরো।

—করব।

—কথা দিচ্ছ।

—আচ্ছা দিব্যদা, কথা দিলাম।

—একটা কথা বলি তোমাকে, দেবারতি, যে-কোনও প্রয়োজনে আমায় ডেকো। আমি রইলাম।

—আপনার ঋণ...

—ওসব বোলো না। যদি উপকৃত হও তবে অন্যের দিকে উপকার বাড়িয়ে দিও। এভাবেই ঋণ শোধ হয়। মনে রেখো, কথা দিয়েছ, উপন্যাসটা শেষ করবে। লিখে যাবে নিয়মিত।

আমার একবার ইচ্ছে করে, এস এন মিত্র পাবলিশার্স আমার উপন্যাসের বই করবে, ওকে বলি। কিন্তু পারি না শেষ পর্যন্ত। ভয় করে। যদি না হয় শেষ অবধি। আমার সবই তো অসম্পূর্ণ! ও চলে যায়। আর এক নতুন খবর পাই আমি। বাবাকে নার্সিং হোমে দেওয়া হয়েছে। গল স্টোন অপারেশানের জন্য। আমার যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাওয়া হয় না। আমাদের কাজে ছুটি পাওয়া যায় না বলা মাত্র। তা ছাড়া উজানিনগর যাবার খরচও অনেক। কিন্তু এসব ছাপিয়ে আমার সংকোচ তীব্র হয়। আমার পায়ের সংকোচ। দিনে দিনে আমার স্বাভাবিক চলা নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা-মাকে আমি দেখাতে চাই না। আমি বরং নীলরতনে যাই।

BanglaBook.org

ভাগ, অভাবী, আমাকেও ডাক্তার ভেবে বসে কখনও। আমি সবিনয়ে জানাই আমি ডাক্তার নই। নার্সও নই এমনকী। আমি রোগী।

লক্ষ করি, প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে কেউ-না-কেউ আছে। কেবল আমার নেই। যখন ঋতবান আমাকে ছেড়ে যায় তখন আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম। কলেজে আমার কত পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ছিল, প্রেমিক ছিল, তবু আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম। নীলকে বিয়ে করেও আমার নিঃসঙ্গতা ঘুচল না। ওই বৃহৎ পরিবারের মধ্যেও আমি একাকী রয়ে গেলাম সাতটি বছর! আজ, আমার নিজের জগতেও আমি নিঃসঙ্গ! আমি জানি, আমি ভাল আছি। নীলের জন্য, ঋতবানের জন্য, আমার বিন্দুমাত্র মনোবেদনা নেই। আমি ওদের ছেড়ে আসিনি শুধু। ছাড়িয়ে গিয়েছি অনেক দূর। আমার এই দূর বসবাসে আমি ভাল আছি। তবু, নিঃসঙ্গতা বিষাদ হয়ে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে লেপটে থাকে।

ডাক্তার আমাকে দেখে। বিশ্রাম নিতে বলে। রে নিতে বলে। এক্স-রে প্লেট দেখে কিছুই বুঝতে পারে না। বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না। আমি রোজ নীলরতনে যাই, দশ টাকা দিয়ে রে নেই। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটি। কোনও উন্নতি হচ্ছে না দেখে ডাক্তার পাল্টাই। সেই নতুন চিকিৎসক এক্স-রে প্লেট দেখে, পা পরীক্ষা করে বায়োপসি করার বিধান দেয়। আমি পালাতে থাকি। পালাতে থাকি হাসপাতাল থেকে।

এক সন্ধ্যায় বইয়ের প্রুফ আনতে এস এন মিত্রে যাই। চোদ্দোই এপ্রিল, পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত হবে বই। প্রুফ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সুধাকর সেনও নামছেন। আমার বাবারই মতো বয়স। প্রায় বৃদ্ধ। চাঁদির ওপর চকচকে টাক অথচ কী ঋজু মানুষটা! একটা হাসিখুশি ভুঁই কুমড়ো গড়িয়ে চলেছেন। আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছি। উনি বলছেন— এ কী! খোঁড়াচ্ছ কেন?

—হাঁটুতে ব্যথা।

আমি বলি।

উনি বলেন— এটুকু মেয়ের আবার হাঁটুতে ব্যথা কী! হে-হে।

আমার হাসি পায়। ওঁর মুদ্রাদোষ ছোঁয় আমাকে। এ বছর বত্রিশে পড়েছি। উনি এ বার শুধোন— ডাক্তার দেখানো হয়েছে? হে-হে! দেখানো হয়েছে?

—হ্যাঁ। নীলরতনে দেখাচ্ছি।

—আমার এক বন্ধু আছে। হে-হে! ভাল অর্থোপেডিক। তার কাছে যাও একবার। হে-হে! যাবে তো? যাবে তো?

উনি কাঁকুড়গাছির একটি ঠিকানা বলেন। আমি যাই সেখানে। দারুণ ভিড় সেই

BanglaBook.org

ডাক্তারের চেম্বারে দাঁড়িয়ে থাকি তিন ঘন্টা। অবশেষে আমার নাম-ঠিকানা লেখা এবং ফিজ জমা দেবার পালা আসে। এর পর ডাক্তার। আমি ফিজ জানতে চাই। পাঁচশো টাকা। আমি পিছোতে থাকি। ক্রমশ পিছোতে থাকি। আমার ব্যাগে মাত্র তিনশো টাকা আছে। ডাক্তার না দেখিয়েই ফিরে আসি আমি! আমার এ কথা ভাবা উচিৎ ছিল। সুধাকর সেনের বন্ধু যে ডাক্তার, তাঁর দক্ষিণা কী করে আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে হবে! লাজুক বেদনায় ছেয়ে যায় মন। কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। সুধাকর সেন যদি জানতে চান আমি কী বলব! বামদিকের জানুসন্ধি খটখট করে কাঁপে। ব্যথা ছড়িয়ে যায় পায়ে। পা থেকে পেটে বুকে মাথায়। আমার কষ্ট হয় কীরকম। ভয়-ভয় করে। এই চাকরিটা আমার দরকার। কিন্তু সুস্থ দুটো পা না থাকলে আমি কাজ করব কী করে? দূর থেকে ডাক্তারের চেম্বার দেখি। স্থির করি, আসব। আবার আসব। দরকার হলে উজ্জ্বলাদির কাছ থেকে ধার... আমার অন্তরাত্মা কুঁকড়ে যায়। দিব্যদার ঋণ এখনও শুধতে পারিনি। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক সল্ট লেকে ফিরি। আর হস্টেলে এসে অবাক হয়ে যাই। আজ শনিবার। আমার ছুটি। উজ্জ্বলাদিরও। ও আমাকে ডাকে। দেখি পুলিশে ভরে গেছে হস্টেল। সমস্ত মেয়েরা বিবর্ণ। ওদের মৃতের মতো চোখ। তিনতলার তিনশো আট নম্বর ঘরে তিন দিন ধরে মরে পড়েছিল ঊনষাট বর্ষীয়া মানসীদি। গন্ধ বেরোচ্ছিল ঘর থেকে। অবশেষে পুলিশ...

এখানে কেউ কারও অসুবিধে করে না। কেউ কারও খোঁজ রাখে না। চেনেই না অধিকাংশ পরস্পরকে। ন' মাস হল এখানে আমার। আমি ক' জনকে চিনি? অচেনা মানসীদি আমার চোখের সামনে দিয়ে মৃতাবস্থায় আপাদমস্তক আবৃত, পুলিশের গাড়িতে চড়ে বসে। সুপার বিপন্ন মুখে কথা বলে। মানসীদির ফাইল খুলে দেয় পুলিশের হাতে। কে আছে ওর? কে করবে অন্ত্যেষ্টি? কে ওর দেহ ছাড়িয়ে নেবে হিমঘর থেকে? ওর কেউ আছে তো?

গোটা হস্টেলের পরিবেশ বদলে যায়। মেয়েদের চোখে আমি পাগলামি দেখি! বিশেষত, একটু যারা বয়স্ক, চল্লিশ-পঞ্চাশের ওপরে, তারা নিভে আসে। মধুমিতারা আড্ডায় ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। আমার আর উজ্জ্বলাদির আড্ডা জমে না। এক দিন ও জানিয়ে দেয় ওর সিদ্ধান্ত। ও বাড়ি ফিরে যাবে। কষ্ট হলেও ওখান থেকে আপিস করবে, ওর ঘরের শরীর ভাল নয়। শুনে আমি কষ্ট পাই কিন্তু সৌমিত্রী চলে যাবার সময় যেমন হয়েছিল, তেমন হয় না। ও, যাবার সময়, ওর সব বাসন-কোসন আর ক্লিক্সটা উপহার দেয় আমাকে। কত বন্ধুত্ব হল। কতজন দূরে চলে গেল। বিয়োগ ও বিচ্ছেদ আমার নিত্য সঙ্গী।

BanglaBook.org

ডাক্তার আমাকে বায়োপসি করতে বলেছে। আমি কি নিজেই বিয়োগ হয়ে যাব?

উজ্জ্বলাদি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। অতএব আমার দিন থেকে আড্ডা বাদ পড়ে যায়। মাঝে মাঝে সুশান্ত জানাকে মেল করি। ও বিয়ে করেনি এখনও। বাড়ি থেকে পাত্রী দেখা চলছে। আমি পা হেঁচড়ে কাজ করি। দাঁতে দাঁত চেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠি যখন দরকার। এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিদি ও নির্মলদার সঙ্গে বারাসত কোর্টে যাই। বিচারকের সামনে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি সাত বছরের সম্পর্ক ছাইভস্ম হয়ে যায়।

অবশেষে, সেই দিনটি আসে। পয়লা বৈশাখ। সকালে একটি ম্যাটাডর এসে থামে আমার সামনে। কোনও খবর না দিয়ে আমার খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব ও স্টিল আলমারি পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। গাড়ি নিয়ে নির্মলদাও এসেছে। আমি কী করব, বুঝতে পারি না। হতবুদ্ধি হয়ে যাই। দেখতে পাই ম্যাটাডরের ওপর আমার সাত বছরের পুরনো ব্যবহৃত আধময়লা তোশক লাট খেয়ে পড়ে আছে। ঠিক ওভাবেই শ্মশানে পড়ে থাকে মৃতের তোশক। আমার গা ঘুলিয়ে ওঠে। নির্মলদা বলে—কী করবে এই খাট? এখন কোথাও রেখে দাও। পরে বিক্রি করে দিয়ো।

কোথায় রাখব? এখানে কেউ জানে না আমার ইতিহাস। এই সব ফার্নিচার সাত বছরের সকল ইতিহাস ম্যাটাডরে বয়ে এনেছে। বিশেষত খাট আর ড্রেসিং টেবিল। এই হস্টেলে এ সব রাখার জায়গা আমাকে কে দেবে? এবং খাট দেখে আমার ঘেন্না করতে থাকে।

আমি দ্রুত চিন্তা করি। আজ পয়লা বৈশাখ। আজ আমার বই বেরোবে। প্রথম বই। সকাল থেকে কী এক অপরূপ ঘোর ছিল— এখন থ্যাৎলানো ওই ম্যাটাডোরের চাকায়। কী করি আমি? কী করি? কাঠের ওয়ার্ডরোব অপলক দেখে আমাকে। ওর পাল্লা দুটো একটু ঝুঁকে পড়েছে। আমার বুকের মধ্যে টনটন করে বেদনা।

আমি আলমারি দুটো ঘরে তুলি। বুড়ো দারোয়ানকে ডেকে বলি—ওই খাট আর ড্রেসিং টেবিল নেবেন?

ও মাথা নিচু করে। বলে—দাম তো দিতে পারব না।

বলি—দাম দিতে হবে না। এই ম্যাটাডরকে ঠিকানা বলুন। ও দিয়ে আসবে।

ও ঝাড়ুদার ছেলেটিকে গেটে বসায়। নিজেই চলে যায় ম্যাটাডরের সঙ্গে। নির্মলদা ফিরে গেলে আমি রুমে আসি। ছোট ঘর একেবারে পূর্ণ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

দু'-একজন, যারা দেখছিল আসবাব ঘরে তুলতে, আমার চেনাদের মধ্যে যারা, প্রশ্ন করে-- কিনলে?

আমি বলি— না। দিদির পুরনো ফার্নিচার। দিয়ে দিল।

মিথ্যা বলি। ওরা বিশ্বাস করে কিনা জানি না। কী-ই বা এসে যায় তাতে! আমি দরজা বন্ধ করে ঘরে ঘুরঘুর করি। এখন আমার হিটার আছে। ফ্রিজ আছে। বাসন-কোসন, মশারি, আলমারি—একার সংসার সম্পূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে বায়োপসি শব্দটা আমার মেরুদাঁড়া অধিকার করে। শিরশির করে নামে আমার পিঠ বেয়ে। আমি বোঝাতে চাই নিজেকে, কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি হয়নি আমার। হতে পারে না। আমি বাঁচার জন্য বেরিয়ে এসেছিলাম। মৃত্যুর জন্য নয়। চারপাশে আমার জীবনের আয়োজন পূর্ণ। তা ছাড়া, আমি তো যাব। সেই ভাল ডাক্তারের কাছে যাব। সেই সুধাকর সেনের বন্ধু। পাঁচশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে নিদান তো নেব আমি সেরে ওঠার জন্য।

ওয়ার্ডরোবের গায়ে হাত বোলাই আমি। চুমু খাই। আমার আদরের ওয়ার্ডরোব ফিরে এসেছে আমার কাছে।

বিকেলে আমি এস এন মিত্রে যাই। আজ আমার বই বেরিয়েছে। প্রথম বই। বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে চুপ করে বসে থাকি। বই হাতে নিই। আমার চোখের পলক পড়তে চায় না। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে লজ্জা করে। মনে হয়, সবাই আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। এখুনি প্রকাশিত হয়ে পড়বে নিজের বই নিয়ে আমার আদেখলেপনা! প্রচ্ছদে দু'-একবার হাত বুলিয়ে বই রেখে দিই আমি। দূরত্ব রচনা করে দেখি। হঠাৎ খেয়াল হয় আমার, এ কী ভুল করেছি! আমার নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে ভট্টাচার্য পদবি। হায়! আমি কেন আগে খেয়াল করলাম না! এখন এই নিঃসম্পর্কিত পদবি সারা জীবন আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে! সাত বছরের ক্ষত হয়ে লেগে থাকবে আমার সত্তায়!

তখন উনি আমাকে ডাকেন, সুধাকর সেন। বলেন—তুমি তো এখনও খোঁড়াচ্ছ। পা সারেনি। হে-হে-হে।

—না।

আমি বলি। উনি বলেন—ওখানে গিয়েছিলে?

—না।

—কেন যাওনি? হে-হে! ও, হে-হে। খুব ভাল ডাক্তার!

—মানে...সময় হয়নি...

—সময় হয়নি? সময় হয়নি কী? হে-হে। খেতে ঘুমোতে আড্ডা মারতে

BanglaBook.org

সময় পাচ্ছ না? আজকালকার ছেলেমেয়ে তোমরা শুধু অবাধ্য হতে শিখেছ! ল্যাংড়াচ্ছ, তবু ভাল ডাক্তার দেখাবে না? হে-হে-হে!

একঘর লোকের সামনে এক হাস্যময় ধমক। আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। চোখে জল আসে আমার। ধমকের জন্য নয়। বাবার কথা মনে পড়ে। বাবাও এরকম ধমকাত, বাবার এমন সুগোল অবিশ্রাম হে-হে হাসির হুররা ছিল না। কিন্তু কিছু বলার থাকলে বাবা লোকজন মানত না। আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তিত থাকত! অপারেশন হয়েছে, আমি মানুষটাকে দেখতেও যেতে পারিনি।

উনি বলেন—শোনো! তুমি কালই যাবে। আমি ওকে ফোন করে দেব। হে-হে! বুঝেছ?

আমি ঘাড় হেলাই। যাব। বায়োপসির কথা মুখে আসে। আমি গিলে ফেলি চটপট।

উনি এ বার নরম করে বলেন—বই নেবে?

বলি—নেব।

— ক'টা নেবে?

— ক'টা? মানে...

— হে-হে! ক'টা নেবে জানো না। শোনো, মোট পঁচিশটা বই তুমি নিতে পারো। হে-হে-হে। আজ দশটা নাও।

— দিন।

কেন নেব, কাকে দেব, জানি না। তবু নিয়ে নিই দশ কপি। অবশেষে, অবশেষে বইটা বেরিয়েছে। কারওকে বলতে দারুণ ইচ্ছে করছে আমার। মাকে ছাড়া একথা প্রথম আর কাকে বলা যায়! আমি কল্পনা করি মা-র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ! উদ্ভাসিত মুখ। সমূহ আবেগ আমার মধ্যে মুচড়ে ওঠে। হাত কাঁপে আমার। ঠোঁট কাঁপে। হস্টেলে ঢোকার মুখে মাকে ফোন করি। বড়দা ধরে। আমি মাকে চাই। মা ফোন ধরে। ক্ষীণ গলায় বলে—কে? শানু?

আমি বলি—মা, মাগো, আমার বই বেরিয়েছে।

—বই?

—সেই উপন্যাসটা মা। এস এন মিত্র পাবলিশার্স থেকে বেরিয়েছে! জানো তো? কত বড়। ওই প্রকাশনা...

—ও। পাঠাস একটা। ভাল আছিস তো? আচ্ছা রাখি।

মা-র গলায় কোনও উচ্ছ্বাস নেই। জীবনের সমস্ত উচ্ছ্বাস মা হারিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অদ্ভুত বিষাদ আমাকে ঘিরে ধরে। আমি রুমে যাই। বইয়ের প্যাকেট খুলে দশটি বই সাজাই বিছানায়। প্রচ্ছদের দশটি অবিকল একরকম মুখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আঃ! আজ প্রথম বই বেরিয়েছে আমার। প্রথম বই! অথচ আমার কারওকে বলার নেই। দিদি? নির্মলদা? মিষ্টিকাকা? উজ্জ্বলাদি? সুশান্ত জানা? দিব্যদা?

না। কারওকে বলতে ইচ্ছে করে না আমার। কেউ নেই, কেউ নেই আমার চারপাশে যে আমাকে বুকে জড়িয়ে বলবে—তুই আমার সারাজীবনের একমাত্র সুখ...

আমি ছোট্ট ঘরে ঘুরপাক খাই! আমার সব অর্থহীন লাগে। মনে হয়, এক দিন আমিও মরে পড়ে থাকব এই ঘরে। পচে গন্ধ বেরোবে। পুলিশ এসে নিয়ে যাবে আমাকে। আমার দারুণ কান্না পায়। একা একা একা লাগে। আর আমার কী প্রয়োজন এই পৃথিবীতে? কিছুই না। হোক তবে! আজই শেষ হোক!

আমি স্যুটকেস খুলি। বার করি ডায়াজিপাম। সমস্ত ট্যাবলেট সাজাই প্লেটে। জল নিই। আমার অসমাপ্ত উপন্যাসের পাতা ফরফর করে ওড়ে। আমি সেদিকে তাকাই। কিছু সাদা, কিছু অক্ষর, দ্রুত ওড়ে, দ্রুত পাল্টে যায়। কিছু অক্ষর, কিছু সাদা। ওর পাতায় পাতায় আমি আমার মায়ের মুখ দেখতে পাই। বিছানার ওপর রাইটিং ডেস্ক, তার ওপর উপন্যাস। ওই কাঠের ডেস্ক আমার বাবা হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি ছোট্টবেলার মতো বাবার গালে গাল চেপে ধরি। বাবার দাড়ি ফুটে যায় আমার গালে। আমি চিৎকার করে কাঁদি—মা, মা, ও মা...

সমস্ত ট্যাবলেট আমি কমোডে ফেলে দিই। ফ্লাশ করি। জল ওদের সাপটে নেয় পুরোপুরি। মেঝেয় শুয়ে কাঁদতে থাকি আমি। ক্রমাগত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কত কালের কত অবরুদ্ধ অসম্পূর্ণ কান্না আমার! তখন আমার দশ কপি বইয়ের প্রচ্ছদপটে আঁকা মুখের দশ জোড়া চোখ থেকেও জল পড়ে টুপ-টুপ-টুপ!